যশোর জেলায় ইসলাম
প্রচার ও প্রসার

নাসির হেলাল

যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার

নাসির হেলাল

সীমান্ত প্রকাশনী

www.pathagar.com

যশোর জেলায় ইসলাম
প্রচার ও প্রসার
নাসির হেলাল

প্রকাশিকা
মেহেরুন নেছা মিলি
৪/২ মীরবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৯৯
নভেম্বর ১৯৯২

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রক
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা

দাম
১৫০.০০ টাকা (সাদা)
১০০.০০ টাকা (নিউজ)

Jessore Jelai Islam Prochar O Prosher
by Nasir Helal.

Published by
Meherun Nessa Mili

Price
150.00 (White)
100.00 (News)

www.pathagar.com

উৎসর্গ
নজরুল ইসলাম
শাহ আলম
আবদুর রউফ
আবদুলমান্নান
নূরুল ইসলাম
আলী কদর
সহোদরদের হাতে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

১· যশোর জেলার ছড়া

২·যশোর জেলার প্রবাদ প্রবচন (যন্ত্রস্থ)

www.pathagar.com

ভূমিকা

যশোর জেলায় ইসলাম লিখেছেন জনাব নাসির হেলাল। অবিভক্ত বাংলাদেশের মধ্যে যশোর জেলা ছিল একটা উচ্চ স্থানের অধিকারী। আয়তনের দিক থেকে তখন যশোর ছিল খুবই বৃহৎ। কারণ–খুলনা ছিল যশোরের একটা অংশ। এ যশোর জেলা একদা দক্ষিণ রাঢ় বলে পরিচিত ছিল এবং বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যশোরের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতের সময় হযরত মাহমুদ ও হযরত মোহাইমিন নামে দু'জন দরবেশের নেতৃত্বে এ বঙ্গদেশে একদল মুসলিম প্রচারক এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তবে তারা এ দেশের কোন বিশিষ্ট স্থানে তাদের প্রচার কার্য আরম্ভ করেছিলেন তার কোন সঠিক ইতিহাস এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে অষ্টম শতাব্দী থেকে যে গাজী কালু নামক দু'জন মহান দরবেশ যশোর ও তার সন্নিহিত এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ গাজী কালু ও চম্পাবতীর কাহিনী বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে রাত্রিতে শুর করে পড়া হত। তার পরে রাজনৈতিক কারণে তুর্কি, মুঘল এবং পরবর্তীকালে ইংরেজদের আধিপত্য এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এ যশোরে অনেক খ্যাতনামা পীর দরবেশের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে খান জাহান আলী খান (তাঁর ওফাত হয় ২৬ শে জিলহজ্জ, ২৪ শে অক্টোবর ১৪৫৯) পঞ্চদশ শতকে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে এখনও ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর সূফী দরবেশ এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে যশোরের সুপ্রসিদ্ধ মরমী কবি লালন শাহ (১৭৭২–১৮৯০) মরমীবাদের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করে বাংলা ভাষা ভাষী সকল লোকের নিকট অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে দেখা দিয়েছেন। সম্প্রতি তারই ধারার কবি পাঞ্জু শাহ ,পাগলা কানাই, দুদ্দু শাহ প্রমূখ কবিগণ সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে এবং আশা করা যায় তাদের গবেষণার ফলে কেবল উপরোক্ত কবিগণ নয়, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল মরমী কবিগণের সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা ও আলোচনা হবে।

যশোরের তথা সমগ্র বাংলাদেশের বুকে যখন ইসলামের ওপর নানাভাবে আক্রমণ শুরু হয়েছিল, তখন এ যশোরের বীর সন্তান মুনশী মেহের উল্লাহ তাঁর অক্লান্ত

www.pathagar.com

পরিশ্রমের ফলে তাদের এ আক্রমণকে প্রতিহত করেছিলেন বলে তিনি আজও এ বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছেন।

হালে–এ উপমহাদেশে ইসলামকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় রত ছিলেন–মরহুম ডঃ হাসান জামান। তাঁর গবেষণার ফল বর্তমানে অক্সফোর্ড, লণ্ডন ও সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত শ্রদ্ধা লাভ করেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যশোর ছিল বঙ্গ দেশের এক বিশেষ কেন্দ্র। এ কেন্দ্রেই বঙ্গ গৌরব মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম। পরবর্তীকালে এ যশোরেই কবি গোলাম মোস্তফা, কবি ফররুখ আহমদ প্রমূখ কবি জন্মগ্রহণ করে যশোরকে যশোমণ্ডিত করেছেন। অতি আধুনিক কালেও যশোরের বুকে হিন্দু মুসলিম অনেক কবি ও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার।

জনাব নাসির হেলাল যশোরের বুকে ইসলাম ও মুসলিমদের যে বিবরণ দিয়েছেন ভবিষ্যতে যশোরের ইতিহাস লেখা হলে তা প্রামাণ্য দলীল হিসাবে গণ্য হবে।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

www.pathagar.com

প্রসংগ কথা

ইসলাম যে তৌহীদ বিশ্বাস এবং সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল হাজার হাজার বছর থেকে তার প্রভাব চলে আসছে। আল্লাহর নবীরাই এ সমাজের ভিত গড়ে তোলেন এবং বিশ্বের সমস্ত মানব বসতিই এর আওতাধীন থাকে। উচ্চ ও নিম্নভূমির সমন্বয়ে গঠিত এ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকায় পাঁচ হাজার বছর আগের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনও পাওয়া গেছে। হিমালয়ের ওপার থেকে আগত আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী যে দুটি সংস্কারবাদী ধর্মীয় আন্দোলন ও শ্রেণীভেদ প্রথা বিরোধী মানবিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে এ পূর্ব এলাকায় দীর্ঘকাল তার ব্যাপক বিস্তার দেখা যায়। এর মূলেও কাজ করেছে প্রাচীন তৌহীদ বিশ্বাসের প্রভাব। এরি প্রভাবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন ইসলামের দাওয়াত উপমহাদেশে আগমনের সাথে সাথেই তা এ পূর্ব এলাকায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের এ দাওয়াত মোটেই অপরিচিত মনে হয়নি। এটা যেন ছিল তাদের আপন গৃহের ও মনের সম্পদ, একদিন হারিয়ে গিয়েছিল, তাই আজ ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই তারা একে আপন করে নেয়।

স্থল ও সমুদ্র পথে ইসলামের দাওয়াত এদেশে এসেছে। সমুদ্র পথে এসেছে প্রথমে, একেবারে আরব উপদ্বীপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত শুরু হবার অব্যবহিত পরেই। কারণ সমুদ্র পথে আরবদের বাণিজ্য বহর বহু প্রাচীনকাল থেকে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপোসাগর হয়ে চীন সাগরে যাতায়াত করতো। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই মহানবীর (স) সমসময়ে বা তাঁর পরবর্তী সময় মুসলিম আরব বণিকদের সাহায্যে বাংলার উপকূল এলাকার নগর বন্দরগুলি ইসলামের দাওয়াতের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে। আর বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে ময়নামতি ও গৌড়ের ন্যায় যশোরেরও একটি প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে গ্রীক পণ্ডিতদের লেখা ইতিহাসেও যশোরের জাতিগোষ্ঠী ও নগর-বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোট কথা যশোরের কৃষ্টি-সভ্যতা বাংলার অতি প্রাচীন না হলেও প্রাচীনের অন্তরভুক্ত এতে সন্দেহ নেই। যশোর জেলার ভূমির গঠনাকৃতিও তুলনামূলকভাবে প্রাচীনত্বের দাবীদার ফলে এ এলাকার মানব বসতির প্রাচীনত্ব ও অনস্বীকার্য। এহেন এলাকায় ইসলাম প্রচারের ও প্রসারের ইতিহাস যে অত্যন্ত গুরুত্ববহ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

যশোরে ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, প্রাচীনকাল থেকে এ এলাকাটি সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী হলেও সামরিক কার্যক্রমের সাথে এখানে ইসলাম প্রচারের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে জনসংখ্যার নব্বইভাগের ইসলামে দীক্ষিত হবার মূলে রয়েছে একধরনের নিবেদিত প্রাণ ইসলাম প্রচারকের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনা। এ ইসলাম প্রচারকরা একদিকে যেমন ছিলেন ঈমানদার,

www.pathagar.com

সৎ, কর্মনিষ্ঠ ও ইসলামের প্রতিটি অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলতে অভ্যস্ত। তেমনি অন্যদিকেও তাঁরা ছিলেন অভাবী–দুখী–দরিদ্রের বন্ধু, পরোপকারী এবং জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে একেবারেই নিবেদিত প্রাণ। এমনকি সামরিক গ্রুপের যে মহান ব্যক্তিটির সাথে এ এলাকার ইসলাম প্রচারের ইতিহাস একান্তভাবে এবং সবচেয়ে বেশী জড়িত সেই হযরত খান্ জাহান আলী (রঃ) ও তাঁর সামরিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে একজন দরবেশ, ও সমাজ সেবী হিসাবে ইসলাম প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করার পরই এ এলাকায় গুরুত্বলাভ করেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, ইসলাম প্রচারকরা কেবলমাত্র তাঁদের বাগ্মীতার জোরে এখানে ইসলাম প্রচার করেননি। দারিদ্র ও অভাবী মানুষকে অর্থ ও কর্মসংস্থানের লোভ দেখিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করেননি। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নেননি। যে মহাসত্যের আলোকে তাঁদের নিজেদের হৃদয় উদ্ভাসিত ছিল, সেই আলোর ঝরণা ধারা তাঁরা প্রবাহিত করেছিলেন অন্ধকারের সাগরে ডুবে থাকা মানব গোষ্ঠীর দিকে। যে জীবন দর্শনে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রতিটি অনুশাসন তাঁরা মেনে চলতেন আন্তরিকতা সহকারে। ফলে তাঁদের জীবন হয়ে উঠেছিল ইসলামের তথা সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও সুন্দরের একটি অবিমিশ্র প্রতীক। সাধারণ মানুষ নীতি কথা অতি অল্পই বুঝে। একারণে সত্য ও ন্যায়ের এ অবিমিশ্র জীবনই তাদেরকে আকৃষ্ট করে চুম্বকের মতো। তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে অস্ত্র শক্তি ব্যবহার করলে ইসলামে দীক্ষা এত ব্যাপক হারে এবং এমন গভীর প্রভাব বিস্তারকারী হতো না।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, এই ইসলাম প্রচারকগণ কোনো শক্তির এজেন্ট ছিলেন না। বরং তাঁরা নিজেরাই ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। কোনো অন্যায় ও অসত্যের কাছে তাঁরা মাথা নত করেননি। কোনো চণ্ড ও জালেম শক্তির সাথে তাঁরা আপোশ করেননি। বরং অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের কথার চেয়ে তাঁদের এই আদর্শ ও ত্যাগী জীবন চিত্রই মানুষকে ইসলামের দিকে বেশী করে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছে।

যশোর জেলায় ইসলাম প্রচারের ও প্রসারের এ ইতিহাস তুলে ধরেছেন তরুণ লেখক নাসির হেলাল। নিজের এলাকার ইতিহাসের একটি অংশ পাঠকের সামনে তুলে ধরে তিনি যেমন নিজের সীমিত দায়িত্ব পালন করেছেন। তেমনি ব্যাপক অর্থে এটা জাতিগত দায়িত্ব পালনের অন্তরভুক্তও হয়ে যায়। তার এ প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।

আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

সূচী পত্র

১. যশোর পরিচিতি ৯

যশোরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১, যশোরের সীমানা ১৩, অবস্থান ১৪, আয়তন ১৪, নৃতাত্ত্বিক ১৪, ভূ-প্রকৃতি ১৫, ভূ-তাত্ত্বিক গঠন ১৫, অন্যান্য ১৫, নদনদী ১৬, লোক সংখ্যা ১৬, পৌরসভা ১৬, কৃষি ১৬, শিল্প ১৬, শিক্ষা ১৬, যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৭, অফিস আদালত ১৭, পত্রপত্রিকা ১৭, সাহিত্য সংগঠন ২২, যশোরের কৃতি সন্তান ২২, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ২২, রাজনীতিবিদ ২৫, সংগ্রামী ২৫, পীরদরবেশ ২৬, যশোরে যাঁরা ফৌজদার ছিলেন ২৬, বিখ্যাত স্থান ২৭, যশোর জেলার প্রত্ন তত্ত্ব ২৭, যশোরের প্রাচীন পুকুর ২৭, সিপাহী যুদ্ধে যশোর ২৮, নীল বিদ্রোহে যশোর ২৯, ভাষা আন্দোলনে যশোর ৩১, বিধবা বিবাহে যশোর ৩২, স্বাধীনতা যুদ্ধে যশোর ৩৩, যশোরের শহীদ বুদ্ধিজীবী ৩৪, যশোরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ৩৪, যশোর পৌরসভা ৩৫, মহেশপুর পৌরসভা ৩৫, কোটচাঁদপুর পৌরসভা ৩৫, যশোর পাবলিক লাইব্রেরী ৩৬।

২. বাংলাদেশে ইসলাম ৩৭

৩. যশোর জেলার পীর দরবেশ ৪৬

হযরত বড় খান গাজী (রঃ) ৪৭, হযরত খান জাহান আলী (রঃ) ৬০, হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (রঃ) ৭৬, হযরত পীর খালাস খাঁ (রঃ) ৮৩, হযরত গরীব শাহ (রঃ) ৮৪, হযরত বাহরাম শাহ (রঃ) ৮৬, পীর বোরহান খাঁ বা বুড়ো খা (রঃ) ৮৬, পীর মেহের উদ্দীন (রঃ) ৮৮, হযরত পীর সুজন শাহ (রঃ) ৮৯, পীর জয়েন উদ্দীন ওয়ফে পীর জয়ন্তী (রঃ) ৯০, মানিক পীর (রঃ) ৯০, শাহ বুলু দেওয়ান (রঃ) ৯৩, সরদার চাঁদ খাঁ (রঃ) ৯৯, মওলানা সুফী মুহাম্মদ আরব (রঃ) ৯৯, শাহ সুফী সুলতান আহমদ (রঃ) ৯৯, পীর জল্লু জলাল শাহ (রঃ) ১০০, পীর সিরাজ দেওয়ান (রঃ) ১০১, সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রঃ) ১০৪, ভালাই শাহ (রঃ) ১০৪, শাহ জিয়া আলী (রঃ) ১০৫, শাহ হাফিজ (রঃ) ১০৬, মাহমুদ আলী শাহ (রঃ) ১০৭, শাহ সূফী সৈয়দ কারামতুল্লাহ বোগদাদী (রঃ) ১০৮, সৈয়দ আহমদ আলী সিদ্দিকী (রঃ) ১০৮, সাতকড়ি ফকির ১০৯, গরীব শাহ দিউয়ান (রঃ) ১০৯, শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রঃ) ১০৯, সূফী সদর উদ্দীন ১১৩, আলহাজ্ব মুন্সী আবদুল আজীজ (রঃ) ১১৩, মওলানা সামসুদ্দীন (রঃ) ১১৪, জয়নাল আবেদীন জিলানী (রঃ) ১১৪, আহমদ আলী এনায়েত পুরী (রঃ) ১১৪, আলহাজ মুন্সী মুহাম্মদ শামনূর (রঃ) ১১৫, খাজা

www.pathagar.com

মুহাম্মদ আলী শাহ (রঃ) ১১৬, মওলানা জয়নুল আবেদীন (রঃ) ১১৭, মওলান আবদুল লতিফ (রঃ) ১১৭, মওলানা নিজামউদ্দী ১১৮, মওলানা ইছাহাক মিয়া ১১৮, দেওয়ান ঘোরন শাহ ফকির ১১৮, কুরেলা শাহ দেওয়ান ১১৯, হাফেজ আবদুল করীম ১১৯, মওলানা কওসার আহমদ ১২১, মওলানা ফয়েজ আহমদ ফয়েজী ১২১, মওলানা আবদুল হামিদ ১২১, সাধক মহিউদ্দীন মুন্সী ১২২, মওলানা নুরুদ্দিন শিকদার ১২২, মৌলভী ইয়াকুব আলী মোল্লা ১২৩, গরীব উল্লাহ শাহ সরদার ১২৩, তারা চাঁদ ফকির ১২৩, মান্দার ফকির ১২৪, মওলানা মফিজুর রহমান ১২৪, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ১২৬।

৪. যশোর জেলার প্রাচীন মসজিদ ১৩২

গোড়া মসজিদ ১৩৫, সওদাগরের মসজিদ ১৩৬, জোড় বাংলার মসজিদ ১৩৬, গলা কাটির মসজিদ ১৩৬, চেরাগদানি মসজিদ ১৩৭, সাত গাছিয়া মসজিদ ১৩৭, শেখ পুরা মসজিদ ১৩৯, শৈলকূপা মসজিদ ১৩৯, মীর্জা নগর মসজিদ ১৪০, শুভরাঢ়া মসজিদ ১৪১, কায়েমকোলা মসজিদ ১৪১, আওলিয়া জামে মসজিদ ১৪২ ।

৫. যশোরের মুসলিম মনীষী ১৪৫

লালন শাহ ১৪৫, পাগলা কানাই ১৪৭, মুন্সি জহিরুদ্দীন ১৪৯, দুদ্দু শাহ ১৪৯, পাঞ্জুশাহ ১৫১, মওলানা হাতেম আহমদ ১৫২, মওলানা আবেদ আলী ১৫৩, সুফী সাধক মোহাম্মদ ইউসুফ ১৫৪, ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমন ১৫৪, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন ১৫৫, মোহাম্মদ গোলাম হোসেন ১৫৬, আবুল হুসেন ১৫৭, গোলাম মোস্তফা ১৫৮, মওলানা আবদুল আওয়াল ১৫৯, ওয়াহেদ আলী আনসারী ১৬০, নূরুল মোমেন১৬১, কাদের নওয়াজ ১৬১, শামসুদ্দীন আহমদ ১৬২, বাঙ্গাল আবু সাঈদ ১৬৩, সৈয়দ লাল মোহাম্মদ ১৬৩, ফররুখ আহমদ ১৬৪, সৈয়দ আলী আহসান ১৬৬, খন্দকার আবুল খায়ের ১৬৭, সৈয়দ আলী আশরাফ ১৬৮, অধ্যক্ষ মহম্মদ আবদুল হাই ১৬৯, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ১৬৯, বেগম আয়েশা সরদার ১৭০, হাসান জামান ১৭১, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ১৭৩, শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ১৭৪, শাহাদাত আলী আনসারী ১৭৪, মোহাম্মদ শরীফ হোসেন ১৭৫, মোহাম্মদ ওসমান গণি ১৭৬, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৭৬, ডঃ বদিউজ্জামান ১৭৮, খোন্দকার রিয়াজুল হক ১৭৮, এস, এম, লুৎফর রহমান ১৭৯, সৈয়দ আকরম হোসেন১৭৯।

৬. ইসলামী শিক্ষায় যশোর ১৮১

৭. যশোরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭

www.pathagar.com

যশোর পরিচিতি

"শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, কৃষ্টি, সমাজ চেতনা, রাজনীতি– প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃহত্তর যশোরের ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। ন্যায়ের সংগ্রামে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যশোরের এক সংগ্রামী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। নীল বিদ্রোহ, কৃষক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে যশোরের অবদান অবিস্মরণীয়, সংগত কারণে এই জেলার অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য মন্ডিত।"[১]

সত্যিই, "যশোরের ইতিহাস ঐতিহ্যময়। বঙ্গ সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদি কেন্দ্রস্থল। এ জেলার মানুষ শুধু ললিত কলায়ই পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছে তাই নয়। চিরকালের আপোষহীন বিপ্লবী যশোরের সংগ্রামী মানুষ ন্যায়ের স্বপক্ষেও বলিষ্ঠ উচ্চারণ রেখেছে বার বার। যা অবশ্যই যশোর বাসীর গৌরবদীপ্ত অহংকার।"[২]

বহু প্রাচীন কাল ধরেই নানা কারণে যশোরের ঐতিহ্য অত্যন্ত তাৎপর্য মন্ডিত। এইতো প্রায় চারশো বছর পূর্বে দাউদ খাঁর সিংহাসন আরোহনের সামান্য কিছু পর অর্থাৎ ১৫৭৪ সাল থেকে যশোর একটা স্বাধীন রাজ্য ছিলো। এর পর ইংরেজ শাসন কালে সংগ্রামী যশোর বাসীকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হলে ১৭৮৬ সালে ইংরেজ সরকার যশোরকে স্বতন্ত্র জেলায় রুপান্তরিত করে। এটাই বাংলাদেশের প্রথম জেলা। সাহিত্য সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে যশোরকে তো মণি মাণিক্যের স্বপুপুরী বলা যায়। আসলে যশোর সাহিত্যের তীর্থভুমি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এতো উৎকর্ষ মাটি এই উপমহাদেশে আর কোথাও নেই।

স্বয়ং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যে কবির গানে আপ্লুত ও মুগ্ধ হয়েছেন তিনি এই যশোরের সুসন্তান, বাউল সম্রাট কবি লালন ফকির। এমন এক দিন ছিলো যখন পাঞ্জু শাহ, দুদুশাহ, পাগলা কানাই, লালন শাহদের গানে গানে যশোরের হাট মাঠ ঘাট শহর গঞ্জের আকাশ–বাতাস সুরের সুলোলিত ঝংকারে মুখরিত হয়ে উঠতো। এ কথা বল্লে হয়তো মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, কবি গুরু লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই লোক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংগ্রহে নামেন। মূলতঃ আবহমান কাল ধরেই সাহিত্যের নানা শাখায় রয়েছে যশোরের সদম্ভ পদাচারণা। যশোরের মানুষ যে সাহিত্য প্রেমিক তার বাস্তব নজীর বর্তমান কালেও রয়েছে প্রচুর।

১, আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত– যশোর পরিচিতি– ৪র্থ সংখ্যা।

২. প্রাগুক্ত– ৫ম সংখ্যা

www.pathagar.com

নবীন চন্দ্র সেনের ভাষায়, 'সাব ডিভিশন বা সদর যেখানেই গিয়েছি এক যশোর ভিন্ন আর সাহিত্য প্রিয় লোকের সাক্ষাৎ আমার ভাগ্যে বড় ঘটে নাই।'[১]

মহা কবি নবীন চন্দ্র সেনের উক্ত উক্তিটি যশোরের জন্য যথার্থই হয়েছে বলতে হবে। কারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যশোর যত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, নৃত্য শিল্পী, চিত্র তারকা, সংগ্রামী তথা কৃতি সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছে, ততো আর কোন স্থান পারিনি। সে জন্য যশোরকে "বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগার" বলা হয়। সাহিত্যের তীর্থ ভুমি এই যশোরেরই সন্তান মহা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে গেয়ে উঠেছিলেন, "হে বঙ্গ ভান্ডারে তব"। অপর দিকে আর এক মহা কবি ফররুখ আহমদ মধুমতির তীরে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলেন নোনা দরিয়ার ডাক বা সাত সাগরের মাঝির সমুদ্র যাত্রার আহ্বান।

বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ঐতিহ্যময় এ চারণ ভুমি, গাজী কালু চম্পাবতীর লোক ঐতিহ্য ও হযরত খাঁন জাহান আলী (রঃ), হযরত গরীব শাহ (রঃ)–এর ঐতিহ্যে ভরা যশোরের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের অনেকেই বাংলা সাহিত্যে তথা ইতিহাসের নায়ক হিসেবে স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষের আদিবাস ছিল এ যশোরেই। আর কবি স্ত্রী মৃনালীনি দেবী তো জন্ম নিয়েছিলেন এ জেলার মাটিতেই। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশোর জেলার ঝিনাইদহ ও খুলনা মহাকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। যশোর থাকা কালেই তিনি সৃষ্টি করেন অনেকগুলো উপন্যাস। তাঁর ইন্দিরা উপন্যাসের নায়িকাকে দেখানো হয়েছে মহেশপুরের এবং ঘটনাও মহেশপুর ও কলকাতা কেন্দ্রিক।

এ ছাড়া মহা কবি নবীন চন্দ্রসেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জগবন্ধু ভদ্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মত ব্যক্তিত্ব যশোরে কর্মরত ছিলেন। নবীন চন্দ্রসেন তাঁর 'অবকাশ রঙ্গিনী' রচনা কালে মাগুরা মহাকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি যশোর থাকা কালেই 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যটি রচনা করেন এবং প্রকাশ করেন। নবীন চন্দ্রসেন এ ব্যাপারে বলেছেন,"পলাশীর যুদ্ধ ও অন্যান্য কাব্যে স্বাধীনতার জন্যে যে আকুতি ও মাতৃভূমির জন্যে যে অশ্রু বিসর্জন আছে তার মূলে এই যশোরের সুসন্তান মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল।"[২]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, জগবন্ধু ভদ্র ও ডঃমুহম্মদ শহীদুল্লাহ যশোর জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। জগবন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরী বধ' কাব্য যশোরেই রচিত এবং প্রকাশিত। অপর দিকে ডঃমুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'লক্ষীছাড়া' গল্পটি এই যশোরেই রচিত।

জানা যায়, উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও তাঁর নানা হাসন রাজার পূর্ব পুরুষের আদিবাস যশোরে ছিল।

---

১. নাসির হেলাল–যশোর জেলার ছড়া, ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

২. মুহম্মদ আবু তালিব–কিংবদন্তীর যশোর।

www.pathagar.com

এখন সেই ঐতিহ্যবাহী যশোরেরই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

যশোরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

'আজ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে হিমালয়ের শেষ পর্যায়ের উত্থান হয়েছিল বলে ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করে আসছেন। মায়োসিন যুগের (Miocen period) পর এই উত্থানের ফলে বাংলাদেশের যে সব অঞ্চল গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে যশোর ভূ-ভাগ অন্যতম। হিমালয়ের এই শেষ পর্যায়ের উত্থানের যুগকে বলা হয়ে থাকে প্লায়েসটোসিন যুগ (Pleistocene period)।[১]

যশোরের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের সামনে নেই। কবে কিভাবে এ জনপদের সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা সঠিক ভাবে বলা আজ সত্যিই সুকঠিন। তবে উক্ত উদ্ধৃতি থেকে এতটুকু বলা যায় যে, আগে এ অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে বিলীণ ছিল, পরবর্তী কালে ক্রমে ক্রমে মাটির সৃষ্টি, তারও অনেক পরে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে।

প্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে গঙ্গা নদীর পলিদিয়ে যশোর ভূ-ভাগের সৃষ্টি হয়। 'গঙ্গা নদীর পলি মাটিতে যশোর ভূখন্ডের যে সব দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল ,তার মধ্যে চক্রদ্বীপ বা চাকদাহ, এড়োদাহ বা এড়োদ্বীপ, অক্র দ্বীপ, বৃদ্ধ দ্বীপ ও সূর্য দ্বীপ তাদের মধ্যে অন্যতম।'[২]

যশোর অঞ্চলকে পূর্বে উপবঙ্গ বলা হত। তখন এ অঞ্চল বনজঙ্গলে ভরপুর ছিল। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামের গ্রন্থটিতে যশোর ও আশপাশের অঞ্চলকে উপবঙ্গ বলে উল্লেখ আছে। 'বৃহৎ সংহিতা'য় বরাহ মিহির উল্লেখ করেছেন-"উপবঙ্গে যশোরাদ্যঃ দেশঃ কানন সংযুক্তা"। অপর দিকে "তারিখ-ই ফিরোজশাহী" গ্রন্থে সামস সিরাজ আকিক যশোর অঞ্চলকে ভাটি দেশ বলেছেন। মানিক রাজার গানে পাওয়া যায়-"ভাটি হইতে আইলা বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাঁড়ি।"

"ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পূর্বদিকের অঞ্চলই ছিল বঙ্গদেশ। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এর কিছু কিছু অংশ রাঢ়, বরেন্দ্রভূমি ও বাগড়ীর অন্তর্গত ছিল।"[৩]

---

১. হোসেন উদ্দিন হোসেন- যশোরাদ্য দেশ-পৃঃ-১।

২. প্রাগুক্ত-পৃ-২।

৩. প্রাগুক্ত-পৃ-৪।

www.pathagar.com

'Periplus of the Erythream sea.' নামক গ্রীক ইতিহাসে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অধিবাসী গঙ্গা রিডিদের বীরত্বের কাহিনী লিখিত আছে। গ্রন্থটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা। এই গঙ্গারিডিরাই যশোরের আদি বাসিন্দা। তাদের রাজধানী ছিল 'বারোবাজার'। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হলে এ অঞ্চলের মানুষ ব্যাপক হারে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় গৌতম বুদ্ধ বাংলাদেশেও আসেন। এখনো বৌদ্ধদের অনেক নিদর্শন যশোর অঞ্চলে দেখা যায়। 'গঙ্গা রিডিদের প্রাচীন রাজধানী বারোবাজারে বৌদ্ধদের আমলের অনেক প্রাচীন নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া গেছে।' এ ছাড়া 'মঠবাড়ী' নামের গ্রাম গুলি বৌদ্ধদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যশোর সহ সমগ্র বঙ্গ একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর টলেমীর মানচিত্রে তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত যশোর বঙ্গের অধীন ছিল বলে অনুমান করা হয়।'[১]

খৃষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে যশোর গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। এরপর ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তরাজ্যের পতনের ফলে যশোর ভাংগা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সপ্তম শতব্দীতে গৌড়ের সম্রাট শশাংক বঙ্গ জয় করলে যশোর তাঁর শাসনাধীনে চলে যায়। শশাংকের পর ক্ষমতায় আসেন সম্রাট হর্ষ বর্ধণ।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোর বৌদ্ধদের দ্বারা শাসিত হয়। বৌদ্ধদের নিকট থেকে রাজা যশোমনি এ অঞ্চলের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর আসে পাল রাজত্ব। ১০৮০খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাল রাজবংশ রাজত্ব করেন। পালদের পরে আসেন বর্মণ রাজাগণ। তারা ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর ১২০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেন রাজাগণের অধীনে যশোর অঞ্চল ছিল।

এরপরই সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা অর্থাৎ ইখতিয়ার উদ্দীনের বঙ্গবিজয়। এই সময়ই যশোর মুসলিম শাসনের অন্তর্ভূক্ত হয় কিনা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে সুলতান মুগিস উদ্দীনের আমলে যশোর তার শাসনাধীনে চলে যায়। চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যশোর অঞ্চল স্বাধীন ভাবে শাসন করেন হযরত উলুঘ খাজা খান জাহান আলী (রঃ)। যশোর-খুলনা অঞ্চলে তাঁর শাসনামলের অনেক নিদর্শন এখনো বর্তমান। পরবর্তীতে দিল্লীর সম্রাটগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা এ অঞ্চল শাসিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুলতান সামছুদ্দীন ইলিয়াছ শাহ বঙ্গ জয় করলে, যশোর তাঁর শাসনাধীনে চলে যায়।

ইলিয়াছ শাহী বংশের ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে পতন হলে ক্ষমতায় আসে দাস বংশ। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে দাস বংশের পতনের ফলে ক্ষমতার মসনদে আসেন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ। হুসেন শাহী বংশ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করেন।

পাঠান আমলে যশোর তাদের শাসনাধীনে আসে। মোগল আমলে যশোর তাদের

---

১. আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত- যশোর পরিচিতি-৩য় সংখ্যা।

www.pathagar.com

করতল গত হয়। সম্রাট আকবরই প্রথম যশোরে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। যশোরের প্রথম ফৌজদার হয়ে আসেন ইনায়েত খাঁন।

নবাবী আমলে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতিনিধি রাজা সিতারাম রায় যশোর শাসন করেন। তাঁর রাজধানী ছিলো মাগুরার মুহাম্মদ পুর। রাজা সিতারামের পতনে যশোর কয়েকটি জমিদারীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নাটোর, চাঁচড়া ও নলডাঙ্গার– জমিদাররা যশোরকে ভাগ বাটোয়ারা করে শাসন করে।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের শাসনকর্তা দাউদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি শ্রী হরি যশোরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। ইনিই ইতিহাসে মহারাজা বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তাঁর রাজধানী ছিলো ঈশ্বরীপুর ও তেরকাটিয়া।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হলে, তার জ্ঞাতি ভাই ও সহযোগী বসন্ত রায়ের সহযোগীতায় ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে পুত্র প্রতাপাদিত্য রাজা হন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলে যশোরও পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যশোর সরাসরি ইংরেজ রাজত্বে আসে। পৌনে দুশো বছর তাদের অধীনে থাকার পর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের অভ্যুদয়। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের পতনের পর আজকের বাংলাদেশ। যশোর বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসাবে বেঁচে আছে।

যশোরের সীমানাঃ

যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও ২৪ পরগনার বিশাল অংশ নিয়ে যশোরের প্রশাসনিক এলাকা বিস্তৃত ছিলো। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত এলাকা নিয়েই বাংলার প্রথম জেলা হিসাবে যশোর আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সারা জেলায় নীল চাষ বিরোধী আন্দোলনের কারণে ১৮৬০–৬১ সালে প্রশাসনের সুবিধার্থে যশোরের প্রশাসনিক এলাকাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এই অঞ্চল গুলিকেই মহকুমা নাম দেওয়া হয়। মহকুমা গুলো হলো খুলনা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং যশোর। জেলার প্রধান কেন্দ্র ছিলো খুলনা। ১৮৮২ সালে বাগেরহাট সহ খুলনাকে প্রথম জেলায় রুপান্তরিত করা হয়।

যশোরের ভাঙাগড়া ১৭৮৬ থেকে ১৯৮৪ সমান তালেই চলেছে। ১৯৬০ সালে নড়াইলের আলফাডাঙ্গা থানা ও মাগুরার মোহম্মদ পুর থানার অংশ ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আর ১৯৮৪ সালে মহকুমা গুলো জেলা হওয়ায় ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল যশোর থেকে বাদ পড়ে। বিভিন্ন পর্যায়ে সীমানা পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী জেলা হওয়া সত্বেও যশোর এখন ছোট্ট একটি জেলায় পরিণত হয়েছে।

নামকরণঃ

যশোর নামকরণের ব্যাপারে নানা কথা প্রচলিত আছে। এ ব্যপারে ঐতিহাসিকরাও

www.pathagar.com

একমত হতে পারেননি। ক্যানিংহামের মতে-"The name of Jessor (Jasar) The bridge shows The nature of the country which in completly interested by deep water course"[1]

গৌড়ের অগাধ ধন সম্পদ ও যশ হরণের মাধ্যমে যশোর রাজ্যের শ্রী বৃদ্ধি হয়েছিলো বলেও অনেকের ধারণা। তাই এ রাজ্যের নাম হয়েছিলো যশোর বা যশোহর।

এ প্রসঙ্গে ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব বলেন

গৌড়ের অগাধ ধন সম্ভারের দ্বারা এই নগরী অত্যাধিক যশোস্বী হয়েছিলো বলে যশোর বা যশোহর হয়েছে।

It was intended to express the idea "Supremely glorious."[2]

ক্যানিংহাম ও ওয়েস্টল্যান্ড সাহেবের মত দু'টিই বহুল প্রচলিত। তবে ক্যানিংহাম সাহেবের মতটিই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ যশোর অঞ্চল তৎকালীন সময়ে নদী-নালা খাল-বিলে ভরপুর ছিলো। তদানিন্তন সময়ে নদী খাল পার হওয়ার জন্যে বিভিন্ন স্থানে বহু সাঁকো ছিলো। ফার্সী ভাষায় সাঁকোকে 'জসর' বলা হয়। এই 'জসর' থেকেই মূলতঃ যশোর শব্দের উৎপত্তি। ইংরেজীতে Jessore (জসর) উচ্চারণই করা হয়।

অবস্থানঃ

'যশোর জেলা ৮৮° ৪০ হতে ৮৯° ৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২° ৪৭ হতে ২৩°৪৭ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে কুষ্টিয়া জেলা, দক্ষিণে খুলনা জেলা, পূর্বে ফরিদপুর এবং পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ। যশোর জেলা সমুদ্র বক্ষ হতে ২৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত'।

আয়তনঃ

আয়তনের দিক থেকে ৬,৬৭৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট যশোর জেলা বাংলাদেশের ১৩তম স্থানে রয়েছে।

নৃতাত্বিকঃ

'নৃতাত্বিক ভাবে যশোর জেলার মানুষ আর্য, দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। তাদের গাত্র বর্ণ, দৈহিক আকার, চুল,চোখ ইত্যাদি বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির মতই। তবে দেখা যায় যে জেলার পূর্বাঞ্চলীয় মানুষের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের চেহারাগত কিছু বৈশাদৃশ্য রয়েছে। জেলার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ নড়াইলের লোক অপেক্ষাকৃত সামর্থ ও দীর্ঘ দেহী।'

1. Cuninghumnis Ancient Geography.p-502.

2. West land's Report on Jessore, 1871 P-30.

www.pathagar.com

যশোরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। উলশী অঞ্চলের কিন্নর সম্প্রদায়। তারা মুসলমানদের মত মসজিদে নামাজ পড়ে। অথচ নামে ধামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মত। এমন কি মৃতদহ পোড়ানোর পক্ষপাতি। এদের পেশা নৃত্য ও সঙ্গীত। কিন্নর সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান হলেন মধুসূদন কিন্নর।

অপরদিকে কেশবপুর উপজেলার ভগবানীয় সম্প্রদায়। এরাও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি এক উদ্ভট সম্প্রদায়। এরা হিন্দু মুসলমান কারো খাদ্য বস্তু স্পর্শ করে না।

ভূ–প্রকৃতিঃ

ভূ–প্রকৃতি অনুযায়ী যশোরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। সদর মহকুমার অংশ বিশেষ, মাগুরার অংশ বিশেষ এবং সমগ্র নড়াইল মহকুমা নিয়ে পূর্বাঞ্চল। অপর দিকে সদর মহকুমার অংশ বিশেষ, মাগুরা মহকুমার অংশ বিশেষ ও সমগ্র ঝিনাইদহ মহকুমা নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল।

চক্রদ্বীপ, এড়ো দ্বীপ, অন্ধ্র দ্বীপ, বৃদ্ধ দ্বীপ ও সূর্য দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত বদ্বীপটিই আজকের যশোর। 'পদ্মা ও হুগলী নদীর মধ্যবর্তী সুবৃহৎ বদ্বীপটির একটি অংশ হচ্ছে এইযশোর।'

ভূ–তাত্ত্বিক গঠণ ঃ

'যশোর জেলা চতুর্থ মহাযুগীয় পলল সঞ্চয় দ্বারা গঠিত অভংগুর সমভূমি জেলার উত্তর প্রান্ত দিয়ে কলিকাতা কবজা রেখা গিয়েছে। এই রেখা সমগ্র বাংলাদেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছে। এই রেখার উত্তরের অংশে পলি মাটির গভীরতা কম অর্থাৎ ভূ–পৃষ্ঠের অল্প নীচে মূল শিলাস্তর । অন্যদিকে এর দক্ষিণে পলি মাটির গভীরতা বেশী। কলিকাতা ময়মনসিংহ কবজা রেখাকে মূল শিলাস্তরের একটি বিচ্যুতি রেখা হিসাবে ধরাহয়।'

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সমতল ভূমি হিসাবে বিবেচিত। তবে পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চল সামান্য উঁচু।

অন্যান্য ঃ

এ ছাড়া এ জেলার মৃত্তিকা সূক্ষ্ম বালুকণা, পলি এবং কাঁদা দ্বারা গঠিত। জলবায়ু সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আদ্র এবং শীতকাল আরাম দায়ক। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ১০৭° ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন ৩৬° ফারেনহাইট। তবে সাভাবিকভাবে গ্রীষ্মকালে ৯৮° ফারেনহাইট এবং শীতকালে ৫০° ফারেনহাইট থাকে।

এ জেলার গড় আদ্রতা ৭৮%। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এ জেলার বৃষ্টিপাত হয়। বছরে সর্বোচ্চ ও সর্বোনিম্ন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হচ্ছে ৯৬° ৫৬´ ও ২৮° ৫৯´।

www.pathagar.com

নদনদী ঃ

১৫৬বর্গ কিলোমিটার নদী এলাকার মধ্যে যে নদী গুলি আছে, তা'হল– মাথাভাঙ্গা, গড়াই, মধুমতি, নবগঙ্গা, ভৈরব,কুমার, চিত্রা, দাদরা, বেত্রাবতী, হরিহর, ইছামতি ও কপোতাক্ষ।

লোক সংখ্যা ঃ

১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বৃহত্তর যশোর জেলার লোক সংখ্যা মোট ৪০,১৯,৯৯৩ জন। এর মধ্যে ২০,৭১,৫৬৪ জন পুরুষ এবং ১৯,৪৮,৪২৯ জন নারী।

পৌরসভা ঃ

যশোর জেলার মোট ৭টি পৌরসভা আছে। পৌরসভাগুলির নাম যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, কালিয়া, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর।

কৃষি ঃ

খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ এ জেলার প্রধান জীবিকা কৃষি। উৎপাদিত শস্যের প্রধান শস্য ধান। অন্যান্যের মধ্যে পাট, ঔঁখ ও তামাক প্রধান। এছাড়া এ জেলায় প্রচুর খেজুর গাছ আছে। সেই সুবাদে অর্থাৎ খেজুর গুড়ের জন্য যশোর খ্যাতি দেশ বিদেশে সুপ্রচুর।

কৃষির উন্নতির জন্য দুটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে–

১। গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্প

২। উলশী যদুনাথ পুর প্রকল্প।

শিল্প ঃ

এ জেলায় ১০টি বৃহৎ শিল্প, ২০টি মাঝারি শিল্প ও ১৭,৯৬৫টি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যশোরে পূর্বে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে ধীরে ধীরে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। তবে যশোরের বোতাম ও চিরুণী শিল্পের সুনাম বিশ্বজোড়া। আর পাটালী গুড়ের কথা তো আগেই বলেছি। বর্তমানে চিনি শিল্পে মোবারক গঞ্জ চিনিকল বিশেষ অবদান রাখছে। ভারী শিল্প কেন্দ্রগুলি এ জেলার নওয়াপাড়ায় অবস্থিত।

শিক্ষা ঃ

যশোর বাংলার প্রথম জেলা শহর হওয়ার কারণে বহু পূর্ব থেকেই এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষিতের হার ১৯·৫%। ১৯৮২ সালের বি সি এস বেসরকারী তথ্যানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বমোট ২৮৫৫। এর মধ্যে সরকারী কলেজ ৪, বেসরকারী ডিগ্রি কলেজ ১০ টি, হোমিও প্যাথিক কলেজ ১, ক্যাডেট কলেজ ১,

www.pathagar.com

উচ্চমাধ্যমিক কলেজ ১২, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১, 'ল' কলেজ ১, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ৮, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ৩৭৬, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৩৫, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৯০, মাদ্রাসা ৭৬, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ৩৩৩, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় ৩, পলিটেকনিক কলেজ ১। এ জেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

৬৫৪ মাইল সড়ক পথের মধ্যে ৩০১ মাইল পাকা, ১১০ মাইল হেরিংবন, বাকী কাঁচা রাস্তা। জেলা সদরের সাথে বৃহত্তর জেলার সব উপজেলার সড়ক যোগাযোগ রয়েছে।

বিমান, সড়ক,রেল ও নৌপথে এজেলার যোগাযোগ হয়ে থাকে। বলা চলে দেশের অন্যান্য জেলার থেকে এ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত মানের। এ জেলার উপর দিয়েই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত প্রকার যোগাযোগ হয়ে থাকে।

অফিস আদালত ঃ

এ জেলা শহরে বিভাগীয় পর্যায়ের অনেক অফিস আদালত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন হাইকোর্ট বেঞ্চ ও হাইকোর্ট ডিভিশন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কালেকটরেট ভবন, কেন্দ্রীয় কারাগার , বিমান বন্দর, সেনানিবাস ইত্যাদি।

পত্র পত্রিকা ঃ

'সংবাদ পত্রের ইতিহাসে যশোরের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। সাংবাদিক হিসাবে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। মাদ্রাজ প্রবাস কালে তিনি Madras circulator and general chronicle, Anthenaeum পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং Spectaton পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি Anthenaeum ও Hindu chronicle পত্রিকা দুটির সম্পাদকও হয়েছিলেন। কোলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালে কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন Hindoo patriot পত্রিকা।'[১]

এর পর ১৮৬২ সালে খোদ যশোর থেকে ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের সম্পাদনায় বের হয় "অমৃত প্রবাহিনী" পাক্ষিক পত্রিকাটি। সম্পাদকের নিজ গ্রাম থেকে পত্রিকাটি বের হতো। বাংলা ও ইংরেজী

১. আমিরুল আলম খান সম্পাদিত–স্বরবর্ণ ১০৯ পৃঃ।

www.pathagar.com

ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি তাঁর (সম্পাদকের) গ্রামে স্থাপিত কাঠের ছাপা খানা থেকে মূদ্রিত হত। পরবর্তীতে পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক অমৃত বাজার নামে পত্রিকাটি বের হতে থাকে। নিলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে "সাপ্তাহিক অমৃত বাজার" বজ্রকঠোর ভুমিকা রাখে। ১৮৭১ সালে পত্রিকাটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৯১ সালে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে।

পাক্ষিক 'অমৃত প্রবাহিনী' বৃহত্তর যশোরের প্রথম পত্রিকা। এখানে পত্র পত্রিকা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা গেল।

পাক্ষিক অমৃত প্রবাহিনী ঃ

১৮৬২ সালে যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অমৃতবাজার গ্রাম থেকে শিশির কুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। এটা একটানা ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত চলে।

সাপ্তাহিক অমৃত বাজার ঃ

১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার থেকেই শিশির কুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। বর্তমানে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ইংরেজী দৈনিক হিসাবে বের হয়। এটি ভারতের অন্যতম সেরা পত্রিকা।

মাসিক কল্যাণী ঃ

উপেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত মাসিক কল্যাণী যশোর শহর থেকে ১৮৯৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে। যশোর শহর থেকে প্রকাশিত এটিই প্রথম পত্রিকা।

মাসিক এছলাম বা মুসলমান ঃ

১৯০১ সালে মহাতাবউদ্দীন সাহেবের সম্পাদনায় 'মাসিক এছলাম' পত্রিকাটি বের হয়। কেউ কেউ পত্রিকাটির নাম 'মাসিক মুসলমান' ছিল বলে দাবী করেন। যতদূর জানা যায় এটি মুসলমানদের সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা।

হিন্দু পত্রিকা ঃ

হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিসাবে ১৯১৯ সালে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'হিন্দু পত্রিকা'টি যশোর লোন অফিস পাড়া থেকে বের হয়।

বৈশ্য বারুজীবি পত্রিকা ঃ

১৯২১ সালে ঐ রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় ও প্রভাবশালী হিন্দুদের সহযোগিতায় 'বৈশ্য বারুজীবি ' পত্রিকা আত্ম প্রকাশ করে।

সাপ্তাহিক যশোর ঃ

যশোর কাপুড়িয়া পট্টি থেকে আনন্দ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯২৫ সালে 'সাপ্তাহিক

www.pathagar.com

যশোর' বের হয়।

মাসিক আনছার ঃ

যশোর শহরের লোন অফিস পাড়া থেকে বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব ওয়াহেদ আলী আনছারীর সম্পাদনায় ১৯৩৫ সালে 'মাসিক আনছার' আত্মপ্রাকশ করে। পত্রিকাটি মুসলিম গণজাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মাসিক আলোক ঃ

শীথ রোড যশোর থেকে কবি লাল মোহাম্মদের সম্পাদনায় ১৯৪০ সালে 'মাসিক আলোক' প্রকাশ পায়। এখানে স্মর্তব্য যে, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ ও কবি লাল মোহাম্মদের জন্মস্থান ঝিকরগাছা থানার 'অমৃতবাজার' নামক স্থানে।

যশোর গেজেট ঃ

১৯৪১ সালের ৩ জুলাই যশোর লোন অফিস পাড়া থেকে 'মাসিক আনছারের ' সম্পাদক জনাব ওয়াহেদ আলী আনছারীর সম্পাদনায় 'যশোর গেজেট' নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মাসিক ঈমান ঃ

জেল খানা রোড,ঘোপ,যশোর থেকে ১৯৪৩ সালে জনাব মতিয়ার রহমানের সম্পাদনায় 'মাসিক ঈমান' প্রকাশিত হয়।

মাসিক আল্ মোমিন ঃ

১৯৪৫ সালে হাজী মোহাম্মদ মহসিন রোড, যশোর থেকে ডাঃ মোকলেসুর রহমানের সম্পাদনায় 'মাসিক আল্ মোমিন' প্রকাশিত হয়।

মাসিক শরীয়তে এছলাম ঃ

যশোর কোতয়ালী থানার এনায়েত পুর থেকে মাওলানা মোহাম্মদ আলী এনায়েত পুরীর সম্পাদনায় প্রকাশ হতে থাকে মাসিক শরীয়তে এছলাম।

মাসিক ইশারা ঃ

১৯৪৮ সালে শীথ রোড যশোর থেকে কবি লাল মোহাম্মদের সম্পাদনায় 'ইশারা' নামে আরো একটি পত্রিকা বের হয়।

মাসিক শতদল ঃ

পুরাতন কসবা যশোর থেকে ১৯৫২ সালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ বেগম আয়েশা সরদারের সম্পাদনায় বের হয় মাসিক শতদল।

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক মজলুম ঃ

ঝিকরগাছা থানার পানিসারা গ্রাম থেকে ১৯৫৬ সালে ডাঃ সৈয়দ মারুফ হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশ হতে থাকে 'সাপ্তাহিক মজলুম'। পত্রিকাটি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসাবে কাজ করত।

ত্রৈমাসিক গণবার্তা ঃ

নোয়াপাড়া যশোর থেকে ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক হেমায়েত হোসেনের সম্পাদনায় বের হয় 'ত্রৈমাসিক গণবার্তা।'

মাসিক নকীব ঃ

জামে মসজিদ লেন, যশোর থেকে ১৯৫৮ সালে আহমদ আলী সাহিত্য রত্নের সম্পাদনায় 'মাসিক নকীব' প্রকাশ পায়।

পাক্ষিক জনকল্যাণ ঃ

যশোর জেলা বোর্ডের পক্ষথেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় 'পাক্ষিক জনকল্যাণ'।

মাসিক মুকুল ঃ

কবি নাসির উদ্দীনের সম্পাদনায় রেলরোড ,যশোর থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় 'মাসিক মুকুল'।

মাসিক সাম্যবাদ ঃ

বলাডাঙ্গা, ঝুমঝুমপুর, যশোর থেকে ১৯৬৪ সালে জনাব মকলেছুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মাসিক সাম্যবাদ'।

নতুন দেশ ঃ

হরিনাথ দত্ত লেন, যশোর থেকে জনাব মাহমুদ-উল-হক এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নতুন দেশ'। ১৯৭৬ সালে যশোরের জেলা প্রশাসক প্রগতিশীল এই সাপ্তাহিকীটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ছিল দেশ ব্যাপী। পরবর্তীতে সম্পাদক মাহমুদু-উল-হক ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক সত্যকথা প্রকাশ করেন। ১৯৮৩ সালে এই পত্রিকাটিও নিষিদ্ধ হয়।

মাসিক গণদাবী ঃ

কবি নাসির উদ্দীনের সম্পাদনায় 'মাসিক গণদাবী'নামে আরো একটি পত্রিকা বের হয়। পত্রিকাটির প্রকাশ কাল জানা যায়নি।

www.pathagar.com

মাতৃভূমি ঃ

স্মীথ রোড, যশোর থেকে জনাব আবদুস সালামের সম্পাদনায় ১৯৭০ সালে মাওলানা ভাসানীর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে 'সাপ্তাহিক মাতৃভূমি' প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক মুক্তি ঃ

রেল রোড, যশোর থেকে জনাব আহমদ রফিকের সম্পাদনায় ১৪ আগস্ট ১৯৭০ সালে 'সাপ্তাহিক মুক্তি' আত্ম প্রকাশ করে। বর্তমানে পত্রিকাটি নওয়াপাড়া থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

সাপ্তাহিক বিপ্লব ঃ

স্টেডিয়াম রোড, যশোর থেকে খান টিপু সুলতানের সম্পাদনায় ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক বিপ্লব'।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঝিকরগাছা থেকে ইকবাল হোসেন নামে এক তরুণ হাতে লিখে একটা পত্রিকা বের করতেন। পত্রিকার নাম 'স্বাধীন বাংলা'। এর পর ঐ '৭১সালেই আহমদ রফিকের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক ইশারা' মাওলানা মকবুলুর রহমানের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক চাষী' ,নাজিম উদ্দীন আল আজাদের (পরবর্তী ধর্মমন্ত্রী) সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক যুগের ডাক' প্রকাশিত হয়।

হানাদার বাহিনীর হাত থেকে যশোর মুক্ত হওয়ার ৪৮ ঘন্টা পর কেশব লাল রোড, যশোর থেকে মিয়া আব্দুস সাত্তারের সম্পাদনায় ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে 'সাপ্তাহিক স্ফুলিঙ্গ' প্রকাশিত হয়।

১৯৭৬ সালে পত্রিকাটি দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এটিই যশোরের প্রথম দৈনিক।

এর পর স্বাধীনতা উত্তর কালে রক্তবীজ, সংলাপ, স্বরলিপি,কোরাস, গ্রামবাংলা, এখন বিপন্ন স্বদেশ, উন্মেষ, ইশারা, মুকুল, নতুন সকাল, শতদল, কিশলয়, জনকল্যাণ, দিশারী, নতুন দেশ, সুহৃদ, যুগের ডাক,মাটি মানুষ, সূর্য সারথী, পদক্ষেপ, ঝটিকা, ঝটিকা দর্পণ, স্বরবর্ণ, সারথী, মৌসুমী, সকাল, পরিক্রমা, কোটচাঁদ পুর সাহিত্য, দাবানল, কপোতাক্ষী, উচ্চারণ, বালার্ক, মুহূর্ত, যশোর পরিচিতি, গ্লাস্নি ইন্টারন্যাশনাল, ব্যতিক্রম, শাব্দিক, সমাহার, সীমান্ত, অঙ্কুর, কোরক ইত্যাদি সাময়িকী, সংকলন ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক ও দৈনিক গুলোর ভেতর দৈনিক স্ফুলিঙ্গ, দৈনিক রানার, দৈনিক ঠিকানা, দৈনিক কল্যাণ, দৈনিক পূরবী, সাপ্তাহিক নবযুগ, সাপ্তাহিক দেশহিতৈষী, পাক্ষিক কপোতাক্ষ, সাপ্তাহিক সবুজ সমবায়, সাপ্তাহিক গণমানুষ, সাপ্তাহিক সোনার দেশ, সাপ্তাহিক বহ্নি, সাপ্তাহিক মুজাহিদ, সাপ্তাহিক শনিবার, সাপ্তাহিক সমাচার সমীক্ষা, সাপ্তাহিক ঝিনাইদহের চিঠি, মাগুরা বার্তা, চলন্তিকা, উইকলি প্যাট্রিয়ট

www.pathagar.com

ছাড়াও ১৯৭৮ সাল থেকে যশোর জেলা পরিষদের মুখপত্র হিসাবে পাক্ষিক 'যশোর বার্তা' প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য সংগঠন ঃ

বর্তমানে যে সমস্ত সাহিত্য সংগঠণ গুলি সঞ্চরণশীল আছে তাদের নাম হল—

(১) নব প্রভাত সাহিত্য গোষ্ঠী (জন্মঃ ৮ই ফাল্গুন ১৩৮২)
(২) প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী (জন্মঃ১৯৭৩)
(৩) রবিবাসরীয় সাহিত্য সংসদ
(৪) প্রগতি সাহিত্য গোষ্ঠী (জন্মঃ ১৯৮১)
(৫) সুহৃদ সাহিত্য গোষ্ঠী (জন্ম ১৯৮২)
(৬) শাব্দিক সাহিত্য সংসদ (জন্মঃ১৯৮১)
(৭) ব্যতিক্রম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী (জন্মঃ১৯৮১)
(৮) যশোর সাহিত্য পরিষদ (জন্মঃ ১৯৮৩)
(৯) ফররুখ সাহিত্য সংসদ (জন্মঃ১৯৮৪)
(১০) বঙ্গীয় স্বস্তি সাহিত্য পরিষদ, বাঘার পাড়া।
(১১) সারথী সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ,(জন্মঃ১৯৮৩)
(১২) মাটি মানুষ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, মাগুরা (জন্মঃ১৯৮৬)
(১৩) অববাহিকা সাহিত্য সংসদ, কেশবপুর।
(১৪) প্রান্তিক সাহিত্য পরিষদ, মহেশপুর (জন্মঃ১৯৮৭)
(১৫) কাব্য কুঠি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, শৈলকুপা (জন্মঃ ১৯৬৯)

যশোরের কৃতি সন্তান

সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ঃ

সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, লালন শাহ[১], কবিরাজ গঙ্গাধর সেন রায়, পাগলা কানাই, ইদুবিশ্বাস, মুন্সী জহিরুদ্দীন, মধুসূদন কিন্নর, দ্বারকানাথ গুপ্ত,

---

১. লালনশাহের জন্মস্থান যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামে। এই গ্রামটি বর্তমানে হরিনা কুন্ডু থানার অধীনে এবং সাধুগঞ্জ ডাকঘরের এলাকাধীন। দরীবুল্লাহ দেওয়ান তাঁর পিতার নাম আর তাঁর মাতার নাম আমেনা খাতুন। তাঁর গুরু বা পীরের নাম সিরাজ সাই ওরফে সিরাজ শাহ্। উভয়ে একই গ্রামের বাসিন্দা। সিরাজ শাহ মুসলমান বেহারার সন্তান। লালন শাহের জন্ম হয় ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক শুক্রবার মুতাবিক ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ১লা কার্তিক শুক্রবার মুতাবিক ১৭ই অক্টোবর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ।

www.pathagar.com

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র, মোহাম্মদ তরিবুল্লাহ বিশ্বাস, সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, শিশির কুমার ঘোষ, দুদ্দু শাহ্, বীরেশ্বর পাঁড়ে, তারকনাথ গঙ্গোপধ্যায়, মাওলানা মোঃআবদুল করীম, গুরুনাথ সেনগুপ্ত, জ্যোতিষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পাঞ্জুশাহ, ডাঃ প্যারিশঙ্কর দাসগুপ্ত, যদুনাথ ভট্টাচার্য, রসিক লাল চক্রবর্তী, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, রায় বাহাদুর ঈশান চন্দ্র ঘোষ, মহামহোপাধ্যায়, আশুতোষ তর্কভূষণ, মুন্সী মোজাহার উদ্দীন, চন্দ্র শেখর কর, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মানকুমারী বসু, সুফী সদরউদ্দীন, মৌলভী নাছের হোসেন জাফরী স্মৃতিতীর্থ, উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, আলহাজ্ব হাফেজ আবদুল করীম, মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, সুশীলা সুন্দরী সেন, রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ক্ষিতিনাথ ঘোষ, শামসদ্দীন খোন্দকার, কালীনাথ রায়, কেদারনাথ ভারতী, রায়বাহাদূর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, গোলাম লতিফ বিদ্যাবিনোদ,ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাওলানা মোহাম্মদ গোলাম জিলানী, মৃণাল কান্তি বসু, হরিপদ মুখোপাধ্যায়, আঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থ, ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, অবলাকান্ত মজুমদার, সৈয়দ মোকাররম আলী, মোহন দাস বৈরাগী, শৈলবালা ঘোষ জায়া, জলধর চট্টোপাধ্যায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল হুসেন, মুন্সী মোহাম্মদ এসমাইল, নীরেন্দ্র নাথ রায়, কাজী হবিবর রহমান, কবি গোলাম মোস্তফা, ননী গোপাল মজুমদার, শরৎচন্দ্র মজুমদার, কাজী আবদুল লতিফ, কাজী মুজিবর রহমান কবি রত্ন,আবদুল জব্বার, খান বাহাদুর মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী, তারাপদ রাহা, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মোহাম্মদ মোহসেন (কবি শেখর), আশরাফ আলী খান, ননী গোপাল চক্রবতী, ডঃহরগোপাল বিশ্বাস, মুন্সী রইস উদ্দীন ওস্তাদ, মনোজ বসু, কবিয়াল পাগলা বিজয় সরকার, বয়াতী মোসলেম উদ্দীন মোল্যা, খোন্দকার রফিউদ্দীন, কাজী আবদুর রউফ, পাঁচু শাহ ফকির, কাজী আনিসুর রহমান, সায়্যেদ মুহাম্মদ ফরহাদ আলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ওয়াহেদ আলী আনসারী, পৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, নূরুল মোমেন, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, কবি কাদের নওয়াজ, প্রীতিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্র সেন, অরুণ মিত্র, অটল বিহারী দাস, গঙ্গাপদ বসু, হীরেন্দ্র নাথ মজুমদার, মোঃ ছলেমান মন্ডল, কবি শামসুদ্দীন আহমদ, হাবিবুর রহমান, শশধর বিশ্বাস, ভবদেব ভট্টাচার্য, আলহাজ্ব সৈয়দ শামছুর রহমান, প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য , আব্দুর রহমান, ডাঃ নিহার রঞ্জন গুপ্ত, ডাঃ নূরুল ইসলাম (শান্তি মিয়া), মোহাম্মদ মতিয়ুর রহমান, বাঙ্গাল আবু সাঈদ, সৈয়দ লাল মোহাম্মদ, মিয়া আবদুল মতিন, কবিরাজ মোসলেম উদ্দীন আহমদ,ভূপতি মোহন চন্দ্র, কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডাঃজ্যোতিভূষণ চ্যাটার্জী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, আবদুল হক, মোহাম্মদ আজহার উদ্দীন, শিবদাস

www.pathagar.com

চক্রবর্তী, ডঃদেবীপদ ভট্টাচার্য, সৈয়দ আলী আহসান, বিপিন সরকার, নাসীর ইবন ঈসমাইল,মোহাম্মদ আবদুর রশীদ,জগন্নাথ চক্রবর্তী, মোঃ রমজান আলী, সৈয়দ আলী আশরাফ, মুজিবুর রহমান (মনসিজ), মোঃ মুমিনুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ, খোন্দকার তবিবুর রহমান, নূর মোহাম্মদ মিয়া, ইব্রাহিম হোসেন, বেগম আয়েশা সরদার,সৈয়দা সুফিয়া খাতুন সাহিত্য রত্ন,মিসেস হামিদা রহমান, মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান, চৌধুরী এম, এ সালেক, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, সৈয়দ আবুল কাশেম কবি রত্ন, ডঃ হাসান জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, গোলাম মাজেদ (ইমলী), শেখ নজরুল ইসলাম, বিনোদ গোসাই, শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন, প্রমথ কুমার রায, কবি আজিজুল হক, এবদাত হোসেন,এ,বি, এম আবদুল বারী, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, নাসির উদ্দীন আহমদ, তারা শংকর শীল, নিমাই ভট্টাচার্য, মোঃ ওয়াজেদ আলী, জহুরুল ইসলাম,আবদুল লতিফ আনহু, তাজুল ইসলাম, বেগম মাহমুদা রহমান, কবিরত্ন এম, এ, হক (মোহাম্মদ আবদুল হক), মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, মনিশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, মহম্মদ মীজানুর রহমান, মাওলানা শামসুদ্দীন, কাজী মোঃ রউফ, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ ওসমান গণি, কালীপদ দাস, ডঃরশীদুল আলম, জোবেদ আলী, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সাদেকা শফিউল্লাহ, তারাপদ দাস, মাহমুদ-উল-হক, কামরুল মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, ময়েজ উদ্দীন আহম্মদ মধু মিয়া, বিনয় ঘোষ, ডঃ আনোয়ারুল করীম, কাজী আব্দুল হালিম, কবিয়াল হাসেম আলী, আবদুল গফুর, সৈয়দ মনিরুল ইসলাম, দিলারা হাসেম, ডাঃ খোন্দকার রিয়াজুল হক, ডঃবদিউজ্জামান, হোসেন উদ্দীন হোসেন, ডাঃ এস, এম, মোবারক হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, আবু সালেহ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ময়েজ উদ্দীন আহমদ মধু মিয়া, বিনয় ঘোষ, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ননী গোপাল বিশ্বাস, শামসুন্নাহার, শামসুন্নাহার নিযামী, খোন্দকার আবুল খায়ের, গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী, মুস্তফা মাসুদ, এ, এ হাফিজ, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, মহসিন হোসাইন, মজহারুল করিম, জামান আখতার, মধুসূদন অধিকারী, আলী ইদরীস, শামসুন নাহার লিলি, রেজাউদ্দীন স্টালীন, মোশাররফ হোসেন খান, দারা মাহমুদ, রহিম দাদ রেজা, কুতুব উদ্দীন আমীর, ফারুক নওয়াজ, আসাদুজ্জামান আসাদ, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ রেজওয়ান হোসেন স্বপন মোহাম্মদ কামাল, আবদুর রব, ফকরে আলম, সেলিম চৌধুরী, মোস্তফা আনোয়ার হোসেন, সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ জামসেদ আলী, মোঃ হাবিবুর রহমান, মাহমুদ রেজা, এ, জামান, প্রমুখ।

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ ঃ

কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়, শান্তিময় ঘোষ, সচীন্দ্রনাথ বোস, আবদুল হক,গৌর বিনোদ রায়,রণক্রম মজুমদার, সুকুমার রায়, অনন্ত মিত্র, রঞ্জিত মিত্র, ডাঃ জীবন রতন ধর, নাগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কুমার গুরুক্রম মজুমদার, সুনীল কুমার বসু, সৈয়দ নওসের আলী, মৌলবী ওয়ালিয়র রহমান, শ্রী শচীন চন্দন চট্টোপাধ্যায়, অমল সেন, প্রফুল্ল সেন, শিবু ঘোষ, বটুদত্ত, সরোজ দত্ত (পরবর্তীকালে চারু মজুমদারের ঘনিষ্ট সহযোগী), করুণা কিশোর, বামাচরণ, নুরজালাল, মোদাসসের মুন্সী, আবু জওহুর, ডাঃ ভোলানাথ, রসিক লাল ঘোষ, সমর রক্ষিত, করুণা কিশোর, রাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ভোলানাথ বিশ্বাস, হেমন্ত সরকার, অনিমা বিশ্বাস, সরলাদি, বীর কালাচান্দ, আবদুল গণি, হেমন্ত সরকার, ওয়াহেদ আলী আনসারী, আলমগীর ছিদ্দিকী, রওশন আলী, মশিউর রহমান, অবঃ মেজর মাজেদুল হক, আনোয়ার জাহিদ (মন্ত্রী), তরিকুল ইসলাম (প্রতিমন্ত্রী), খালেদুর রহমান টিটো (প্রতিমন্ত্রী), নাযিম উদ্দীন আল আযাদ (প্রতিমন্ত্রী), মুফতী ওয়াক্কাস (প্রতিমন্ত্রী), মোহসীন মিয়া, আবদুস শহীদ লাল, ইব্রাহীম মাস্টার, বেলায়েত হোসেন, সিরাজুল ইসলাম (পার্লামেন্ট সেক্রেটারী) মসিউল আযম খান (স্পীকার), আবদুল জলীল, কালামদার সাহেব, মনসুর আহমেদ, বদরুল আলা, মোবারক হোসেন, আহমদ আলী সরদার, বি,এ,মজমাদার (প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী), সামছুল হুদা, বিচারপতি আবদুল ওহাব (পার্লামেন্ট সেক্রেটারী), আতর আলী, চন্দ্রকুমার ব্যানার্জী, প্রফুল্ল রায় চৌধুরী, আফসার সিদ্দিকী, এম, এ,মান্নান, মোহাম্মদ ইছহাক, ডাঃ রবিউল, এ্যডঃ এনামুল হক, এ্যডঃ নুর হোসেন, এ্যডঃ আনছার আলী, এ্যডঃ রুহুল কুদ্দুস, মসিউল আযম, মোজাম্মেল হক এম, পি, হায়দার আকবর খান রণো, রবিউল আলম, আবদুল হাই, মোশাররফ হোসেন, আলী হোসেন মণি, মাওলানা আবদুল আজীজ, মাওলানা লুৎফর রহমান, আবুল কাশেম প্রমূখ।

সংগ্রামী ঃ

মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, বাঘা যতীন[১], ডাকাত হীরা সর্দার, কালী শঙ্কর, কেদার নাথ ঘোষ, আশুতোষ গাঙ্গুলি, প্রিয়নাথ

---

১. বৃটিশ খেদা আন্দোলনে যশোরের অংশ গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এদেশের বিপ্লবের ইতিহাসে যশোরের বিপ্লবী সন্তান বাঘা যতীন বিশেষ ভাবে উল্ল্যেখ যোগ্য। বাঘা যতীনের পূর্ণ নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম শরৎ শশী দেবী। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ যশোর জেলার ঝিনেদা জেলার বিসয়খালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। বিধবা মা শিশু যতীন্দ্র নাথ ও জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনোদ বালাকে নিয়ে কুষ্টিয়ার কয়া গ্রামে তাঁর পিতার বাড়ী যেয়ে উঠেন। যতীন্দ্রনাথের শিক্ষা জীবন শুরু হয় প্রথমে কৃষ্ণনগরে পরে শোভা বাজারে।

www.pathagar.com

মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু যদুনাথ মজুমদার, আবদুল গফুর, পরাগ ধোবী, মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, কালীনাথ রায়, হরিশ চন্দ্র শিকদার, কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, স্নেহশীলা চৌধুরী, মৃণাল কান্তি বসু, প্রবোধ কুমার বিশ্বাস, সত্যানন্দ পরিব্রাজক, বিজয় কুমার রায়, নিত্য গোপাল বন্দোপাধ্যায়, ভবভূষণ মিত্র, মথুরানাথ আচার্য, বীর শ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ শেখ, বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান প্রমূখ।

পীর দরবেশ ঃ

হযরত বড় খানগাজী, হযরত উলুঘ খাঁন জাহান আলী (রঃ), হযরত শাহ বুলু দেওয়ান, হযরত সরদার চাঁদ খাঁ, হযরত মাওলানা মোঃ আবদুল করীম, সুফী সদর উদ্দীন, খাঁন বাহাদুর মাওলানা আহমাদ আলী এনায়েত পুরী, খাজা মুহাম্মদ আলী শাহ, মাওলানা সুফী মোহাম্মদ আরব, হযরত শাহ সুফী সুলতান আহমদ, হযরত শাহ হাফিজ, পীর খালাস খাঁ, হযরত গরীব শাহ (রঃ), হযরত বাহরাম শাহ, পীর বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ, পীর মেহের উদ্দীন, পীর সুজনশাহ, পীর জয়ন্তী, হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির, আলহাজ্ব মুন্সি শামনুর, হযরত মাওলানা জয়নুল আবেদীন, সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ, আলহাজ্ব মাওলানা ইছাহক মিয়া, হযরত মানিক পীর, হযরত পীর জল্লু জালাল শাহ, হযরত পীর সিরাজ দেওয়ান, হযরত সাতকড়ি ফকির, হযরত গরীব শাহ দিওয়ান, হযরত মুহাম্মদ আলী শাহ, হযরত মাওলানা সামসুদ্দিন, হযরত মাওলানা শাহ সুফী জয়নাল আবেদীন জিলানী, হযরত শাহ আবদুল্লাহ ওরফে ভালাই শাহ আল বোগদাদী (রঃ) প্রমূখ।

যশোরে যাঁরা ফৌজদার ছিলেন ঃ

'আকবরের সময় হইতে প্রত্যন্ত রাজ্যে কতকগুলি পরগণা একত্রযোগে একজন বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ন ও স্বার্থ শুন্য সেনাপতির শাসনাধীন করিয়া রাখিবার নীতি প্রবর্তিত হয়। ইহাকে ফৌজদার বলিত। ইনায়েৎ খাঁ যশোরের প্রথম ফৌজদার।'[১]

এর পর যাঁরা ফৌজদার হয়ে আসেন–সরফরাজ খাঁ (বাংলার শাসনকর্তা খাঁ আজমের (১৫৮২–৮৪) ৪র্থ পুত্র), মীর্জা সাফসীকান (বাংলার শাসন কর্তা শাহ সুজার শ্যালক পুত্র), মীর্জা সৈফউদ্দীন খাঁ (মীর্জা সাফসিকানের পুত্র), নুরুল্যাহ খাঁ (যশোর, মেদিনিপুর, হিজলী, হুগলী ও বর্ধমানের যুক্ত ফৌজদার ছিলেন), মীর খলিল খাঁ, মুহাম্মদ আসরফ খাঁ প্রমূখ।

---

১. আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত–যশোর পরিচিতি–১১০ পৃঃ।

www.pathagar.com

বিখ্যাত স্থান ঃ

যশোরে বহু প্রাচীন কালের কিছু বিখ্যাত স্থান রয়েছে, যার ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। যেমন- ভূষণা, মুহাম্মদ পুর, শ্রীপুর নগর, মুরলী কসবা, শেখ হাটি, বার বাজার, নলডাঙ্গা, চাচড়া, চৌগাছা, কাগজ পুকুরিয়া, প্রেম ভাগ, ত্রিমোহীনি, সাগরদাঁড়ী, অমৃত বাজার, কালিয়া, বসুন্দিয়া, বিদ্যানন্দ কাটি , ধলগ্রাম, গঙ্গানন্দপুর, ঝিকরগাছা, ঝিনইদহ, কালিগঞ্জ, কেশবপুর, কোটচাঁদপুর, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, মাগুরা, মহেশপুর, নওয়াপাড়া, শৈলকুপা, নড়াইল, মীর্জানগর প্রভৃতি।

যশোর জেলার প্রত্ন তত্ব ঃ

যশোর বাংলাদেশের একটি প্রচীন জেলা হওয়া সত্বেও এখানে তেমন প্রত্ন তাত্বিক অস্তিত্ব দেখা যায় না। অথচ থাকাটাই ছিলো ঐতিহাসিক দাবী। তবুও যা এখনো দৃষ্টি গোচর হয় তা মোটেও কম নয়।

বার বাজার এ জেলার সবথেকে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নগর। এখানে ৬ কুড়ি ৬টা অর্থাৎ ১২৬টা পুকুর ছিলো বলে জানা যায়। এর মধ্যে ৭১ টি পুকুরের নাম উদ্ধার করা গেছে। এছাড়া এখানে রয়েছে- গোড়া মসজিদ, চেরাগদানী মসজিদ, সাত গাছিয়া মসজিদ, গাজী কালু চম্পাবতীর মাজার ইত্যাদি। এছাড়া এই নগরীর বহু কীর্তির ধ্বংসাবশেষ যা এখনো ইট পাথর ও সুরকীর ভেতর থেকে অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

প্রত্ন তাত্বিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য স্থানের নামগুলি হলো- দিগ নগর স্তুপ (হরিনাকুন্ডু), শেখ হাটি, শৈলকুপা মসজিদ ও মাজার, শুভরাঢ়া মসজিদ, অভয় নগর, বিদ্যানন্দ কাটি, মীর্জানগর, কেশব পুর, কীল্লাবাড়ী (কেশব পুর), হাম্মাম খানা (ঐ), মোহম্মদ পুরের কীর্তি, মোহাম্মদপুর দূর্গ, লক্ষীণারায়নের মন্দির, জোড় বাংলা মন্দির, দশভুজার মন্দির, দোলমঞ্চ, রাজা রামচন্দ্রের বাড়ী, পঞ্চরত্ন মন্দির, রায়গ্রাম জোড় বাংলা মন্দির, নল ডাঙ্গার রাজবাড়ী ও মন্দির,পঞ্চরত্ন মন্দির (নলডাঙ্গা), গুঞ্জনাথ শিব মন্দির, চাচড়ার রাজবাড়ি ও মন্দির, শিব মন্দির, দশমহা বিদ্যা মন্দির, দোচালা মন্দির, অভয় নগর রাজবাড়ী ও মন্দির সমূহ, ধূলগ্রামের মন্দির, রায়নগর মঠ, মকিম পুর মঠ ইত্যাদি।

যশোরের প্রাচীন পুকুর ঃ

যশোরে বিভিন্ন সময়ে রাজন্যবর্গের উদ্যোগে ও পীরবর্গের উদ্যোগে অনেকগুলো পুকুর খনন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ যোগ্য কিছু পুকুরের নাম দেওয়া হলো-

মোহাম্মদ পুরের রামসাগর (২৪০০x৯০০ফুট), সুখ সাগর (৩৭৫x৩৭৫ফুট) কৃষ্ণপুকুর, (১০০০x৩৫০ ফুট), পদ্মপুকুর প্রধান। বিদ্যানন্দকাটির দীঘি (২৩৫৮x১০৬২ ফুট), মীর্জা নগরেও অনেক গুলো দীঘি আছে। শেখ হাটির তপন

www.pathagar.com

ভাগ গ্রামেও একটি দীঘি আছে (১০০০x৬০০ ফুট)। অপর দিকে বারবাজারে রয়েছে ৬ কুড়ি ৬টা পুকুর অর্থাৎ ১২৬ টা পুকুর বা দীঘি। যত দুর জানা যায় এই উপমহাদেশে একই স্থানে এতোগুলো পুকুর এক বারবাজার ছাড়া আর কোথাও নেই। আমরা ৭১ টি দীঘির নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি। যথা- ১। পীর পুকুর ২। চেরাগদানী দীঘি ৩। সওদাগর দীঘি ৪। গোড়া দীঘি ৫। শ্রীরাম রাজার দীঘি ৬। বড় দীঘি ৭। রাজমাতার দীঘি ৮। মীরের পুকুর ৯। গলাকটি পুকুর ১০। ঘোড়া মারী পুকুর ১১। আজম খাঁর দীঘি- এটা ভাই বোনের দীঘি নামে পরিচিত। ১২। মনোহর দীঘি ১৩। শেখর পুকুর ১৪। লোহাশলা পুকুর ১৫। উবোগাড়ী দীঘি ১৬। মিঠা পুকুর ১৭। লবন গোলা ১৮। খুনকার দীঘি ১৯। কানাই দীঘি ২০। সাত পুকুর ২১। পাঁচ পীরের দীঘি ২২। সাতারে দীঘি ২৩। আলেখা দীঘি ২৪। হাঁস পুকুর ২৫। বিশ্বাসের দীঘি ২৬। ফ্যান ঢালা ২৭। কচুয়া ২৮। চা'ল ধোয়া ২৯। পিঠে ধোয়া ৩০। ডা'ল ঢালা ৩১। কোদাল ধোয়া ৩২। খোলসে মারী ৩৩। নলা মারীর পুকুর ৩৪। নীলে পুকুর ৩৫। ছাই গাড়ী ৩৬। নটি পুকুর ৩৭। দেল পুকুর ৩৮। খেটে মারী ৩৯। সুতোর পুকুর ৪০। টেমা পুকুর ৪১। কানা পুকুর ৪২। জোড়া পুকুর ৪৩। খেটে মারীর পুকুর ৪৪। বারিদ পুকুর ৪৫। চাতরা ৪৬। জোড় বাংলা ৪৭। আবদুল্লাহর পুকুর ৪৮। বন্যে গাড়ী ৪৯। গুজরে গেড়ে ৫০। তেতুল তলা ৫১। হয়তা ৫২। কালুখার দীঘি ৫৩। নাককাটি ৫৪। সানাইদার ৫৫। ধানকুনী ৫৬। মদন পুকুর ৫৭। কাইচি কাটা ৫৮। নাথ পুকুর ৫৯। ঘোলা পুকুর ৬০। মান্দার তলা ৬১। মন্দির পুকুর ৬২। খড়দীঘি ৬৩। দুখো ৬৪। ভাতের ঢিবে ৬৫। সুখো ৬৬। জোলা পুকুর ৬৭। চৌধুরী পুকুর ৬৮। ইনসানের পুকুর ৬৯। উবো গর্ত ৭০। আইন্দো পুকুর ৭১। সিমলে পুকুর।

হরিনাকুন্ডুর দিগনগর গ্রামে একটি প্রাচীন পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। যশোর শহর সংলগ্ন কারবালা পুকুর ও পিকনিক কর্ণারের পুকুর দু'টিও প্রাচীন পুকুর।

সিপাহী যুদ্ধে যশোর ঃ

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে যশোর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। এর কারণ ছিল সিপাহী যুদ্ধে আক্রান্ত এলাকা থেকে যশোর ছিল বেশ দূরে। 'তবে যুদ্ধের সময় যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট কিছু সন্ত্রাসবাদী পুস্তিকা পান যা পরবর্তীকালে ক্ষয়িষ্ণু ওহাবীদের তৎপরতা বলে প্রমাণিত হয়। ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের পর যশোরে কিছু উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। জি, এন, ডড্ যশোরের দেশীয় জগণের উত্তেজনা এবং উত্তেজনা প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের তথ্য প্রদান করেছেন।'[১]

১. রতন লাল চক্রবর্তী-সিপাহী যুদ্ধে যশোরঃ যশোর পরিচিতি-৩য় সংখ্যা-পৃঃ ১০৭।

www.pathagar.com

নীল বিদ্রোহে যশোর ঃ

'যশোর জেলায় সর্ব প্রথম নীল কারখানা স্থাপন করেন মিঃ বন্ড। ১৭৯৫ সালে তিনি রূপদিয়াতে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। তার পরের বৎসর ১৭৯৬ সালে মিঃ টেলর কয়েকটি কুঠি স্থাপন করেন। যশোরের নিকটবর্তী বারান্দী পাড়া ও নীলগঞ্জে এন্ডারসন সাহেব নীল কুঠি স্থাপন করে নীলের কারবার ফেঁদে বসেন। নীলগঞ্জে এতো অধিক পরিমাণে নীল আমদানী হতো যার ফলে নামকরণ হয় নীলগঞ্জ। বাইরে রপ্তানির জন্য নীলগঞ্জে একটি বাজারও প্রতিষ্ঠিত হয়।'[১]

যশোর ও নদীয়ায় এত বিপুল পরিমাণে নীল উৎপন্ন হত যে, ইংল্যান্ড ও পৃথিবীর বিভিন্ন বাজারে নীল বিপণীতে ভরে যায়। ১৮১৫–১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার নীলের চাহিদা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ছিল। যশোর ও নদীয়ার উৎকৃষ্ট নীল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।'[২]

এ ব্যপারে Indeg commission Report উল্লেখ আছে, The indigo manufacfured in this side of India is of prime quality and that of lower Bengal. especially which is duced in the district of Noddea and jessore, is probably the very finest in the whole world. (para-12, p-21) Bengal under the Lieutenant - Gover (Vol-1, p-258) গ্রন্থে উল্লেখ আছে– The finest indego that the world produces is, I believe generally admitted to be that of Bengal, and secdon to none is the indigo of jessore indigo is still the finest in India.

'নীল চাষের কারবারে কয়েকটি কুঠি বা চাষের এলাকা একত্রে কানসরণ বা হৌস নামে পরিচিত। যশোর এবং নদীয়ার বিখ্যাত কানসরণ গুলি মোল্লাহাট কানসরণ, কাঠগড়া কানসরণ, হাজরাপুর কানসরণ, সিন্দুদিয়া কানসরণ, জোড়াদহ কানসরণ, খড়গড়া কানসরণ, ন' হাঁটা কানসরণ, খাবুখালি কানসরণ, শ্রীকোল নহাটা কানসরণ, শ্রীখন্ডি হরিপুর ও নিশ্চিন্তপুর কানসরণ, রামনগর কানসরণ, মদন ধারী কানসরণ ইত্যাদি। খুলনাকে আদি যশোর জেলার আওতাভুক্ত করে কানসরণ গুলির হিসাব করা হয়েছে, তাছাড়া বর্তমান নদীয়া জেলারও সীমা পূর্বে এমন ছিলো না।উল্লেখিত কানসরণ গুলিতে প্রায় ৮০টি কুঠি ছিল। যশোরের বিখ্যাত মোল্লাহাটিতে ১৭টি কুঠি এবং কাঠগড়া কানসরণে ছিলো ৬টি কুঠি। সমস্ত কুঠিতে আশী হাজারেরও অধিক বিঘা জমিতে প্রতি বছর নীল চাষ হত। নীল উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ প্রায় ১৮,৪৬২ মনেরও বেশী।[৩]

---

১. যশোর পরিচিতি-৩য় সংখ্যা-পৃঃ–৭৫।

২. হোসেন উদ্দিন হোসেন–যশোরাদ্য দেশ–পৃঃ১৫২।

৩. সতীশ চন্দ্র মিত্র–যশোর–খুলনার ইতিহাস ২য় খন্ড পৃঃ ৭৭১

www.pathagar.com

'১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সব নীল ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে, তাদের মধ্যে ডেভরেল(Devrell) ব্রিসবেন (Brisbane), টেলার (Taylor), নুডসন (Knudson), রিভস (Reaves), রিজেট (Rezet) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঝিনাইদহের নিকটবর্তী হাজরাপুরে ডেভরেল সাহেবের কুঠি ছিল। কোটচাঁদপুরের নিকটবর্তী দাঁতিয়ার কাটীতে ছিল ব্রিসবেনের কুঠি। মীরপুরে ছিল টেলার এবং নুডশনের কুঠি। রিভসের কারখানা ছিল সিন্দুরিয়ায়। ন'হাটায় ছিল রিজেট সাহেবের কুঠি। ঝিকরগাছায় কুঠি ছিল জেংকিন ও মেকিঞ্জি সাহেবের।'[১]

নীল চাষ করানোর জন্য ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী এদেশীয় কৃষকদের ওপর নানাভাবে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালাতে থাকে। অত্যাচারের মাত্রা কত তীব্র ছিল তা সেই সময় প্রচলিত একটি বাক্য থেকে জানা যায় "মনুষ্য রক্তে কলঙ্কিত না হইয়া কোন নীলের বাকস ইংল্যান্ডে যাইত না।"

'প্রতিদিনের অসহ্য অত্যাচার, অবমাননা, অমানবিক ব্যবহার প্রজা সাধারণের অন্তরে এমনি বেদনা ও অসহ্য চাপের সৃষ্টি করেছিল যে, একদিন তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। বিশেষত নীল চাষ ব্যবস্থা চালুর সাথে সাথে অত্যাচারের সূচনা, আর তখন থেকেই বিদ্রোহ বহ্নির উৎপত্তি। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বিরোধ শুরু হয়।'[২]

'যশোর জেলায় সর্বপ্রথম নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় চৌগাছায়। তারপর বর্তমান মহেশপুর থানার অন্তর্গত ইলিশমারি কুঠির পার্শ্ববর্তী গ্রাম নারায়ন পুর ও বড়খান পুরে কৃষকেরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বনগাঁর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এক সাক্ষ্যে জানা যায় যে, নীল বুনা নিয়ে কুঠীয়ালদের সংগে কৃষকদের এক বিবাদ বাঁধে। তাতে সশস্ত্র কৃষকেরা বাগদা থানা আক্রমণ করে। ঝিকরগাছার বেনেয়ালী গ্রামেও এই ধরনের এক সশস্ত্র হামলার কথা জানা যায়। কৃষকদের বিদ্রোহে অনেক নীলকুঠি ধবংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল।'[৩]

চৌগাছা–মহেশপুরের এই বিদ্রোহই একদিন সারা দেশ ব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং এক সময় নীলকর সাহেবদের পতন অবসম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো।

নীল বিদ্রোহে যশোরে যারা নেতৃত্বদেন তারা হলেন– চৌগাছার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, পলুয়া মাগুরার শিশির কুমার ঘোষ, চন্ডিপুরের শ্রীহরি রায় (জমিদার), সাধু হাটির মধুরানাথ আচার্য (জমিদার)। এ ক্ষেত্রে অন্য যাদের নাম করা যায়– আবদুল লতিফ (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরা–১৮৫৩), নীল চাষী আহসান উল্লাহ মন্ডল, জাকের মন্ডল, তোতা গাজী, প্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ গাঙ্গুলী,

---

১. হোসেন উদ্দীন হোসেন–যশোরাদ্য দেশ –পৃঃ১৫১

২. যশোর পরিচিতি–৬ষ্ঠ সংখ্যা–১৪৭ পৃঃ

৩. হেসেন উদ্দীন হোসেন–যশোরাদ্য দেশ–১৬১পৃ।

www.pathagar.com

কেদার নাথ ঘোষ, উকিল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারায়ন পুরের বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার প্রমূখ।

ভাষা আন্দোলনে যশোর ঃ

অন্যান্য আন্দোলনের মত ভাষা আন্দোলনেও যশোর বাসীর অংশ গ্রহণ সত্যিই চোখে পড়ার মত। তৎকালীণ সময়ে রাজধানীর সাথে বর্তমানের মত উন্নত কোন যোগাযোগ যশোর শহরের ছিল না। তবুও বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে যে সংবাদ টুকু এসে পৌছেছিল তাতেই যশোর বাসী ফুসে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের মার্চের আন্দোলনটাই ছিল প্রকৃত আন্দোলন। যশোরের ছাত্র সমাজসহ সকল স্তরের জনগণ এই মার্চের আন্দোলনেই স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে এখানে পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, মিছিল, হরতাল, ইত্যাদি সকল কিছুই হয়। ১১ই মার্চ সংগ্রাম পরিষদ বিশাল এক মিছিল বের করে শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি তৎকালীন টেডিং ব্যাংক ময়দানে এসে জনসভায় রুপান্তরিত হয়। কিন্তু দেখা যায় সভা শেষ হতে না হতেই এলাকাটি পুলিশ ঘিরে ফেলে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার শুরু করেছে। যারা গ্রেফতার হলেন, 'জনাব মসিয়ুর রহমান, এস, এম, এইস জিন্নাহ, রঞ্জিত মিত্র, কাজী আবদুর রকীব, কমরেড অনন্ত মিত্র, পবিত্র কুমার ধর, রবিকুমার সাহা (বর্তমানের পিপলস রেডিওর মালিক–এখন বেঁচে নেই), হবিবর রহমান (মরহুম খান বাহাদুর লুৎফর সাহেব এর ভ্রাতা। পরবর্তীকালে খোলডাঙা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন)। খয়েরতলা নিবাসী লুৎফর রহমান, তৎকালীন যুবনেতা দড়াটানার আবদুর রাজ্জাক ও গোলাম মোর্ত্তজা (চ্যাপ্টা)। হবিবর রহমান ও লুৎফর রহমান বর্তমানে বেঁচে নেই। সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা সৈয়দ আফজাল হোসেন গ্রেফতার হলেন বর্তমান পাবলিক হেলথ ইঞ্জিয়ারিং অফিসের সামনের রাস্তা থেকে।'[১]

১১ তারিখের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১২ তারিখে মিছিল বের হয় কিন্তু ১৩ তারিখের মিছিলটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ মিছিলে সাধারণ জনগণ বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত অংশ গ্রহণ করে। মিছিলটি যখন কালেক্টরেট ভবনের দিকে আসছিল তখন দড়াটানাতে পুলিশ কতৃক বাঁধা প্রাপ্ত হয় এবং উভয়ের ভেতর সংঘর্ষ বাঁধে। প্রচন্ড সংঘর্ষে উভয় পক্ষের প্রচুর আহত হয়। এমনকি তৎকালীন ও,সি জব্বার সাহেবের একটি কান ছিড়ে যায়। ফলে 'পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করতে থাকে এবং গ্রেফতারকৃতদেরকে বেদম প্রহার

১. যশোর পরিচিতি–২য় সংখ্যা–পৃঃ ৭৩।

www.pathagar.com

করতে থাকে। ছাত্রদেরকে খুঁজতে গিয়ে অনেকের বাড়ীর অভিভাবকদের উপরও পুলিশ নির্যাতন চালায়। যশোরে ঐদিনের পুলিশী নির্যাতন সমসাময়িক কালের অতীত সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে।'[১]

সংগ্রাম পরিষদের যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা হলেন– আলমগীর সিদ্দিকী, রঞ্জিৎ মিত্র, হামিদা সেলিম, সৈয়দ আফজাল হোসেন, আফসার সিদ্দিকী, সুধীর কুমার রায়,দেবীপদ চট্টোপাধ্যায় (মানিক), অশোক ঘোষ, সুনীল রায়, হায়বতুল্যা জোয়ার্দ্দার, কাজী আবদুর রকীব প্রমূখ। পরবর্তীকালে আন্দোলনের বিস্তৃতির সাথে সাথে যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যুক্ত হন তারা হলেন, 'তদানিন্তন কংগ্রেস নেতা ডাঃ জীবন রতন ধর' (যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিম বঙ্গের জেল মন্ত্রী নিযুক্ত হন), মুসলিম লীগ নেতা তরুণ আইনজীবি জনাব মসীয়ুর রহমান (পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে শহীদ হন), শ্রী অনন্ত মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট আবদুল খালেক (যিনি হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভায় শ্রম মন্ত্রী নিযুক্ত হন) প্রমূখ নেতৃবৃন্দ।'[২]

বিধবা বিবাহে যশোর ঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই (Act xv of 1856) বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এতে করে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে সারা ভারতে ঝড় বইতে শুরু করে। এ আন্দোলন যশোরকে তীব্র ভাবে নাড়া দেয়। বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হবার প্রায় ৩০বছর পর ১৮৮০ সালে এর বিপক্ষে 'যশোর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা' গঠিত হয়। এ সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সমুহ মুদ্রিত হত। যশোর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'র মূল উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম সংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ধর্মের উপর কেহ আঘাত করিলে, সেই আততায়ীকে নিরস্ত করা সভার অবশ্য কর্তব্য কর্ম।'[৩] বিধবা বিবাহকে তারা শাস্ত্র সম্মত মনে করত না। সভার মুদ্রিত বিবরণী থেকে জানা যায় ঃ'সভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন দিবসে পন্ডিতগণ যখন অনূন্য পঞ্চ সহস্র লোকের সমক্ষে শাস্ত্র সমুদ্র তর্কদন্ত দ্বারা মন্থন করত কমনীয় বক্তৃতারূপ অমৃতসিঞ্চন করিয়া বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা বিধৌত

১. যশোর পরিচিতি, ২য় সংখ্যা–পৃঃ ৭৬।

২. প্রাগুক্ত–পৃঃ ৬৮–৬৯।

৩. বিনয় পত্রিকা –৫২৫ পৃঃ।

www.pathagar.com

করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব ও মর্ম শাস্ত্রার্থ পিপাসু শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রতিপন্ন করেন'ইত্যাদি'।[১]

এর প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর বেনামীতে দু'টি বই রচনা করেন। 'এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোপস্য" নামে রচিত "ব্রজ বিলাস" এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে "কস্যচিৎ তত্ত্বন্বেষিণ" নামে রচিত "বিধবা বিবাহ ও যশোর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'। দুটি গ্রন্থই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে।'[২]

'যশোর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'র একুশ জন সভ্য ছিলেন। এর মধ্যে ব্রজ নাথ বিদ্যারত্ন হচ্ছেন তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ নবদ্বীপের তথা সমগ্র বাংলাদেশের সর্ব প্রধান স্মার্ত বা শাস্ত্রীয় বিধান দাতা হিসাবে সন্মানিত।'[৩]

এর বিপরীতে বিধবা বিবাহের পক্ষে যিনি ছিলেন তিনি হলেন যশোরের নলডাঙ্গার রাজা প্রমথ ভূষণ দেবনাথ। তাঁর সমন্ধে তৎকালীন আমলের রক্ষণশীল সাময়িক পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ৭৩ ভাগের ১২১সংখ্যায় লিখেছে, 'যশোহর আদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ত্রিবিধ বর্ণের প্রধান সমাজ এবং এ প্রদেশে অনেক বড় বড় ভূমধ্যধিকারী আছেন, নলডাঙ্গার রাজ পরিবার ধনে মানে কুলেশীলে কাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।'[৪]

শোনা যায় 'যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'র পক্ষথেকে বিদ্যাসগর কে হত্যার পরিকল্পনাও করা হয়। এর বাস্তবতাও পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর সমন্ধে ঐ সভার প্রধানের মতামত থেকে, 'বুদ্ধিহীন এই লোকটা বিধবা বিবাহে হাত দিয়ে সুপবিত্র সাধু সমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হয়েছেন, সকল লোকের গালাগালি খাচ্ছেন ও এই উপলক্ষে দেনা গ্রস্থ হয়েছেন। এই বিশ্রী ঝকমারী কান্ডে লিপ্ত হয়ে তাঁর নিজের নাকালের চূড়ান্ত হয়েছে এবং পূন্যভূমি ভারত বর্ষকে বিশেষতঃ পরম পবিত্র গৌড় দেশকে সর্বোপরি সোনার লঙ্কা যশোর প্রদেশকে একেবারে ছারখার করতে বসেছেন। বাস্তবিকই এমন বাঁদরামি, এমন পাগলামি, এমন মাতলামি কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন আমার এরূপ বোধ হয় না।'[৫]

যাহোক বিধবা বিবাহে যশোর সমগ্র বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশকে আন্দোলিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতা যুদ্ধে যশোর ঃ

স্বাধীনতা যুদ্ধে যশোরের ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সারা দেশে

---

১. বিনয় পত্রিকা–৫২৬ প্রঃ।
২. যশোর পরিচিতি, ৪র্থ সংখ্যা– পৃঃ ২২।
৩. প্রাগুক্ত–পৃঃ–২৬।
৪. বিনয় পত্রিকায় উদ্বৃত–৫২৫ প্রঃ।
৫. যশোর পরিচিতি, ৪র্থ সংখ্যা–পৃঃ–৪৪।

www.pathagar.com

যে ৭জন শহীদকে বীরশ্রেষ্ঠ হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তার দু'জনই এই যশোরের সন্তান। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই যশোরের সাধারণ জনগণ প্রথম থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

২৭ মার্চ দিন গত রাতে বাঙালী সৈন্য ও পাঞ্জাবী সৈন্যদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। ঐ সময় যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাঞ্জাবী সৈন্য ছিল ৩,০০০ জন এবং বাঙালী সৈন্য ছিল ১৩০০ জন। ঐ রাতেই বাঙালী সৈন্যরা কিছু অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে জগদীশপুর ক্যাম্পে এসে হাজির হয়। ক্যাম্পে ঢুকেই তারা ক্যাম্পের সুপারভাইজার ও তিনজন পাঞ্জাবী সুবেদারকে গ্রেফতার করে এবং অস্ত্রাগার লুন্ঠন করে। মূলতঃ সশস্ত্র যুদ্ধের এখানেই শুরু। এরপর যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলে গণবাহিনী (মুক্তি যোদ্ধা) ও পাক সেনাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে খন্ড যুদ্ধ হয়েছে। নভেম্বরের ২০ তারিখে মিত্র বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ডিসেম্বরে পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বাঙালী রেজিমেন্ট, গণবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকসেনারা ৭ ডিসেম্বর যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে খুলনার দিকে রওয়ানা হয়। অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর '৭১ যশোরাঞ্চল মুক্ত হয়। এটাই বাংলাদেশের প্রথম মুক্ত অঞ্চল।

যশোর অঞ্চল ছিলো ৮ নং সেক্টরের অধীন। ৮নং সেক্টরের প্রথম দিকে কমান্ডর ছিলেন লেঃ কর্ণেল এম, এ, ওসমান চৌধুরী। পরবর্তীতে এ দায়িত্বে আসেন মরহুম লেঃ কর্ণেল এম, এ, মঞ্জুর। কর্ণেল মঞ্জুর তার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। ২৭ মার্চ ৭১ তারিখে বাঙালী সৈন্য ও পাঞ্জাবী সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার পর পাঞ্জাবীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ৩০ মার্চ তারিখে তারা যশোর শহরে ঢুকে পড়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে। যশোর শহরের হত্যাযজ্ঞ ছিলো অবর্ণনীয়। এর পর তারা ক্যান্টনমেন্টের আশপাশের গ্রাম গুলোতে হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করে। সাথে সাথে গ্রাম গুলো আগুন দিয়ে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আর যশোর ক্যান্টনমেন্ট পরিণত হয় গণ কবরে। ১৬ই ডিসেম্বর ৭১ এর পর থেকে যশোরের ক্যান্টনমেন্ট থেকে অসংখ্য মৃতের মাথার খুলি আবিস্কার করা হয়।

যশোরের শহীদ বুদ্ধিজীবী ঃ

গত স্বাধীনতা যুদ্ধে যশোরেও বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হন। তাদের ভেতর উল্লেখ যোগ্য হলেন, শহীদ মশিউর রহমান, শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদ শেখ আবদুস সালাম, শহীদ এ, এন, এম, মনিরুজ্জামান, অমল কৃষ্ণ সোম, শহীদ শিকদার হেদায়েতুল ইসলাম, শহীদ মোহাম্মদ এলাহী বক্স, শহীদ গোলাম মহিউদ্দীন আহম্মেদ, শেখ হাবিবুর রহমান সুকুর রহমান, শামসুদ্দোহা, লুৎফুন নাহার হেলেনা প্রমূখ।

যশোরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঃ

যশোর দেশের সবথেকে প্রাচীন জেলা শহর হওয়ার কারণে এখানে বেশ কিছু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সে গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

www.pathagar.com

যশোর পৌরসভা ঃ

১৮৬৪ সালে বৃটিশ সরকার পৌর আইন প্রবর্তন করেন। ঐ বছরে ১৩ জুলাই বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের ঘোষণা মোতাবেক ১ আগস্ট যশোর পৌরসভা গঠিত হয়। পদাধিকার বলে সভাপতি নিযুক্ত হন মিঃ মলোনী। কমিশনার নিযুক্ত হন মিঃ টি, টি, অ্যালেন, মিঃ জে, ককবার্ন, মিঃ জে, সি, শ, মৌলভী গয়রাতুল্লাহ, বাবু আনন্দ মোহন মজুমদার, বাবু মদন মোহন মজুমদার এবং রাজা বরদাকান্ত রায় বাহাদুর।

এ বছরেরই শেষ দিকে পৌর সভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। মনোনয়ন পান সর্ব জনাব মৌলভী ওবায়দুল্লাহ খান, বাবু রামদাস ব্যানার্জী, বাবু নবীন চন্দ্র বোস, বাবু মধু সূদন ঘোষ এবং কেশব লাল রায়।

দেশী কমিশনারদের মধ্যে সর্ব প্রথম যিনি পৌর সভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করার গৌরব অর্জন করেন তিনি হলেন, মৌলভী ওবায়দুল্লাহ খান। তারিখটা ছিলো ১৮৬৫ সালের ৪ জানুয়ারী।

মহেশপুর পৌরসভা ঃ

বৃটিশ প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মহেশপুর পৌরসভা। লর্ড মিন্টন এ পৌরসভার প্রতিষ্ঠাতা। এ সময় মহেশপুর জমিদারী সভার যারা মেম্বর ছিলেন তারাই পৌরসভার কমিটিতে ছিলেন। এ জমিদারদের নামহলো (১) প্রফুল্ল চন্দ্র রায় চৌধুরী (২) অবনীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী (৩) সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় (৪) প্রমথ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (৫) জগত তারিণী দেবী (৬) সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী (৭) অবিনাশ চন্দ্র রায় চৌধুরী (৮) সমরেশ রায় চৌধুরী (৯) সুনীতি বালা দেবী (১০) সুধীর মুখোপাধ্যায় (১১) সুধাময় রায় চৌধুরী (১২) কালিদাসী দেবী (১৩) কমলেশ রায় চৌধুরী (১৪) শিবপদ রায় চৌধুরী।

যা'হোক পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু আগেই অর্থাৎ ১৭৭২ সালে মহেশপুরে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছর আগে ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মহেশপুর হাই স্কুল।

কোটচাঁদপুর পৌরসভা ঃ

১ জুলাই ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কোটচাঁদপুর পৌরসভা। প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ ক্যাসেল, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৮৩–১৮৯২)। পৌরসভা প্রতিষ্ঠাকালে যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব জড়িত ছিলেন, মিঃ সিনোলার ম্যাকলিয়ড (১৮২৫–১৮৮৫), ব্যারিস্টার ঈ, জি, ম্যাকলিয়ড (১৮৫০–১৯২১), জনাব উজির আলী সরদার (১৮৪১–১৯৫২), জনাব তাজউদ্দীন আহম্মদ (১৮৪৫–১৯১৮), জনাব হারুন আলী বিশ্বাস (১৮৫০–১৯২৬) ও বাবু অটল বিহারী সেন (১৮৩৩–১৮৯৫)।

www.pathagar.com

যশোর পাবলিক লাইব্রেরী ঃ

উপমহাদেশের প্রথম পাঠাগার অর্থাৎ 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার', মেদিনীপুর, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে। এর মাত্র ৩ বছর পর ১৮৫৪ সালে 'যশোর পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এ বছর আরো প্রতিষ্ঠিত হয়, বগুড়া উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী, বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী ও হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী। একথা ঠিক যে, বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম এবং সমৃদ্ধ পাবলিক লাইব্রেরী যশোর পাবলিক লাইব্রেরী। এ সম্বন্ধে মোহাম্মদ সা'দাত আলী বলেন, '১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদশের অন্যতম প্রাচীন যশোর পাবলিক লাইব্রেরী এখনো কাঙ্খিত রূপ লাভ করেনি; যদিও একথা স্বীকৃত যে বাংলাদেশে যশোর পাবলিক লাইব্রেরীই সর্ববৃহৎ এবং সফল বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠান যা মুক্ত জ্ঞান চর্চা ও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আত্ম নিবেদিত।''[১]

যশোর পাবলিক লাইব্রেরীর রয়েছে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এ লাইব্রেরী দেশের প্রথম বই ব্যাংক [আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় বই ব্যাংক] এর ব্যবস্থা করেছে। এ বই ব্যাংকের অধীনে এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টির মত ভ্রাম্যমান পাঠাগার যশোরের গ্রামাঞ্চলে গড়ে তোলা হয়েছে।

যশোর পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে দেশী-বিদেশী প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বইয়ের সমাবেশ রয়েছে।

---

১. আমিরুল আলম খান সম্পাদিত-স্বরবর্ণ- ৭৫ পৃঃ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলাম

আরব আজম থেকে বাংলা ভূ-খন্ডে কবে কিভাবে ইসলামের আলো এসে পৌঁছেছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই বাংলায় ইসলামের দাওয়াত এসে পৌঁছে। যতদূর জানা গেছে রসূল (সঃ)-এর মাতুল সাহাবী আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-ই প্রথম ইসলাম প্রচারক যিনি সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আগমন করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, রসূল (সঃ)-এর আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই ভারত উপমহাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন বলেন, 'হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমল থেকেই ভারতের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।'[১]

এ সম্পর্কে খালিক আহমদ নিযামী লিখেছেন-

India's relation with the Arab world go back to hoary past long before the rise of Islam, there was brisk commercial contact between India and Arabia and the Arab traders carried Indian goods to the European markets by way of Egypt and Syria. Elphinstone has rightly observed that from the days of Joseph to the days of Marco Polo and Vasco de Gama the Arabs were the captains of Indian commerce. There were large number of Arab colonies on the western coast of India and many Indian settlements in the Arab countries. Ubulla, for instance, was known as arz-ul-Hind on account of the large number of Indians who inhibited that region. When Islam spread and the Arabs got converted to Islam, these colonies continued to flourish as before. The Indian rajas appointed muslim judges, known as hunurman, to decide their cases and provided all facilities to them to organize their community life. Commercial contact led to cultural relations and while large number of Arab navigational and other terms were adopted by the Indians, Indian customs, institutions and practices found their way to Arabia. Philologists have traced three Sanskrit words misk (Musk), zanjbil (ginger), and kafur (camphor)- in the Quran.[2]

---

1. Elfinstone: History of India.
২. কে, এ, নিযামীঃ ডঃ মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত-'এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকা।

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণেই আরব ও ভারতীয়দের সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জানা যায় ভারতীয়দের পক্ষ থেকে রসূল (সঃ) সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী উপহার পেয়েছিলেন। এমনকি আচার পর্যন্ত উপহার পেয়েছিলেন। একজন ভারতীয় রাজার পক্ষ থেকে 'রসূল (সঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর অসুস্থ্যতার সময় আরবে অবস্থানরত একজন ভারতীয় চিকিৎসককে অবহিত করা হয়। এ কথা ইমাম বুখারীর বর্ণনাতে পাওয়া যায়। অপরদিকে হযরত হোসাইন (রাঃ)–এর এক স্ত্রী ছিলেন ভারতীয় মহিলা। যিনি হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহঃ)–এর মাতা ছিলেন।

মহানবী (সঃ)–এর আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরবগণ ব্যবসা–বাণিজ্যে পারদর্শী ছিলেন। কারণ ব্যবসায় ছিল তাদের জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। যার জন্যে তাদের ছিল শক্তিশালী বাণিজ্যিক বহর। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই তাই হিমালায়ন উপমহাদেশের সাথে গড়ে উঠেছিল তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

'তাদের বাণিজ্য বহর আরব সাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্মি ও মালয়েশিয়ার উপকূলে পাড়ি জমাতো এবং আরো উত্তরে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে গাঙ্গেয় মোহনায় নোঙ্গর করতো, অষ্টম ও নবম শতকের চট্টগ্রাম ও আরাকানের ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে ইসলামের প্রথম যুগে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেও ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলোতে একমাত্র এ পথেই ইসলামের দাওয়াত শিকড় গেঁড়ে বসে এবং বাংলার দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলেও এ পথেই অষ্টম শতকে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলো অনুপ্রবেশ করে বলে অনুমান করা হয়।'[১]

'মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমানে কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে মক্কা গমন করেন।'[২]

রাজা চেরুমাল পেরুমাল সরাসরি রসূল (সঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন বলে শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর "তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী বা'যে আহওয়ালিল বারতাকালীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আরব দেশের একদল লোক জাহাজযোগে মালাবারে আগমন করেছিলেন। তাঁদের প্রভাবেই রাজা চেরুমাল–পেরুমাল ইসলামে বায়আত হন। এরপর ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সাথে সাক্ষাত লাভ করার বাসনা নিয়ে রাজা একদল লোকসহ মক্কা শরীফে পৌঁছান। রাজা নবী (সঃ)–এর জন্য কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে আদা এবং এ দেশে নির্মিত একটি মূল্যবান তরবারীও ছিল। রসূল–ই করীম (সঃ) সে

১. আবদুল মান্নান তালিব–বাংলাদেশে ইসলাম–পৃঃ ১১।
২. বিশ্বকোষ ঃ ১৪–২৩৪ উদ্ধৃত মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।

www.pathagar.com

আদা নিজে খেয়েছেন এবং সাহাবীগণের মধ্যেও বন্টন করে দিয়েছিলেন।'[১]

আরবদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ভারতের পশ্চিম উপকূল অতিক্রম করার সময় বঙ্গোপসাগর হয়ে যেতো। ফলে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা ছিল। জানা যায়, সপ্তম অষ্টম শতকে বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচল ও সামদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। 'বাংলার উপকূলে তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ও শৎগঙ্গ (বর্তমানে চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর।'[২] 'দক্ষিণের উপকূল পথে এ সময় ইসলামের সত্য বাণী বাংলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের (১২০৪ খৃঃ) পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পথ দিয়ে ইসলাম প্রচারকের দল বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানেই ইসলামের সত্য বাণী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌছাতে থাকে।'[৩]

'খৃষ্টীয় ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারকগণ অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রসুল (সঃ)-এর মাতুল। তাঁর সাথে রসূলুল্লাহর আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন। দলনেতা হযরত আবু ওয়াককাস (রাঃ) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াং টাং মসজিদটি এখনও সমুদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয় জিয়ারতগাহ রূপে পরিচিত হয়ে আসছে।'[৪]

'চীনা মুসলমানদের বই পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত আবু ওয়াককাসের জামাত ৬২৬ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক হিজরী তিন সনে চীনে পৌঁছেছিলেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এঁরা হাবশা থেকে বের হওয়ার পর অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। আর এই নয় বছর সময় সীমার মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারতে এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌছেছে।'[৫]

বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বাংলাদেশের যে উপকূলীয় বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন তা হল চট্টগ্রাম বন্দর, 'বাঙ্গলার পুর্বে ও দক্ষিণে আরখংগ (আরাকান) নামে একটি

---

১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ-মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৯ থেকে উদ্ধৃত।
২. কে, এম, পানিক্করঃ তারিখে হিন্দে কদীম, পৃঃঃ ৬৭।
৩. আবদুল মান্নান তালিব-বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ২২।
৪. মুহিউদ্দিন খানঃ বাংলাদেশে ইসলাম-কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-বাংলা ও বাঙালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা থেকে উদ্ধৃত।
৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিরাট দেশ আছে। চাটগাঁও হচ্ছে তার সামুদ্রিক বন্দর।'[১]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খুরদাবা (মৃত্যুঃ ৩০০ হিজরী) তাঁর 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে বলেন, 'কামরুণ (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে (নদীপথে) পনের বিশ দিনের মধ্যে আনীত হয়।' পরবর্তীকালের আর একজন প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আল ইদ্রিসী (মৃত্যুঃ ৫৪৯ হিজরী) তাঁর 'নুযহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেন, 'সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান।' চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে ডঃ আবদুল করীম এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন প্রমাণ করেছেন।[২]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী যে সময় বঙ্গ বিজয় (১২০১ খৃঃ) করেন, তার অনেক কাল আগে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এই ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর, দরবেশ ও সুফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৩]

চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, এমনকি চাটগাঁ নামটাও আসলে তাদেরই দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপে বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটির অবস্থিতি বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় শাতি-উল-গঙ্গ (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)। তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁ ও চিটাগং-এ রূপান্তর ঘটেছে।[৪]

এ জন্যে মওলানা মহিউদ্দীন খান বাংলাদেশে ইসলাম আগমন সম্পর্কে লিখেছেনঃ

ক) বাংলাদেশে ইসলাম স্থল পথে নয় সমুদ্র পথে এসেছে।

খ) খোদ রসুল-ই-করীম (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবতঃ হিজরতেরও আগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।

গ) বাংলাদেশে সাহাবীর আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা এ দেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী বা তাবেয়ী রেখে গেছেন।

ঘ) অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা এমনকি চীনে ইসলাম

---

১. আবুল ফজলঃ আইন-ই-আকবরী।

২. ডঃ আবদুল করীমঃ চট্টগ্রামে ইসলাম।

৩. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকঃ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পৃঃ ১৬-২০।

4. Dr. A. Rahim- Social and Cultural History of Bangal.

www.pathagar.com

প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণও অংশগ্রহণ করেছেন। কেননা, হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রাঃ) সুদীর্ঘ সফরে প্রতিটি বিরতিস্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোক লস্কর এবং রসদাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল।'[১]

চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ানের বক্তব্য থেকে এই ধারণার ভিত্তি আরো মযবুত হয়। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিলো। এখানে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী ও মেরামত করা হত। এখানকার তৈরী জাহাজ সমগ্র প্রাচ্যে ব্যবহার হত। এ পথে যাতায়াতকারী জাহাজগুলি এ বন্দরে স্বাভাবিকভাবেই যাত্রা বিরতি করতো। এ জন্য ঐতিহাসিকরা মনে করেন রসুল (সঃ)-এর মাতুল হযরত আবু ওয়াক্কাস চীন যাবার পথে এখানে যাত্রা বিরতি করেন। এবং কিছুকাল অবস্থান করেন। এ ব্যাপারে মওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, 'আবু ওয়াক্কাস ও তাঁর সাথীগণ অবশ্যই বাংলার বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিলেন। এবং এখানে বেশ একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে গিয়েছিলেন।'[২]

অন্যদিকে স্থল পথে এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন হয় হযরত উমরের শাসনামলে। এ ব্যাপারে এ, সি, রায় চৌধুরী বলেন, 'হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফত কালে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওফাতের ৩২ বছরের মধ্যে ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তান মুসলমানদের অধীনে আসে। এ সময়ই ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জলসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরীর আগমন ঘটে বোম্বের থানা নামক স্থানে।'[৩]

এ সময়ে কয়েকজন সাহাবীর ভারত আগমনের খবর পাওয়া যায়। সে সমস্ত সম্মানিত সাহাবীগণ হলেন (১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবান (রাঃ), (২) হযরত আছেম ইবনে আমর আত-তমীমী (রাঃ), (৩) হযরত ছুহার ইবনে আল-আবদী (রাঃ), (৪) হযরত সুহাইব ইবনে আদী (রাঃ) ও (৫) হযরত আল হাকাম ইবনে আবিল আ'ছ আস- সাকাফী (রাঃ)।

হযরত ওসমানের (রাঃ) আমলে দু'জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা ইসলাম প্রচারের জন্য ভারত এসেছিলেন। তাঁরা হলেন- (১) হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মর

---

১. মুহিউদ্দীন খানঃ বাংলাদেশে ইসলাম- কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৮৮।

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-বাংলা ও বাংগালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা-১০৫-১০৬ পৃঃ।

৩. এ, সি, রায় চৌধুরীঃ সোশ্যাল, কালচারাল এন্ড ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া।

www.pathagar.com

আত-তামীমী (রাঃ) এবং (২) হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীর ইবনে আবদে শামস্ (রাঃ)।

হযরত আলী'র (রাঃ) আমলেও সাহাবীরা এসেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু কোন নাম পাওয়া যায়নি। তবে হযরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে একজন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। তিনি হলেন, হযরত সিনান ইবনে সালামাহ ইবনে আলমুহাব্বিক আল হুযানা (রাঃ)।

আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালে ৪৪ হিজরীতে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরী স্থলপথে সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজে পৌঁছেন। ৯৩ হিজরীতে (৭১১ খৃঃ) মুহাম্মদ বিন কাসিমের পাঞ্জাব ও মুলতান অভিযানকালে চার হাজার জাঠ সৈন্য তাঁর সাথী হন। বিন কাসিম পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ এলাকা জয় করে অগ্রসর হওয়ার সময় সাওয়ান্দারবাসীরা (তারা সবাই মুসলমান ছিলেন) বিন কাসিমের সাথে মিলিত হন।'[১] এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব বলেন, 'স্থল পথে প্রধানত সিন্ধুর পথে ইসলাম সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তিরানব্বই হিজরীতে (৭১২ খৃঃ) মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকেই সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফতুহুলবুলদান' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বে উসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা সাকাফী, হারেস ইবনে মুররী আবদী প্রমুখ সেনাপতিগণ বার বার সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে এর বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। এমনকি ৪৪ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মুহাল্লাবের পর আবদুল্লাহ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবনে আমর জাদীদী, সিনান ইবনে সালামাহ, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনযির ইবনে জারুদ আবাদী বার বার হিন্দুস্তান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সব অভিযানে মুসলামানরা কখনো সাফল্য আবার কখনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। তবে হিন্দুস্তান জয়ের সপ্ন তারা কখনো বিস্মৃত হতে পারেননি।[২]

বর্তমান বাংলাদেশের রংপুরে ৬৯ হিজরী সনের একটি মসজিদ আবিস্কার হওয়ায় বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন তথ্যের যোগ হয়েছে এবং নতুন করে ভাববার অবকাশ এসেছে যে, এ ধরনের অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি না? এ প্রসংগে 'বাংলা ও বাংলালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থে উল্লেখ করা

---

১. কে, এ, নিযামীঃ ডঃ মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া গ্রন্থের ভূমিকা)।

২. আবদুল মান্নান তালিব- বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৫৯-৬০)।

www.pathagar.com

হয়েছে, 'সম্প্রতি রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কারবালায় নবী-দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের মাত্র আট বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিকের শাসনামলের এই মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন।'[১]

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনর রশীদের (৭৮৬-৮০৯) আমলের একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের কালে প্রাপ্ত মুদ্রাটিতে ১৭২ হিজরী (৭৮৮ খৃঃ) সনের তারিখ খোদিত আছে।

'এ সময় বাংলায় বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের শাসন চলছিল। ধর্মপাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আরাকানের রাজা মহতইঙ্গত চন্দয়ত ও ধর্মপাল সমসাময়িক ছিলেন। অন্যদিকে সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার ময়নামতীতে খনন কার্যের ফলেও কতিপয় আরবীয় মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের রাজত্বের (৮১০-৮৪৫) পর ময়নামতীতে শক্তিশালী দেববংশীয় বৌদ্ধরাজারা রাজত্ব করেন।'[২]

'আমাদের বিশ্বাস কোনো ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলিফার এ মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবতঃ তিনি এই মুদ্রা সঙ্গে লইয়া তথায় প্রচার করিতে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হইয়াছিল।'[৩]

অন্যদিকে কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা আরবীয় মুসলমানরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। তবে ডঃ আবদুল করীম এ ধারণা সংশয় মুক্ত নয় বলে তাঁর চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল মান্নান তালিব বলেন, 'আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীন কাল থেকে আররদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক বলা যেতে পারে। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভুত বলে দাবী করে।

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নানঃ বাংলা ও বাংগালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, পৃঃ ১০৮।
২. আবদুল মান্নান তালিব-বাংলাদেশে ইসলাম পৃঃ ৫৭।
৩. ডঃ এনামুল হক-পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের কোনো কোনো এলাকা যেমন আল করণ, সুলক বহর, বাকালিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এ সবই চট্টগ্রাম তথা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবী ভাষা, আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রনই এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।'[১]

প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা (৭০৩–৭৭ হিঃ) আরাকান ভ্রমণের সময় সেখানে ইন্দোনেশীয় ও বাঙালী মুসলমানদের কলোনী দেখতে পান। এমনকি তিনি মালদ্বীপে বাঙালী মুসলিম রাজ বংশের রাজত্ব দেখেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'পরমাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপ) বাদশাহ হচ্ছেন খাদীজা নাম্নী জনৈকা মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দীন উমর ইবনে সুলতান সালাউদ্দীন সালেহ বাঙালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন, অতপর তাঁর পিতা বাদশাহ হন।'[২]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর (১২০৩ খৃঃ) বঙ্গ বিজয়ের ত্রিশ বছর আগে শাহাবুদ্দীন ঘোরি ১১৭৩ সালে এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। এর অনেক আগেই ভারতে মুসলিম অভিযান শুরু হয়, একেবারে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতকালেই ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় নৌ–সীমায় মুসলমানদের প্রথম রণপোতের আগমন ঘটে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর ওফাতের ৩২ বছরের মধ্যে ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তান মুসলমানদের অধীনে আসে। বসরার গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিম আট শতকের শুরুতে ৭১১–৭১৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু ও মূলতান জয় করেন। ৯৯৫ থেকে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত গযনীর সবুক্তিগীন ও তাঁর পুত্র মাহমুদ ভারতে অভিযান চালান। সবুক্তি গীন রাজা জয়পালকে পরাজিত করে ট্রান্স ইন্ডাস ভূখন্ড দখল করেন। জয় পালের রাজত্বের বাকী অংশ দখল করেন সুলতান মাহমুদ।'[৩]

যা হোক স্থল ও পানি উভয় পথেই ইসলাম প্রচারকগণ বাংলায় ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করতে আগমন করেন। তবে পানি পথেই প্রথমে আগমন ঘটে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যারা সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করেন ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তারা হলেন, 'হযরত মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী (মোঙ্গল কোট), হযরত জালালউদ্দীন তাবরিযী (লাখনৌতি ও পান্ডুয়া, ১২১৬), হযরত মাহমুদ শাহ

---

১. আবদুল মান্নান তালিব– বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৫৯।

২. ইবনে বতুতা–আজায়েবুল আসকার ২য় খন্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯১৩ সালে দিল্লীতে মুদ্রিত, খান বাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন এম, এ কর্তৃক মূল আরবী থেকে উর্দুতে অনুদিত, পৃষ্ঠা–৩২১। আবদুল মান্নান তালিবঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৫৮ থেকে উদ্ধৃত.

৩. মাহাম্মদ আবদুল মান্নান–বাংলা ও বাংগালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, পৃঃ ১৪২।

www.pathagar.com

দৌলাহ শহীদ (শাহজাদপুর, ১২৪০-৭০), শাহ তুরকান শহীদ (বগুড়া), মওলানা তকী উদ্দীন আরাবী (রাজশাহী, ১২৫০ সালের মধ্যে), শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (সোনারগাঁও, ১২৭৮), শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী (সোনারগাও, ১২৭৮), শাহ সুফী শহীদ (হুগলী, ১২৯০), জাফর খাঁ গাযী (উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বংগ, ১২৯৮), সৈয়দ নাসিরউদ্দিন শাহ নেকমর্দান (দিনাজপুর, ১৩০২), শাহ জালাল (পূর্ব বংগ ও আসাম, ১৩০৩), সৈয়দ আহমদ কল্লাহ শহীদ (কুমিল্লা ও নোয়াখালী, ১৩০৩), সৈয়দ আহমদ শাহ তান্নুরী ওরফে মীরান শাহ (ফেনী, ১৩০৩), মওলানা আতা (দিনাজপুর, ১৩০৫-৫০), মখদুম শাহ জালাল উদ্দীন জাহাঁগাশত বুখারী (রংপুর, ১৩০৭), সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আরা (চব্বিশ পরগনা ও খুলনা, ১৩২৪), শায়খ আঁখি সিরাজউদ্দিন (গৌড় ও পান্ডুয়া, ১৩২৫), শায়খ আলাউল হক (পান্ডুয়া, ১৩২৫), সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী, শায়খ হোসাইন যোক্করপোশ ও শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ (পান্ডুয়া, ১৩২৫), শাহ মোল্লাহ মিশকিন, শাহ নূর, শাহ আশরাফ কাবুলী, শাহ বান্দারী শাই ও শাহ মোবারক আলী (চট্টগ্রাম, ১৩৪০), সাইয়েদ রিযা ইয়ামানী (উত্তর বংগ, ১৩৪২-১৩৫৮), রাসতি শাহ ও শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (কুমিল্লা ও নোয়াখালী, ১৩৫১-১৩৮৮), শায়খ নূর কুতুব-উল-আলম, শায়খ আনোয়ার শহীদ, শায়খ জাহিদ (উত্তর ও পূর্ব বংগ, ১৩৫০-১৪৪৭), সাইয়েদুল আরেফীন (পটুয়াখালী, ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে), শাহ লংগর (ঢাকা, ১৪০০ সালের আগে), শায়খ যয়নুদ্দিন বাগদাদী ও চিহিল গাজী (রংপুর-দিনাজপুর, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি), খান জাহান আলী (যশোর-খুলনা-বরিশাল, ১৪৩৭-১৪৫৮), বদরুদ্দীন বদরে আলম শাহিদী ও শাহ মযলিস (১৪৪০), শায়খ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী (১৪৭৭), হাজী বাবা সালেহ (নারায়ণগঞ্জ, পনর শতকের শেষ ভাগ), শাহ সাল্লাহ (সোনার গাঁও, ১৪৮২-১৫৬০), শাহ আলী বাগদাদী (ফরিদপুর ও ঢাকা, ১৪৯৮), একদিল শাহ (চব্বিশ পরগনা, ১৪৯৩-১৫১৯), শাহ মুয়াজ্জাম হোসাইন দানিশমান্দ (রাজশাহী, ১৫১৯-১৫৪৫), শাহ জামাল (জামালপুর, ১৫৫৬-১৬০৬), হাজী বাহরাম সাক্কা (পশ্চিম বংগ), খাজা শরফুদ্দীন চিশতী (ঢাকা, ১৫৫৬-১৬০৬) প্রমূখ।[১]

এছাড়াও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ের আরো কয়েকজন ইসলাম প্রচারকের নাম অবশ্য উল্লেখ করার মত। তাঁরা হলেন- বায়েজিদ বিস্তামী (চট্টগ্রাম মৃঃ ৮৭৪ খৃঃ), শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া, ১০৪৭), শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (নেত্রকোনা, ১০৫৩), বাবা আদম শহীদ (বগুড়া ও বিক্রমপুর, ১১৭৯), মখদুম শাহ শাহদৌলা শহীদ (পাবনা, ১২৪০), শাহনিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (ঢাকা), শাহ মখদুম রুপোশ (রাজশাহী, ১১৮৪), ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ (চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর ১২৬৯ খৃঃ) হযরত বড় খান গাজী (যশোর-খুলনা, তের'শ সালের প্রথম দিকে), পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (যশোর -খুলনা, ১৪০০ সালের মাঝামাঝি) প্রমূখ।

১. মোহাম্মদ আবদুল মানান- বাংলা ও বাংগালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, পৃঃ১৩৩)

www.pathagar.com

যশোর জেলার পীর দরবেশ

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগেই ইসলামের সুমহান বাণী বাংলা ভূখন্ডের মানুষ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কাছে এসে পৌঁছে। খোলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)–এর যুগেই ইসলাম আরব আজমের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ উপমহাদেশ ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠে। ঐ সময়কার উপমহাদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন– শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারীয়া মূলতানী (মৃঃ ৬৬৮ হিঃ), কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুজানি (মৃঃ ৬৬৮ হিঃ), বুরহান উদ্দীন মাহমুদ ইবনে আবুল খায়ের আসাদ বলখী (মৃঃ ৬৮৭ হিঃ), কামাল উদ্দীন জাহিদ (মৃঃ ৬৮৪ হিঃ), রাজী উদ্দীন বদায়ূনী (মৃঃ ৭০০ হিঃ) ও শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা বুখারী হাম্বলী (মৃঃ ৭০০ হিঃ) প্রমূখ।

অন্য একটি সূত্রে জানা যায় রসূল (সঃ)–এর জীবদ্দশায়ই এ অঞ্চলে ইসলামের আলো এসে পৌঁছে। মহানবীর(সঃ) 'সুশিক্ষিত সাহাবা বৃন্দ ইসলামের সত্য জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার বাণী নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে ছিলেন। এ সময় আরবরা ব্যবসা বাণিজ্যেও উন্নত ছিল। তাদের বাণিজ্য বহর দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতো। মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমানে কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে মক্কা গমন করেন।'[১]

'এ সময় (সপ্তম ও অষ্টম শতক) বঙ্গোপসাগর জাহাজ চালাচল ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) ও শৎগঙ্গ (বর্তমানে চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর। দক্ষিণের উপকূল পথে এ সময় ইসলামের সত্যবাণী বাংলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের (১২০৪ খৃঃ) পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পথ দিয়ে ইসলাম প্রচারকের দল বিভিন্ন সময় বিচ্ছন্ন ভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সত্য বাণী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌঁছাতে থাকে।'[২]

যতদূর জানা যায় সমগ্র ভারত উপমহাদেশে আরবীয় বণিক ও সূফী দরবেশদের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। 'বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী ও আলেমগণের নাম অঙ্গাগীভাবে জড়িত। আরব, ইয়ামেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান,

---

১. আবদুল মান্নান তালিব–বাংলাদেশে ইসলাম–পৃঃ ২০

২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সূফী ও আলেমগণ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তাঁরা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের অনেকে একাকী এ দূর দেশে পাড়ি দিয়েছেন। আবার অনেকে নিজের অনুচর বর্গ সহ এ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে আবহাওয়ার যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করেও বসতি স্থাপন করেছেন।'[১]

যশোর-সুন্দরবন অঞ্চলে কে কখন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায় তার কোন প্রমাণ এখন আমাদের হাতে নেই। তবে সপ্তম শতাব্দীতে না হলেও অল্পকিছু কাল পরেই যে সমগ্র ভাটি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচার হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক তথ্য তালাসের পর এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য যে নামটি সবার আগে নিতে হয়, তিনি হলেন হযরত বড় খান গাজী (রঃ)। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যশোর বারবাজারে আসেন। এরপর এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য যে নামটি বহুল পরিচিত, তিনি হলেন হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (রঃ)। তিনিও যশোর বারবাজারে প্রথম আস্তানা গাড়েন। হযরত বড় খান গাজী ও হযরত খান জাহান আলী (রঃ)-এর ইসলাম প্রচারের সূত্র ধরে অনেক সূফী দরবেশ ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। এ প্রবন্ধে যশোরে ইসলাম প্রচারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের উপর কিছু আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। তবে এ দাবী করা যাবে না যে, যশোর অঞ্চলের সব পীর দরবেশদেরকে এ আলোচনায় আনা গেছে।

হযরত বড় খান গাজী (রঃ)

(গাজী-কালু-চম্পাবতী)

যশোর ভূখন্ডের ইতিহাস যত প্রাচীন সেই হিসেবে যশোরে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। অন্তত ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের আগে এখানে ইসলাম প্রচারের কোন ইতিহাস আমাদের জানা নেই। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর জানা গেছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হযরত বড় খান গাজী এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তবে গাজীর ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত মুদ্রিত গবেষণা কর্ম পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা' হল পুঁথি ও কাব্য কাহিনী। আবদুর রহিমসহ অনেকেই গাজী-কালু-চম্পাবতী পুঁথি লিখেছেন। আবদুল গফুর লিখেছেন, 'বড় খাঁ গাজীর কেরামতি', হালু মিয়া লিখেছেন, 'গাজী মঙ্গল', আবদুল জব্বার লিখেছেন, 'গাজী' নামে একটি পুস্তিকা, কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন, "রায় মঙ্গল কাব্য"। অপরদিকে হোসেন উদ্দীন হোসেন তাঁর যশোরাদ্য দেশ গ্রন্থে 'গাজী কালু চম্পাবতী' নামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু কেউই তাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে দেখাবার গরজ অনুভব করেননি। তিনি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি আমরা এখন তা প্রমাণ করার প্রয়াস পাব।

১. আবদুল মান্নান তালিব-বাংলাদেশে ইসলাম-পৃঃ৬৩।

www.pathagar.com

ঠিক সপ্তম শতাব্দীতে না হলেও অল্প কিছুকাল পরেই বাংলা ভাটি অঞ্চলে বিশেষ করে যশোর ও সুন্দর বনাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচার হয়। আমরা এখন যশোরের একজন প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল ও ইসলাম প্রচারক হযরত বড় খান গাজীর (রঃ) সমন্ধে আলোচনা করব। হযরত বড় খান গাজী উপমহাদেশের মানুষের কাছে শুধু গাজী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

যশোরের পীর দরবেশদের কথা বলতে গেলে প্রথম যাঁদের নাম আমাদেরকে নিতে হয় তাঁরা হলেন গাজী ও কালু। গাজী ও কালুর নামের সাথে অন্য যে নামটি এসে যায়, সে নামটি হলো গাজীর স্ত্রী চম্পাবতী । আমার মনে হয় বাংলা ভাষাভাষী এমন কোন লোক হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা 'গাজী-কালু-চম্পাবতী' নাম তিনটি শোনেনি। 'গাজী-কালু-চম্পাবতী' নাম তিনটি এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, এদেরকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতে গেলেই বিপত্তি। কারণ বংশ পরম্পরায় এ নাম আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এখনো ঝিকরগাছা থানার ঘোড়দাহ (ঘোড়াদাহ) গ্রামের ফকিররা 'গাজীর আশা' হাতে ভিক্ষা করে। গাজীর দরগাহ্, গাজীর জাঙাল ছাড়াও যশোর খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ও ছিলো প্রচুর থান। এ থান গুলোতে গাজীকে ওছিলা করে হিন্দু-মুসলমানরা শ্রষ্ঠার দরবারে মানত মানতো ও মানে।

জানা যায়, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বেই ২৫টি ইসলাম প্রচারক দল এ উপমহাদেশে আগমন করে। পরতীতে আরো কিছু দল বাংলাদেশে আসে। তাঁরা রাজনৈতিক গাজী দল বলে পরিচিত। এই দলের যাঁদের নাম জানা যায়, তাঁরা হলেন- 'জায়েদ গাজী, আহমদ গাজী, হুসায়নী গাজী, মুহম্মদ গাজী, মওদুদ গাজী, মুবাশ্বর গাজী, মুমীন গাজী, আমজাদ গাজী, সাবের গাজী, আব্দুল্লাহ গাজী প্রমূখ।[১] এঁদের সবাই যে আরব থেকে এসেছিলেন এমন নয়। তবে অধিকাংশই আরব থেকে এসেছিলেন। এই গাজীদলের অনেকেই যশোর, খুলনা, ২৪পরগনা অঞ্চলকে ইসলাম প্রচারের জন্য বেছে নেন। যশোর শ্রীপুরে ৪ জন গাজীর আগমন ঘটে বলে জানা যায়। এ গাজীদের ভেতর যে নামটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তিনি হলেন ' গাজী-কালু-চম্পাবতী'র নামের সাথে জড়িত গাজী। যতদূর জানা যায় তাঁর পুরো নাম বরখান গাজী । পুঁথিতে গাজীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

"পোড়ারাজা গয়েশদি; তার বেটা সমসদি
পুত্র তার সাই সেকন্দার
তার বেটা বরখান গাজী; খোদাবন্দ মুলুকের কাজী
কলি যুগে তার অবসর
বাদশাই ছিঁড়িল বঙ্গে , কেবল ভাই কালূর সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকীর।"[২]

এখানে 'পোড়া' শব্দটি নিঃসন্দেহে কোন স্থানকে বুঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু

www.pathagar.com

সরাসরি পোড়া নামে কোন স্থান আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে পান্ডুয়ার বিকৃত নাম পেড়ো। সেখান থেকে 'পোড়া' হলেও হতে পারে। এ প্রসংগে ব্লকম্যান সাহেবের মত স্মরণ যোগ্য; 'গাজীপীর হলেন পান্ডুয়ার প্রসিদ্ধ পীর জাফর খাঁ গাজীর পুত্র বড় খাঁন গাজী । তিনি চৌদ্দ শতকে জীবিত ছিলেন।[৩]

গাজী পীর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, অন্য নামে যে গাজীর পরিচয় মেলে তারা অভিন্ন কি না, এ নিয়ে মতভেদ আছে। বিশেষ করে তিন জন গাজীর সাথে তাঁর অভিন্নতার কথা উঠেছে। ব্লকম্যান সাহেবের মত পূর্বেই পেশ করেছি। এখন অন্য দু'টি মত পেশ করছি–ডঃ সুকুমার সেন বলেন,'চৌদ্দ শতকের পীর সুফী খান ষোল শতকের দিকে বড় খাঁ গাজী হিসেবে পরিগণিত হন।[৪] অন্য মতটি হলো –'পনের শতকের বীর যোদ্ধা ইসমাইল গাজী (রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সেনাপতি) বড় খাঁ গাজী হতে পারেন।[৫]

উপরিউক্ত মত গুলোর সাথে আমরা এক মত হতে পারি না। দেখুন ষোল শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ সত্যপীর কাব্যে এদের সমন্ধে কি বলেছেন –

"আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে
এসমাইল গাজী বন্দো গড় মান্দারনে।
বন্দিব জেন্দাপীর কামা এর কুনি
বড়খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পাঁড়ুয়ার সাফিখাঁয়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্যপীরের চরণ।[৬]

ইসমাইল গাজী, সূফী খান ও জাফর খান গাজীকে এখানে ভিন্ন ভাবে দেখা যাচ্ছে।' এঁদের ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে প্রমাণ আছে। এঁদের সঙ্গে বড়খান গাজীর উল্লেখে এটাই প্রতীত হয় যে, তিনি এঁদের সমসাময়িক অথবা অল্প আগে পাছের প্রভাবশালী একজন স্বতন্ত্র পীর ছিলেন।[৭]

পুথি পুস্তক এবং বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিকদের বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গাজীর প্রকৃত নাম বরখান গাজী বা বড় খাঁ গাজী। তিনি বৈরাট নগরের বাদশাহ সেকান্দরের পুত্র । তাঁর মাতার নাম অজুপা বিবি। পুঁথিতে আছে–

'বৈরাট নগর ঘর রাজা শাহ সেকান্দর'[৮]

এই 'বৈরাট নগর' স্থানটি কোথায় এ নিয়েও বিস্তর মতভেদ আছে। বারবাজারের নিকট যে 'বেলাট' নামক গ্রামটি আছে, সেখানকার বাসিন্দাদের দাবি 'বৈরাট নগর' এর বিকৃত নাম' বেলাট' । বিধায় 'বৈরাট নগর' ই মূলতঃ আজকের 'বেলাট'।

কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এম আবদুল কাদের 'যশোরাদ্য দেশ' গ্রন্থের লেখক হোসেন উদ্দীন হোসেন সাহেবের নিকট ২৭–১১–৬৮ইং তারিখে লিখিত এক চিঠিতে লিখেছেন, 'তিনি সমুদ্র পার হইয়া স্থলপথে কিছুদূর গিয়া পুনরায় সমুদ্র উত্তীর্ণ হন। এই

www.pathagar.com

বিবরণ একমাত্র সিলেটের সম্পর্কেই খাটে। সিলেট হাওরের দেশ। হাওর শব্দ সাগর বা সায়র হইতে উদ্ভূত। সিলেটে বিরাট ও নগর নামে দুইটি পাশাপাশি গ্রাম আছে। আর হবিগঞ্জ থানার গাজীপুরে আছে তাহার কবর।"[৯] ঐতিহাসিক আবদুল কাদের সাহেবের মতটিই সব থেকে বেশী গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়।

আর এই শাহ সেকান্দর ছিলেন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৩০১–১৩২২ খৃঃ) ভাগ্নে। জানা যায় এই সময়ে 'শায়খ বোরহান উদ্দীন নামক একজন মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষে তিনি একটি গরু কোরবাণী করেন। একথা জানতে পেরে রাজা গৌর গোবিন্দ গো– হত্যার শাস্তি স্বরুপ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছেদন করার ও নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। রাজার আদেশ কার্যকরী হবার পর শাস্তি প্রাপ্ত মজলুম বোরহানুদ্দীন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের দরবারে উপনীত হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ জানান। সুলতান তাঁর ভাগিনেয় সিকান্দর খানকে সিলেট আক্রমণ করার আদেশদেন।'[১০]

এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, 'গৌর গোবিন্দের অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বুরহান উদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান গৌড়ের সুলতান ফিরোজ শাহের (১৩০২–২২) নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করলে সুলতান গৌর গোবিন্দকে শাস্তি প্রদানের জন্য সিকান্দর গাজীকে এক বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।'[১১]

অন্য মত হচ্ছে সিকান্দর গাজী পরপর দু'বার গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হন। সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ সিকান্দর গাজীর পরাজয়ের খবর শুনে সাতগাঁও এর শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীনকে সিলেটে প্রেরণ করেন। নাসিরুদ্দীন যখন গাজীর সাহায্যার্থে সিলেট রওয়ানা হন, তখন তাঁর সাথে সাতগাঁও অঞ্চলের ইসলাম প্রচারক শায়খ হযরত শাহজালাল ৩৬০ জন সংগী সহ যোগ দেন এবং সিলেট এসে সিকান্দার গাজীর অধীনে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন।

সিকান্দর গাজীর এ বিজয় সমন্ধে ৯১৮ হিজরী সন মোতাবেক ১৫১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটা শিলা লিপিতে এভাবে উল্লেখ আছে–

"শায়খুল মাশায়েখ মাখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সেকান্দার খাঁন গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে(১৩০৩খৃঃ)।"[১২]

যাহোক–'রাজ্য অধিকারের পর সিলেটের শাসনকার্যের ভার অর্পিত হয় সেকান্দর গাজীর উপর। এই সময় থেকেই শুরু হয় ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও রংপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচার। এই সেকান্দার গাজীরই পুত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ নগর বিজয়ী

www.pathagar.com

বড় খাঁ গাজী। মুকুট রায় ছিলেন এই আমলেরই একজন স্বাধীন হিন্দু নৃপতি।[১৩]

গাজী সিলেট থেকে বিভিন্ন ভাবে সুন্দর বন এসে প্রথমে উপস্থিত হন। পুঁথিতে আছে–

ভ্রমিয়া অনেক দেশ
বাংলাতে অবশেষ
বসিলেন সুন্দর বনেতে
সেই খানে চিল্লা নিল
বনে যত বাঘ ছিল
শিষ্য হইল কাছেতে গাজীর।।
ছিল হেন কেরামত
চরাচরে বাঘ যত
সবে তারে মানিল যে পীর।।[১৪]

জানা যায় শিশু কালেই গাজী এক মুর্শিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে দুনিয়াবী লোভ লালসা তার তিরোহিত হয়। 'গাজীর বয়স যখন দশ বছর, শাহ সেকান্দরের ইচ্ছা হলো, তিনি স্বীয় পুত্র গাজীকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে নিজে অবশিষ্ট জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করবেন।'[১৫] কিন্তু গাজী পিতার কথা শোনার পর পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলেন, তার জন্যে রাজ সিংহাসন নয়। তিনি ফকিরী হালতে জীবন কাটানো পছন্দ করেন।

শাহ সেকান্দর পুত্রের মতামত শুনে প্রমাদ গুনলেন। প্রথমে বুঝালেন। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হলো না, তখন তিনি কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করলেন। দেখা গেল তাতেও কিছু হলো না। গাজী ঠিকই একদিন ফকিরী হালতে ভাই কালুকে নিয়ে রাজপুরী ছেড়ে চলে গেছে।

গাজী সুন্দর বনে সাত বছর মত অবস্থান করেন। এখানে থাকা কালে তিনি কঠোর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। জানা যায় বনের বাঘ পর্যন্ত তাকে সম্মান করে চলতো। আদেশ নিষেধ মানতো।

জনাব ওয়াকিল আহমদ 'বাংলার লোক সংস্কৃতি' গ্রন্থে এই সমন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'গাজী পীর (যদি ঐতিহাসিক ব্যাক্তি হন) সতেরো শতকের আগের লোক। হিন্দু লোক সমাজে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা সংস্কার পূর্ব হতে চলছিল। মুসলমান পীর দরবেশ অথবা বিজয়ী গাজী দক্ষিণরায়ের দোসর (Counterpart) হিসেবে প্রথমে মুসলমান ও পরে হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে দেব পূজ্য হয়ে উঠেন ত্রয়োদশ শতকের পরে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লোপ ও ক্রমশঃ দেবত্ব প্রাপ্তিতে বেশ সময় লাগার কথা। ন্যূনপক্ষে দু'এক শতাব্দীর ব্যবধান দরকার হয়। গাজী পীরের সময় সীমা এর আলোকে বিচার করলে চৌদ্দ পনের শতক ধরা যায়। মুসলিম বিজয়ের পর মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতিতে প্রথম দেড়শো দুশো বছর লেগেছিলো।'[১৬]

www.pathagar.com

আমরাও এ ব্যপারে এক মত। কারণ গাজী যখন যশোরের বারবাজারে এসে উপনিত হন তখন তার সাথে হিন্দু রাজাদের যুদ্ধের কথা জানা যায়। কিন্তু হযরত উলুঘ খান জাহান আলী যখন বারবাজারে আসেন ও পরবর্তীতে বাগের হাট যান, সে সময়ে অর্থাৎ খান জাহান আলীর সাথে কোন হিন্দু রাজাদের যুদ্ধের কোন কাহিনী আমরা জানতে পারিনে। এর থেকে এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, খান জাহান আলী (রঃ) এর আগমণের পূর্বেই গাজী এ অঞ্চলে ইসলামের চাষ করেছিলেন।

এবার আসুন গাজীর বারবাজার উপনিত হবার ও পরবর্তী কাহিনী শুনি–

গাজী সুন্দর বন ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে তাঁকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। এই সমুদ্র ধরনের জলাশয় পার হয়ে তিনি যে নগরে এসে পৌঁছেন তার নাম ছাপাই নগর। ছাপাই নগরের বর্তমান নাম বারবাজার। গাজী-কালু যখন ছাপাই নগরে পৌঁছেন তখন ছাপাই নগরের রাজা ছিলেন শ্রী রাম। হোসেন উদ্দীন হোসেন গাজী কালুর ছাপাই নগরে প্রবেশের কাহিনী এই ভাবে লিখেছেন– 'গাজী ও কালু দুজনে নগরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন গাজী ও কালু। তাদের দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলো। লোকমুখে তারা রাজার অনেক দান–খয়রাতের কাহিনী শুনেছিলেন। রাজার দয়ার্দ্র মনের কথা শুনে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন। অবশেষে রাজার দরবারে যাওয়া স্থির করলেন। এক সময় দরবার গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হলেন দু'জনে। কণ্ঠে তাদের ইসলামের তৌহিদ বাণী।'[১৭]

হিন্দু রাজা! মুসলমান দরবেশদের দুঃসাহস দেখে প্রথমে হতবাক হলেন, পরে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। কোতয়াল ডেকে ঘাড় ধরে দূর দূর করে নগরীর বাইরে ফকিরদ্বয়কে বের করে দিলেন। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত গাজী কালু রাজার এহেন দূর্ব্যবহারের জন্য ব্যথাহত মন নিয়ে আল্লার দরবারে হাত উঠালেন।

ও দিকে রাজবাড়ীতে ঘটলো অন্য ঘটনা। অলৌকিক ভাবে রাজবাড়ী সহ নগরীতে আগুন ধরে গেল। আগুনের লেলিহান শিখা সব কিছু গ্রাস করতে লাগল। হঠাৎ করে রাজপুরী থেকে রানী উধাও হলো। সব দেখে শুনে রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। গণক ডেকে জানা গেল মুসলমান ফকিরদ্বয় সাথে দূর্ব্যবহারের কারণেই এ রাজপূরী ও রানীর এই দশা।

গণকের কথা শোনার পর পরই রাজার লোক গাজী কালুকে খুঁজতে বের হলো। তাদেরকে পাওয়া গেল নগরীর কিছুদুরে এক জঙ্গলের ভেতর। রাজা সভাসদ সহ সেখানে গেলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। পুঁথিতে আছে–

"কহেন শ্রীরাম রাজা জোড় করি কর,
আগুন জ্বলিয়া পুরী হৈয়া গেল ছাই,
কোথায় গেলেন রানী খুজিয়া না পাই।"[১৮]

গাজী সুযোগ বুঝে রাজাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন। রাজা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হলেন। গাজী তখন মুঠ ভরে ধুলো নিয়ে আল্লাহর নামে তিন বার

www.pathagar.com

ফুঁ দিয়ে নগরীর দিকে ছুড়ে মারলেন। মূহুর্তে আগুন নিভে গেল। রানীকেও খুঁজে পাওয়া গেল। ছাপাই নগরে শান্তি ফিরে এলো। রাজা তাঁর আধ্যাত্মিক নেতা গাজী-কালুকে অত্যন্ত সমাদরে রাজদরবারে নিয়ে এলেন। গাজীর ইচ্ছে অনুযায়ী দীঘি খনন করলেন, মসজিদ তৈরী করলেন। গাজী কালুকে নিজেই দেখা শোনার ভার নিলেন। পুঁথিতে আছে–

'বসিলেন গাজী কালু পালঙ্কের উপর।
নিজ হাতে রাজা আসি দুলায় চামর।।'[১৯]

এ প্রসংগে অন্য মতটি হলো, 'গাজী সিলেট থেকে সরাসরি সুন্দর বনে এসে উপনীত হন। সেখানে বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেখান থেকে এসে উপস্থিত হন বারোবাজারে। বরোবাজারে ছাপাই নগরের রাজা শ্রী রামের সাথে তাঁর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও মৃত্যু মুখে পতিত হন। পুঁথিতে আছে রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ ঘটনাটি সঠিক নয়। তার কারণ রাজার সাক্ষাৎ বংশধরেরা যশোর জেলার কপোতাক্ষ তীরবর্তী বোধখানা গ্রামে বিভাগ পূর্বকালেও বাস করতেন। রাজার পরাজয় ও মৃত্যুর পর তার শিশু পুত্র অজিত নারায়ন জনৈকা দাসীর সহায়তায় রক্ষা পান। এবং তারই পুত্র কমল নারায়ন রায় বোধখানায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এদের উপাধি ছিল রাজা। এখানকার বিখ্যাত চৌধুরী বংশের তিনি ছিলেন আদি পুরুষ। বাংলার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই বংশের একটি উজ্জ্বল দীপ। বোধ খানায় আজও অবধি তাদের রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান।'[২০]

এই মতটিই আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়েছে। বারবাজারের মাটির নীচের নর কঙ্কাল ও ধ্বংসাবশেষ এই মত গ্রহণের পক্ষেই রায় দেয়।

"গাজীর প্রচেষ্টায় বারোবাজারে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ-মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বারোবাজারে। এখান থেকেই তারা ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন তদানিন্তন দক্ষিণ বাংলায়। তাদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজও নীরব নিথর হয়ে আছে বারোবাজার।"[২১]

বেশ কিছু কাল বারবাজারে অবস্থান করার পর কালুর প্রস্তাব মত গাজী অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। চলতে চলতে একদিন তাঁরা এক গহণ (ঘন) বনে এসে উপস্থিত হলেন। এই বনে এসে এক কাঠুরিয়ার সাথে তাঁদের পরিচয় হল এবং তাঁরা সদলবলে কাঠুরিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কাঠুরিয়ার সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গাজী-কালু সেখানেই আস্তানা গাড়েন। এই আস্তানাকে কেন্দ্র করে যে জন বসতি গড়ে ওঠে পরবর্তীতে তার নাম হয় 'সোনার পুর'।

সোনার পুরে কিছু দিন অবস্থানের পর গাজী আবার অজানার পথে পাড়ি জমান। চলতে চলতে তারা এক সময় একটি নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে এসে উপস্থিত হন।

www.pathagar.com

গ্রামটির নাম কান্তপুর। নদীর তীরের একটি বট গাছের নীচে গাজী কালু আস্তানা গাড়েন। নদীর ওপারে ব্রাহ্মণ নগর। কথিত আছে কোন এক শুভ ক্ষণে গোসল করতে গিয়ে গাজীর ব্রাহ্মণ নগরের রাজকন্যা চম্পাবতীকে গোসলরত অবস্থায় দেখতে পান। পুঁথিতে আছে–

'জলে নেমে গাজী দিকে চাহিয়া চাহিয়া
হাত মাজে, পা মাজে, মাজে আর মুখ
গাজীকে দেখায়ে মাজে কুচ আর বুক।।
কবরী খুলিয়া কেশ দিল আউলাইয়া
কালো মেঘে চন্দ্র যেন ফেলিল ঢাকিয়া।।
কালি হইতে কালো কেশ উড়ায় বাতাসে
গাজীর দিকে চায় বালা হাত দিয়া কেশে।।'[২২]

চম্পাবতীর এহেন কান্ডকারখানা ও রূপ লাবণ্য দেখে গাজী পুলকিত ও আত্মহারা হয়–

'মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন
জিনিয়া চান্দের ছটা চোখের কিরণ।।
ভ্রমরের বর্ণ জিনি লম্বা কেশ মাথে
দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে।।
জোলায় খার কটিতুল্য কটি তার সরু
তাদৃশ্য নিতম্ব আর পিঠ পাছা উরু।।
সুগঠন হস্তপদ কহিব কি মরি
তাহার উপমা নাই ত্রিজগত জুড়ি।।'[২৩]

যাহোক গাজী ও চম্পাবতী উভয় উভয়কেই হৃদয় মন উজাড় করে ভাল বেসে ফেললো। চম্পাবতীর কথায়–

"যৌবন অমূল্য ধন সঁপিনু তোমারে।"[২৪]

শেষ মেষ কালু বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণ নগর উপস্থিত হলেন এবং রাজদরবারে প্রস্তাব পেশ করলেন।

এমনিতে রাজদরবারে মুসলমান দরবেশের উপস্থিতি দেখে রাজা রাগে ফুলছিল, তার ওপর রাজকন্যার সাথে গাজীর বিয়ের কথা শুনে তাঁর গায়ে আগুন ধরে গেল। পুঁথিতে আছে–

'কালুর বচনে রাজা মহা ক্রোধ হৈল
ডাকিয়া কোতওয়াল সবে কহিতে লাগিল।।
ঠেলা দিয়া ফকিরের নিয়া কারাগারে
হস্ত আর পদ বান্ধ লোহার জিঞ্জিরে।।
দশমণি শিলা দেহ বুকের উপর

www.pathagar.com

ইহার কথায় অঙ্গ জ্বলে গেল মোর।'[২৫]

গাজী কালুর পরিণতির খবর পাওয়ার সাথে সাথে সুন্দর বনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং সেখান থেকে তাঁর বাঘ শিষ্যদেরকে সৈন্য হিসাবে সংগ্রহ করলেন। গাজী ব্রাহ্মণ নগরের উত্তারাঞ্চলে এসে শিবির গাড়লেন। রণদামামা বেঁজে উঠলো। একাধারে সাতদিন যুদ্ধের পর রাজা মুকুট রায় পরাজিত হলেন এবং নিহত হলেন। জানা যায় রাজ মহিষী ও অন্যান্য মহিলারা আত্মহত্যা করেন। রাজদরবার সহ রাজপুরী গাজীর অধিকারে আসলো। চম্পাবতী ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং গাজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

এতক্ষণ চম্পাবতী ও গাজীর যে প্রেম কাহিনী, জনশ্রুতি ও পুঁথি থেকে জানা গেল তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে মনে হয়। কারণ কোন রাজ কন্যার পক্ষে সাধারণ গ্রাম্য বালার মত উন্মুক্ত নদীতে গোসল করা যুক্তি যুক্ত নয়। আমাদের জানামতে প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর অন্দর মহলের জন্য, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য গোসল বা ঐ ধরনের কাজের সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা থাকতো। তা'ছাড়া যদি একথা আমরা ধরেও নেয় যে চম্পাবতী নদীতে সত্যি সত্যিই গোসল করতে এসেছিল, তবুও কি একথা প্রমাণ করা সম্ভব যে, নদীর অপর পাড়ে বসে গাজী চম্পার গোসলরত অবস্থা অর্থাৎ হাত মাজা পা মাজা (পরিষ্কার করা), রূপজৌলুস দেখতে পাচ্ছিলেন? সেই সময় ঐ নদীটি কি এতই ছোট ছিল যে গাজী সবকিছু উপভোগ করতে পারছিলেন? আসলে ঘটনা মোটেই তা ছিল না। পুঁথির বর্ণনাই এই মতের বিরোধী। পুঁথি থেকে জানা যায়, গাজী সুন্দর বন থেকে বাঘ সংগ্রহ করে যখন কান্ত পুরের খেয়া ঘাটে এসে পৌছে তখন নদী পারাপারের ব্যাপারে ভীষণ সমস্যায় পড়েন। শেষে ছিরা ও ডোরা নামের দুই সহোদর মাঝির সহযোগিতায় বাঘগুলি পার করা হয়।

এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, নদী যদি প্রস্থে ছোট হত তা' হলে বাঘ গুলি এমনিই পার হতে পারত। তাদের পারাপারের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজনই ছিল না। তাই বলা যায় গাজী ও চম্পাবতীর ভেতর প্রেম ঘটিত কোন ব্যাপার ছিল না। এমনকি চম্পার কারণেও মুকুট রায়ের সাথে গাজীর যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। যুদ্ধ যেটা হয়েছে সেটা আদর্শের কারণেই হয়েছে। তা'ছাড়া,'যে গাজী শৈশব কাল থেকে সকল সুখ, ঐশ্বর্য, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য পরিত্যাগ করে দীন বেশে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এসেছেন, তিনি কেমন করে জাগতিক প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলেন? নিশ্চয়ই তা নয়। গাজীর আবাল্য চরিত্র কি এরই সাক্ষ্য দেয়?'[২৬]

মূলতঃ ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সূফী দরবেশদের মাধ্যমেই বেশী হয়েছে। এর ভেতর কোন কোন সূফী দরবেশ সরাসরি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু রাজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধপর্যন্ত করেছেন। সিলেটের হযরত শাহজালাল (রঃ) এর পর যিনি সরাসরি রাজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত বড় খান গাজী। আমার মনে

www.pathagar.com

হয় ইসলাম বিরোধী মহল অত্যন্ত সুকৌশলে এই বীর যোদ্ধা, মহান ইসলাম প্রচারকের চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য চম্পাবতীর সাথে তাঁর কাল্পনিক প্রেম কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন। তবে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মুকুট রায় যখন গাজীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন, তখন তাঁর জীবিতা কন্যা চম্পাবতী ইসলাম কবুল করার করণে গাজী তার পানি গ্রহণ করেন।

এখানে রাজা মুকুট রায় সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রখ্যাত গবেষক জনাব মুহম্মদ আবূ তালিব তাঁর, 'কিংবদন্তীর যশোর 'গ্রন্থে বলেছেন–

'এ দেশে মুকুটরায় নামে এক ব্রাহ্মণ রাজার আবির্ভাব ঘটে। রাজার সেনাপতি দক্ষিণারায়ের সঙ্গে বহিরাগত মুসলিম দরবেশ গাজী ও তার ভ্রাতা কালুর লড়াই ও রাজকন্যা চম্পাবতীর অপহরণ কাহিনী নিয়ে লেখা হিন্দুদের 'রায় মঙ্গল' ও মুসলমানদের 'গাজী কালু চম্পাবতী' কাহিনীর কথাও এখন স্মরণীয়।'[২৭]

আবূ তালিব সাহেব যে মুকুট রাজার কথা উল্ল্যেখ করেছেন তিনি ঝিনাইদহের মুকুট রাজা। কিন্তু 'যশোর জেলায় মুকুট রায় নামীয় কয়েকজন নৃপতির কাহিনী প্রচারিত আছে। (১) জয়দিয়ার মুকুট রায়, (২) ঝিনাইদহের মুকুট রায় ও(৩) ব্রাহ্মণ নগরের মুকুট রায়। এরা তিনজনই ঐতিহাসিক পুরুষ।'[২৮]

আমাদের আলোচ্য, 'মুকুট রায়ের রাজধানী ছিলো ব্রাহ্মণ নগর।'[২৯] 'রাজা মুকুট রায়ের রাজ্য উত্তরে মহেশপুর হতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম দিকে ছিলো গঙ্গা পর্য্যন্ত। তিনি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। মুসলমান বিদ্বেষী হিসাবে মুকুটরায় সমধিক পরিচিত। তার রাজ্য সীমানার মধ্যে কোন মুসলমান আসতে পারত না।'[৩০]

'রাজা মুকুট রায়ের স্ত্রীর নাম লীলাবতী। তার সাতপুত্র ও এক কন্যা ছিলো। তিনি অতিশয় মুসলমান বিদ্বেষী হওয়ায় গাজীর সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সপরিবারে আত্মহত্যা করেন।'[৩১]

'যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার নিকটবর্তী লাউজানী গ্রামের এক সময় নাম ছিল ব্রাহ্মণ নগর। ব্রাহ্মণ নগরে রাজা মুকুট রায়ের রাজধানীর চিহ্ন আজ বিলুপ্ত।'[৩২]

মুকুট রায়ের রাজধানী অর্থাৎ ব্রাহ্মণা নগর ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তার অবস্থানও ছিল অত্যন্ত মনোরম। প্রাচীন পুঁথিতে আছে–

'জানিবা তাহার নাম ব্রাহ্মণা নগর
চারিদিকে নদী তার দেখিতে সুন্দর।।
সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে ঘাট চারিখান
প্রতিঘাটে চারিশত সোনার নিশান।।
হেন পুরী নাহি ওগো ছিল রাবনের
মুকুট নামেতে রাজা সেইত দেশের।।'[৩৩]

সেখানে লোকজন সুখে শান্তি বসবাস করত। কোন দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করত না। পুঁথিতে আছে–

'নগর নিবাসী যত সব ধনবান

www.pathagar.com

সে দেশে কাঙ্গাল নাহি সকলে সমান।।
সুবর্ণের কুম্ভ দিয়া আনে সব জল
বাটি ঘাটি থাল ঝারি সোনার সকল।।
এক খানি ঘর নাহি সেই দেশে জুড়ি
দালান মন্দির মঠ সব বাড়ী বাড়ী।।'[৩৪]

মুকুট রাজা সম্বন্ধে মুহম্মদ আবু তালিব সাহেবের মতের সাথে আমরা এক মত হতে পারছি না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তা'ছাড়া তিনি নিজেও তাঁর 'কিংবদন্তীর যশোর' গ্রন্থে গাজীর গানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে–

'সাতশ গাড়োল লয়ে
দড়াটানা পার হয়ে
চললেন গাজী খনিয়া নগর।
চল যাই রে।।'[৩৫]

উল্লেখিত 'দড়াটানা' যে বর্তমানে যশোর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই খনিয়ান নগরেই মুকুট রাজার সাথে গাজীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রকে বলা হয় খুনিয়ার মাঠ। কঁড়ির জাঙ্গালের দুই ধারে যে প্রান্তর, তার নাম খুনিয়ার মাঠ।'[৩৬] এ খনিয়ার মাঠের ভীষণ যুদ্ধের কথা 'রায় মঙ্গল' কাব্যেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানে মুকুট রায়ের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়নি। যেমন–

"বড় খাঁ গাজীর সাথে
মহা যুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তালী হইল তার পর।।[৩৭]

পুঁথির বর্ণনা ও অন্যান্য সূত্র ধরে জানা যায় গাজী দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণ নগর অবস্থান করার পর আবার সুন্দর বনের দিকে রওনা হন। এবং এক সময় সাতক্ষীরার লাবসা গ্রামে এসে উপস্থিত হন। গাজীর সাথে চম্পাও লাবসা গ্রামে আসে এবং স্বামী স্ত্রী মিলে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। চম্পার ধার্মিক জীবন মানুষকে মুগ্ধ করে। এ জন্য এ অঞ্চলের মানুষ তাকে 'মা চম্পা' বলে ডাকতো। চম্পা এই লাবসা গ্রামেই ইন্তেকাল করেন। স্থানীয় জনগণ চম্পার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করে। কিন্তু কালের গর্ভে সে স্তম্ভ আজ হারিয়ে গেছে।

চম্পার মৃত্যুর পর গাজী তার পৈত্রিক নিবাস সিলেটে ফিরে যান।'সেখানে তিনি হবিগঞ্জ মহকুমার বিশগাঁও গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিশ গাঁওয়ের নাম গাজীর নামানুসারে গাজীপুর হয়েছিল। সেখানে তাঁর সমাধি বিদ্যমান।'[৩৮]

এ সমন্ধে জনাব আব্দুর রহীম প্রণীত পুঁথিতে আছে–

বিশগাঁও আছে সেই শ্রীহট্ট জিলায়
বাঘ লয়ে শাহা গাজী রহিল তথায়।।
কেহ কেহ বলে নাম গাজীপুর আর
হইয়াছে সেইখানে গাজীর মাজার।।
সর্বদা হাজী যায় সেইত মাজারে

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান যত মান্য সবে করে।।[৩৯]

অবশ্য চম্পা ও গাজী সমন্ধে কেউ কেউ ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন। চম্পা সমন্ধে খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেছেন, 'চম্পা ছিলেন বাগদাদ নগরীর খলীফা বংশের জনৈকা রমনী। তিনি সুদূর বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্যে। একদিন মা চম্পা নৌখালি নদীর মধ্য দিয়ে নৌকা যোগে যাবার সময় লাবসা গ্রামে তার নৌকা ডুবি হয়। তিনি এবং তার সংগীরা সৌভাগ্য ক্রমে রক্ষা পান। অবশেষে এই গ্রামেই আস্তানা স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর তার ভক্তেরা সমাধির উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন।'[৪০] মিঃ ওমালী সাহেবের এই মতের সাথে আমরা একমত হতে পারি না। কারণ চম্পা কোন বাগদাদী মেয়ের নাম হতে পারে না। চম্পা নামটি একান্তই বাংলাদেশী, এমনকি হিন্দুয়ানী বললেও অত্যুক্তি হবে না। তা'ছাড়া একজন মহিলা শুধু মাত্র ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে সুদূর বাংলাদেশে আসবে এটাও মেনে নেওয়া যায় না। আর যদি এমন ঘটনা সত্যিই ঘটতো তা'হলে সে ইতিহাস এত অস্পষ্ট থাকতো বলে বিশ্বাস হয় না।

অপরদিকে বারবাজার তথা এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণ মনে করে গাজী-কালু ও চম্পাবতীর মাজার এই বার বাজারেই অবস্থিত। তাদের মতে যশোর -ঢাকা সড়কের পূর্বদিকে বাদুর গাছা মৌজায় বেড়দীঘি (১২০০ফুট x ১২০০ফুট) নামে যে বিশাল দীঘি আছে তার কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত কবর তিনটিই গাজী কালু চম্পাবতীর কবর। বর্তমানে কবর তিনটি চিহ্নিত করা হয়েছে। মাঝখানের বড় কবরটি গাজীর, পশ্চিমেরটি কালুর এবং পূর্বেরটি চম্পার।'[৪১]

পরিশেষে বলতে চাই 'গাজী কালু চম্পাবতী' তিনজনই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে তারা লৌকিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বেঁচে আছে এবং থাকবেন। এখনো, 'বগুড়া জেলার শেরপুরে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজীকালুর নামে মেলা বসে।'[৪২] গাজী পীরের দরগা গুলোতে হিন্দু মুসলমান এখনো সিন্নি মানে। ফকিররা এখনো মুখে মুখে বলে-

'গাজী মিঞার হাজোত সিন্নি সম্পূর্ণ হল।
হিন্দুগণে বলহরি মোমিনে আল্লা বল।।'[৪৩]

এখনো মাঝি মাল্লারা গেয়ে ওঠে-

আমরা আছি পোলাপান
গাজী গঙ্গা নিঘাবান।
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর।।[৪৪]

তাই আমাদের উচিৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ সমস্ত হারিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক চরিত্রকে খুজে বের করা। তাদের কর্মকান্ডের সঠিক চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরা। তা'হলে আশা করা যায় উত্তরশূরী হিসাবে পূর্বশূরীদের মূল্যায়ন নূন্যতম হলেও সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

পাদটিকাঃ

১। আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত যশোর পরিচিতি (তৃতীয় বিশেষ সংখ্যা),পৃঃ১৩৯
২। আব্দুর রহিম- গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
৩। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part.1, No. Iv, Calcutta, 1870, .P. 280-82
৪। ডঃ সুকুমার সেন - ইসলামি বাংলা সাহিত্য,পৃঃ১০৬
৫। ওয়াকিল আহমদ- বাংলার লোক সংস্কৃতি, পৃঃ২৯৩
৬। ডঃ সুকুমার সেন- ইসলামি বাংলা সাহিত্য,পৃঃ৮০
৭। ওয়াকিল আহমদ- বাংলার লোক সংস্কৃতি, পৃঃ২৯৩
৮। আব্দুর রহিম- গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
৯। হোসেন উদ্দিন হোসেন- যশোরাদ্য দেশ, পৃঃ১১১
১০। আবদুল মান্নান তালিব- বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ১১১
১১। Dr. Md. Enamul Haq- sufism in Bengal, Dacca.1st edn 1975, p.220.
১২। Journal of Asiatic Socity of Bengal 1922,p.413
১৩। হোসেন উদ্দীন হোসেন -যশোরাদ্য দেশ,পৃঃ১১০
১৪। আব্দুর রহিম- গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
১৫। হোসেন উদ্দীন হোসেন- যশোরাদ্য দেশ পৃঃ ১০২
১৬। ওয়াকিল আহমদ- বাংলার লোক সংস্কৃতি ,পৃঃ২৯২
১৭। হোসেন উদ্দীন হোসেন-যশোরাদ্য দেশ, পৃঃ ৬৭
১৮। আব্দুর রহিম-গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
১৯। প্রাগুক্ত
২০। হোসেন উদ্দীন হোসেন- যশোরাদ্য দেশ,পৃঃ ১১১-১২
২১। হোসেন উদ্দীন হোসেন- বিলুপ্ত নগরী বারোবাজার (প্রবন্ধ)
২২। আব্দুর রহিম- গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
২৩। প্রাগুক্ত
২৪। আব্দুর রহিম -গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
২৫। প্রাগুক্ত
২৬। হোসেন উদ্দীন হোসেন- যশোরাদ্য দেশ,পৃঃ১০৯
২৭ মুহম্মদ আবু তালিব- কিংবদন্তীর যশোর, পৃঃ ১৩
২৮। হোসেন উদ্দীন হোসেন- রাজামুকুট রায় (প্রবন্ধ)
২৯। প্রাগুক্ত ৩০। প্রাগুক্ত ৩১। প্রাগুক্ত
৩২। প্রাগুক্ত
৩৩। আব্দুর রহিম- গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
৩৪। প্রাগুক্ত
৩৫। মুহম্মদ আবু তালিব- কিংবদন্তীর যশোর, পৃঃ১৩
২৬। হোসেন উদ্দীন হোসেন- যশোরাদ্য দেশ,পৃঃ১১৩
৩৭। মুহম্মদ আবু তালিব- কিংবদন্তীর যশোর, পৃঃ১৩
৩৮। হোসেন উদ্দীন হোসেন- যশোরাদ্য দেশ, পৃঃ ১১৫
৩৯। আব্দুর রহিম- গাজী কালু চম্পাবতী (পুঁথি)
৪০। মিঃ ওমালী-খুলনা গেজেটিয়ার
৪১। নাসির হেলাল- কিংবদন্তীয় বার বাজার 'সাম্প্রতিক' অক্টোবর '৮৯,পৃঃ ১৫
৪২। এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল - সুন্দর বনের ইতিহাস ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৪
৪৩। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু -বাংলার লৌকিক দেবতা, পৃঃ৪৩
৪৪। আ, ন, ম, বজলুর রশীদ- পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক, পৃঃ৭

www.pathagar.com

খান-ই-আযম উলুঘ খান-ই-জাহান (রঃ)

পাক-ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এবং একটি ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে হযরত খান-ই-আযম উলুঘ খান-ই-জাহান (রঃ)-এর নাম সর্বাগ্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত। এই মহান সাধক তাঁর সততা, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত যশোর-খুলনা অঞ্চল শাসন করেছেন। তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের অবদানে এ অঞ্চল ধন্য হয়ে আছে। 'পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এ বীর সেনাপতি, সুদক্ষ শাসক, বুযুর্গ ওলীর অবদানে ধন্য হয়েছে এদেশের মাটি ও মানুষ। সমস্ত বৈরী বাতিল শক্তির মোকাবিলায় প্রচন্ড ঝড়ের বেগে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, জয়ী হয়েছেন, মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং জনহিতকর কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। খুলনা ও যশোরের কিয়দংশ তিনি শাসন করেছেন খলিফতাবাদ নাম দিয়ে এবং তা করেছেন ইসলামী শাসন নীতির প্রতি অটল মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করে। তাঁর ষাট গম্বুজ মসজিদ স্থাপত্য উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে আজো কালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।"[১]

'যশোর-খুলনার ইতিহাসে বিশেষ করে মুসলমান আমলের ইতিহাসে প্রমাণভিত্তিক কোন রাজ পুরুষের নাম করতে গেলে খান-ই-জাহানের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হয়।'[২]

'হযরত খান-ই-জাহান (রহঃ) নিতান্তই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর ওফাত হয় ২৬শে জিলহজ, ২৪শে অক্টোবর, ১৪৫৯। এই সময়কাল থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি সমকালীন গৌড় সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২-১৪৫৯) বাগেরহাট শহরে ইন্তেকাল করেন।[৩]

এ প্রসংগে প্রখ্যাত গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তালিব বলেন, 'যশোর ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামী ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামী সমাজবিধি প্রবর্তনে হযরত উলুঘ খান-ই জাহান বা খান জাহান আলীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এই দুই জেলায় ব্যাপক প্রচলিত জনশ্রুতি এবং বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই এ এলাকায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন শিষ্য-শাগরিদগণকেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে এতদঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।'[৪]

"এ অঞ্চলে তাঁর আগমন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকে ঘটেছিল বলে

www.pathagar.com

ধরে নেয়া যায়। তখন রাজা গণেশের পুত্র জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ্ (যদু) গৌড়ের সুলতান। খুব সম্ভব ইসলাম ধর্মে নব দীক্ষিত এই নরপতি নব দীক্ষিত মুসলমানের উদ্দীপনা (The zeal of a new Muslim convert) নিয়ে খান-ই-জাহানকে তখন পর্যন্ত অনধিকৃত দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার ও সেখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য প্রচুর সৈন্য-সামন্ত ও অর্থ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেখানে সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কাজ করে সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্র রাজত্ব কালে (মৃত্যু ৮৬৪ হি-১৫৫৯ খ্রী) কি তার সামান্য পরে মারা যান।"[৫]

"খান-ই-জাহান কোন স্বাধীন সুলতান হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করেননি। তিনি স্বনামে কোন মুদ্রা বা খুৎবা প্রচলন করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁর অভিধা ছিল উলুঘ খান-ই-জাহান (পৃথিবীর মহান খান), সুলতান নয়। তিনি তাঁর শাসন কেন্দ্রের নাম দিয়েছিলেন খলিফাতাবাদ অর্থাৎ প্রতিনিধির আবাসস্থল। এসব প্রমাণের পরে তাঁকে কোন মতেই স্বাধীন সুলতান বলে ধরে নেওয়া যায় না।"[৬]

বাগের হাটে তাঁর সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, তিনি ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে মারা যান। "তখন ছিল গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খৃঃ) আমল। এ আমলেই হযরত খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন এবং সমগ্র এলাকার শাসনভার লাভ করেন। পয়গ্রাম কসবাতে তাঁর রাজধানী ছিল। কাজেই তিনি যে তদানীন্তন বাংলার সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন এতে সন্দেহ নেই।"[৭]

"তিনি যেই-ই হোন, স্বাধীন সুলতান হোন, আর নাই হোন, কোনো রাজ প্রতিনিধি হোন আর নাই হোন, তিনি যে গৌড় সুলতানের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন অতি উচ্চস্তরের সুফীসাধক ছিলেন, এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। আর তিনি যে সমকালীন নিম্ন বাংলা তথা যশোর-খুলনার অধিপতি এবং একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, এ কথাও অনস্বীকার্য।"[৮]

"তিনি ছিলেন খুব সম্ভব প্রথমে জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ্র প্রতিনিধি (১৪১৭-৩২ খৃঃ)। এই জালাল-উদ-দীনের সময় থেকে শুরু করে নাসির উদ-দীন মাহমুদ শাহ্র রাজত্বকালের একদম শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি যশোর-খুলনা অঞ্চলে অবস্থানরত ছিলেন।"[৯]

হযরত খান জাহান আলীর পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ এম, এ, করিমের মতে তিনি বাংলাদেশেই ছিলেন। দিল্লী থেকে আসেননি। অপরদিকে ডক্টর আবদুল কাদের এ মতের বিরোধি। তাঁর মতে খানজাহান দিল্লী থেকে এসেছিলেন।

"ডক্টর এম, এ, করিমের মতে খান জাহান মাহমুদ শাহের অধীনস্থ কর্মচারী এবং গৌড় সুলতানের নিকট হইতে তিনি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী খান জাহান সম্পর্কে ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৩ সালে মর্ণিং নিউজ পত্রিকায় এবং

www.pathagar.com

২৫শে মে ১৯৬২ সালে লাহোরের পাকিস্তান টাইমসে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে খান জাহান দিল্লীর সুলতানের কর্মচারী ছিলেন এবং দিল্লীর অরাজকতার সুযোগে তিনি বঙ্গে এসে ইসলাম প্রচার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।"[১০]

ডক্টর আবদুল কাদের বলেছেন, "জৌন পুরের খাজায়ে জাহান এবং বাগেরহাটের খান জাহান চিরকুমার ছিলেন। তদুপরি দুইজনই ছিলেন খোজা। খান জাহান নাকি ৬০,০০০ সৈন্যসহ নবদ্বীপের বড়বাজারে পদার্পণ করেন। এই তথ্য সম্বল করিয়া স্টেপ্লেটন, সাহেব তাঁহাকে জৌনপুরের খাজায়ে জাহান বলিয়া অনুমান করেন। যশোর-খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র এই মতবাদ মানিয়া লন। আমিও তা অনেকটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। ইহা লইয়া ডক্টর আবদুল করিম সাহেবের সহিত পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় এক প্রচন্ড বাক বিতন্ডা সৃষ্টি হয়। আকরাম খাঁ সাহেবও স্টেপেন্টন সাহেবের মতের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই মহাপুরুষটি কোথা হইতে যে এত বিপুল লোকজনসহ দক্ষিণ বঙ্গে আগমন করেন অদ্যপি তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই।"[১১]

ডঃ কাদেরের এ মন্তব্য সম্পর্কে এ, এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, "খান জাহান চিরকুমারও ছিলেন না, নপুংসকও ছিলেন না। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তিনি সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক বা একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তবে তাঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় এইরূপ ভুল ধারণা করা হইয়াছে। জৌনপুরের খাজায়ে জাহান খোজা ছিলেন সেই জন্য বাগেরহাটের খান জাহানকে খোজা বলা মারাত্মক ভুল হইবে। স্টেপেন্টন সাহেবও সতীশ বাবুর মত অনেকটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ডক্টর কাদিরই ভুল করিবেন।"[১২]

হযরত খান জাহান আলীর সম্মানীয়া স্ত্রীর নাম ছিল সোনা বিবি। তাঁর বসতবাটী ও একটি মসজিদ সোনাবিবির বাড়ী ও সোনা বিবির মসজিদ নামে পরিচিত।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর 'বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি' গ্রন্থটির ৩৬ পৃষ্ঠায় তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, "খুব সম্ভব রাজা গণেশের পুত্র যদু অর্থাৎ জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহর আমলে (১৪১৮-৩২ খৃঃ) তিনি বাগেরহাটে এসেছিলেন একজন শাসনকর্তা হিসেবে এবং সেই সময় থেকে আরম্ভ করে তাঁর পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ (১৪৩২-৩৬ খৃঃ) এবং পরবর্তী সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকাল (১৪৩৬-৫৯ খৃঃ) পর্যন্ত তিনি যশোর-খুলনা অঞ্চলে ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই এই এলাকা শাসন করতেন বলে মনে হয়।"

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা তাঁর দক্ষিণ বঙ্গ আগমন অর্থাৎ যশোর-খুলনায় আগমনের একটি মোটামুটি ধারণা পাই। সময়টা ছিল রাজা গনেশের পুত্র যদু বা জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহর আমল (১৪১৮-৩২ খৃঃ) এবং অবস্থানকালীন সময়টাও জানতে পারি। তা'হল সুলতান নাসির উদ্-দীন মাহমুদ শাহর আমল

www.pathagar.com

(১৪৩৬–৫৯ খৃঃ) পর্যন্ত। আরো জানতে পারি তিনি কোন স্বাধীন সুলতান ছিলেন না। তবে অনেকটা স্বাধীন সুলতানের মতই শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা থেকে তাঁর জন্ম, শৈশব, পিতামাতা, জন্ম স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনে। অবশ্য মৃত্যু তারিখ ৮৬৩ হিজরী বা ১৪৫৯ সাল সম্বন্ধে সবাই একমত। এ তারিখটা বাগেরহাটে তাঁর কবর গাত্রে লিখিত তারিখ। এখান থেকে খান জাহান আলীর জন্মের সময়টা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। অনেকের ধারণা তিনি ১০০ বছর বা তার সামান্য বেশী সময় জীবিত ছিলেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ পাদে অর্থাৎ চল্লিশের দশকে জন্মগ্রহণ করেন।

পুঁথি পত্রে খান জাহানের পিতামাতার নাম পাওয়া গেছে কিন্তু তা মেনে নেয়ার ব্যাপারে অনেকেই দ্বিধা করেছেন। এ ব্যাপারে মুহম্মদ আবূ তালিব সাহেব বলেন, "পুঁথি পত্রে খান জাহানের যে সব ব্যক্তি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, তা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর ও অলীক। অনেকাংশে হাস্যকরও বটে।

পুঁথি লেখক জনৈক বশীর উদ্দীন খান জাহানের পিতার নাম আজর খান, মাতার নাম আঙ্গিরা বা আঙ্গিনা বিবি বলেছেন এবং তাঁর আসল নাম বলেছেন, কিশওয়ার খান বা কেশর খান। কিংবদন্তীর মতে, এই কেশর খান সোনারগাঁও থেকে বাগেরহাট আসেন। সাম্প্রতিককালে সৈয়দ মহল্লা নিবাসী জনৈক খন্দকার ছেরাজুল হক, খান জাহানের নাম কিশওয়ার খান এবং তাঁর পিতার নাম বলেছেন, আলী আকবর খান।"[১৩]

খান জাহানের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে জনাব সেলিম আহমদ তাঁর 'হযরত খান জাহান আলী (রঃ)' গ্রন্থে জনশ্রুতির উল্লেখ করে বলেছেন, "লোক মুখে যে কাহিনীটি বহুল প্রচলিত সেই কাহিনী অনুযায়ী হতযরত খান জাহান (রঃ)–এর মুল নাম ছিল শের খান বা কেশর খান। মার নাম ছিল আমিনা বিবি এবং পিতার নাম ছিল ফীরদ খান বা আজর খান। তাঁরা হযরত বড় পীর (রঃ)–এর বংশধর ছিলেন।

হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তখন আজর খান তাঁর পরিবার নিয়ে দিল্লীতে চলে আসেন এবং দিল্লীতে কিছুকাল অবস্থান করার পর গৌড়ে স্থায়ী ভাবে অবস্থান নেন। তিনি শিক্ষিত লোক ছিলেন বলে সহজেই গৌড়ের রাজপরিবারে গৃহশিক্ষক হিসেবে চাকরি লাভ করেন। আজর খান গৌড়ে স্থায়ী অবস্থা ফিরে পাবার পর তাঁর ছেলে শের খানকে তৎকালীন গৌড়ের সূফী সাধক এবং বুযুর্গ হযরত নূর–ই–কুতুব–উল আলম (রঃ)–এর মক্তবে পড়তে পাঠান। এখানেই শের খান তাঁর শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন এবং হযরত নূর–ই কুতুব–উল আলমের কাছে বায়েৎ হন।"[১৪]

পিতা আজর খানের মৃত্যুর পর কোন উপায়ন্তর না দেখে কেশর খান শিক্ষা জীবনের ওস্তাদ ও আধ্যাত্মিক নেতা হযরত নূর কুতুব উল আলমের স্মরণাপন্ন হন। নিজ ছাত্রের এহেন দূর্দিনে নূর কুতুব উল আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কির কাছে চিঠি লিখে পাঠান।

www.pathagar.com

চিঠি পাওয়া মাত্র সুলতান শর্কি কেশর খানকে সাধারণ সৈনিক হিসেবে সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে কেশর খান সুলতান শর্কির সেনাবাহিনীর সেনাপতি পদে উন্নীত হন।

রাজা গণেশ নামে দিনাজপুরের এক রাজা এই সময় (১৪০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) গৌড়ের সুলতান সাইফুদ্দীন হামজা শাহকে পরাজিত করে নিজেকে স্বাধীন রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। সাথে সাথে তিনি মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালাতে থাকেন।

রাজা গণেশের এহেন কার্যকলাপের খবর পেয়ে হযরত নূর কুতুব-উল-আলমের মন কেঁদে ওঠে। তিনি দেরি না করে সুলতান ইব্রাহীম শর্কিকে রাজা গণেশের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

সাধক প্রবরের চিঠি পাওয়া মাত্র সুলতান ইব্রাহীম শর্কি তরুণ সেনাপতি কেশর খানকে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে গৌড়ে প্রেরণ করলেন।

কেশর খানের নেতৃত্বে সুলতান শর্কির সেনাবাহিনী অতি সহজেই রাজা গণেশকে পরাজিত করলো। চতুর রাজা ক্ষমা প্রার্থণা করে সুলতান শর্কিকে চিঠি লিখলেন।

সুলতান শর্কির ইচ্ছে অনুযায়ী রাজা গণেশ নূর কুতুব উল আলমের নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করায় এবং নিজ পুত্র যদু ইসলাম গ্রহণ করায় গৌড়ের শাসন ভার তার (যদু অর্থাৎ জালাল উদ্দীন) হাতে অর্পণ করা হয়। কিন্তু রাজা গণেশ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, সাথে সাথে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। ফলে সুলতান ইব্রাহীম শর্কি হযরত নূর কুতুব উল আলমের নির্দেশে রাজা গণেশকে সমুচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য পুনরায় কেশর খানের "নেতৃত্বে আরো এগারো জন উপ-সৈন্যাধ্যক্ষ ও ষাট হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গৌড়-এর দিকে প্রেরণ করেন। তখন সালটি সম্ভবত ছিল ১৪১২ থেকে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।"[১৫]

এ সংবাদে রাজা গণেশ দলবলসহ দিনাজপুরের দিকে পালিয়ে যান। ফলে বিনা যুদ্ধে কেশরখান গৌড় অধিকার করেন। "সুলতান ইব্রাহীম শর্কি তাঁর সেনাপতির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর উপাধি দেন খান-ই-জাহান। অর্থাৎ পৃথিবীর অধীশ্বর। এই খান-ই-জহান নামের আড়ালে এই বীর সেনাপতির আসল নাম ঢাকা পড়েছে। তিনি খান জাহান নামেই পরিচিতি লাভ করেছেন। এই খান জাহান-ই হলেন আমাদের আলোচ্য হযরত খান জাহান রহমত উল্লাহ আলাইহে।"[১৬]

"গৌড় অধিকারের পর হযরত নূর-ই-কুতুব-উল আলম কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত খান জাহান দক্ষিণ বঙ্গের দিকে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের জন্য রওনা দেন।

দক্ষিণ বঙ্গের দিকে রওনা দেবার সময় হযরত খান জাহান (রঃ) হযরত নূর-ই কুতুব-উল আলমকে তাঁর শেষ মঞ্জিল কোথায় হবে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে হযরত নূর-ই কুতুব-উল আলম হযরত খান জাহান (রঃ)কে একটি পানি ভরা পাত্র দিয়ে বলেছিলেন ঠিক এই রকম পানি যেখানে পাবে সেই খানেই।"[১৭]

www.pathagar.com

আর সেজন্যই তাঁর গমন পথে অসংখ্য পুকুর ও দীঘি খনন করতে দেখা যায়। প্রবল জনশ্রুতি আছে যে, বাগেরহাট এসে তিনি ঐ রকম পানির সন্ধান পান। তাই তাঁর শেষ মঞ্জিল হয় বাগের হাট।

খান জাহান আলী (রঃ) সম্বন্ধে অন্যান্য যে মতগুলো আছে তা নিম্নে পেশ করা গেল। খুলনা গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ওমালী বলেন, "তিনি দিল্লীর সুলতান বা বঙ্গের রাজার নিকট হইত জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া যশোর অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। কথিত আছে জনৈক সন্ন্যাসী সম্রাট আকবরকে একটি মূল্যবান উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। গভীর নিশীথে সন্ন্যাসী যখন আগমন করেন, সেই সময় বাদশাহ আকবর নিদ্রিত ছিলেন এবং খাঞ্জা আলী তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে ছিলেন। সন্ন্যাসী ঘুমন্ত বাদশাহকে বিরক্ত না করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু যাইবার প্রাক্কালে তিনি খাঞ্জা আলীকে সেই মূল্যবান উপহার দিয়া যান। সম্রাট আকবর খাঞ্জা আলীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ উপহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। সম্রাট তাঁহাকে বসবাসের জন্য প্রচুর অর্থ ও ভূমিদান করিতে স্বীকৃত হন। অতঃপর খাঞ্জা আলী আকবরের শাহী দরবার ত্যাগ করিয়া অসংখ্য অনুচরসহ সুন্দরবন অঞ্চল আসিয়া জঙ্গল কাটিয়া ভূমি আবাদ করেন।"[১৮]

মিঃ ওমালীর এ বক্তব্য নিতান্তই গল্প ছাড়া কিছু নয়। কারণ সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল [১৫৫৬–১৬০৫] খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। আর হযরত খান জাহান আলী (রঃ) মৃত্যুবরণ করেন এর অনেক আগে ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে।

'ফতেহবাদের আউলিয়া কাহিনী' নামে একটি প্রবন্ধ কিছুকাল আগে বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি প্রায় ৭০ বছর পূর্বের একটি উর্দু পাণ্ডুলিপির বঙ্গানুবাদ। পুরানো হওয়ার দরুন পাণ্ডুলিপিটি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপির প্রণেতা সৈয়দ ইনায়েত হোসায়েন রিজভী।

প্রবন্ধটিতে হযরত খান জাহান আলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হযরত শাহ্ পীর খান জাহান আলী (রঃ)। আরও বর্ণিত আছে, পীর শাহ্ খান জাহান আলী ওরফে খাজা আলী কামেল দরবেশ ছিলেন। দিল্লীর দিক থেকে জঁাকজমকের সঙ্গে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ফাতেহাবাদ পরগণায় হযরত শাহ্ আলী বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন। এখানে কিছুকাল থাকার পর শাহ আলী বাগদাদীকে নিজের বর্ম দান করে সুন্দরবনের দিকে চলে যান এবং হাবেলী কড়াপুরে বসবাসের বন্দোবস্ত করেন। শুনা যায় পীর সাহেব চট্টগ্রাম গিয়ে হযরত বায়জীদ বোস্তামীর রুহ মোবারকের খেদমতে পাথরের জন্য প্রার্থণা করেন। খোদার দয়ায় তাঁর দোয়া কবুল হয়। সেখান থেকে এক মুঠি পাথর এনে হাবেলী কড়াপুরে খুব বড় এবং উঁচু ষাট গুম্বজের একটি মসজিদ তৈয়ার করেন। এর আশে পাশে ছোট দুইটি মসজিদ ও তালাব খনন করেন। সেই তালাবে একটি কুমীর আছে, এর আচরণ প্রায় মানুষের ন্যায়।"[১৯]

www.pathagar.com

উপরোক্ত বক্তব্যও সঠিক নয়। কারণ, "খান জাহান দিল্লী হইতে সরাসরি ফাতেহাবাদ পরগনায় মহাত্মা শাহ্ আলী বাগদাদীর খেদমতে উপস্থিত হন, এরূপ কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা সর্ববাদি সম্মত যে বারবাজারেই তাহার প্রথম আস্তানা এবং তথা হইতে যদি তিনি ফাতেহাবাদ যাইতেন তবে নিশ্চয় পথিপ্রান্তে জলাশয়, রাস্তা বা মসজিদের চিহ্ন থাকিত। বারবাজার হইতে ফাতেহাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পথে খান জাহানের কোন কীর্তি চিহ্ন নাই।"[২০]

তাছাড়া পাণ্ডুলিপি বা প্রবন্ধটিতে শাহ আলী বাগদাদীর মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ৯২৩ হিজরী। পক্ষান্তরে হযরত খান জাহান আলীর সর্বসম্মত মৃত্যু তারিখ হচ্ছে ৮৬৩ হিজরী। অর্থাৎ শাহ আলী বাগদাদীর মৃত্যুর ৬০ বছর পূর্বে। অতএব বুঝা গেল উপরোক্ত মতামত সঠিক নয়।

'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে সতীশ বাবু খান জাহানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "এই খাজা জাহান খোজা বা নপুংসক ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি স্বীয় পালিত পুত্র ইব্রাহিমের উপর জৌনপুরের শাসনভার দিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পুণ্য কার্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য পূর্বাঞ্চলে আসেন। ইব্রাহিমের শাসন আরম্ভের পূর্বে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। সেটি অনুমান মাত্র বলিয়া বোধ হয়। .....যশোর খুলনার "খাঞ্জালী পীর" বা খান জাহান আলী এবং জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহানকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি।"[২১]

হযরত খান জাহান আলী যে নপুংসক ছিলেন না তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। খান জাহান আলী ও জৌনপুরের শাসন কর্তা খাজা জাহান যে এক ব্যক্তি নন সে পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রথম খন্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে খান জাহান আলী খানের নাম প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না। কেহ কেহ তাহাকে জৌনপুরের শার্‌কী সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা খাওয়াজাঃ জাহানের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। খাওয়াজাঃ জাহান ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে শার্‌কী সুলতান বংশ প্রতিষ্ঠা করার পর চারি বৎসর রাজত্ব করেন; তৎপর স্বীয় পালিত পুত্র মুবারাক শাহের হস্তে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য ভার অর্পণ করেন। তিনি ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং খান জাহান আলী ও শার্‌কী সুলতান খাওয়াজাঃ জাহান আলী একই ব্যক্তি হইতে পারে না।[২২]

এ বিষয়ে, "বদাউনী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, দ্বিতীয় মাহমুদ তোঘলোকের সময় মালিক সারোয়ার নামে একজন আমত্য রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। মালিক সারোয়ার নপুংসক ছিলেন। স্বীয় ক্ষমতা বলে তিনি মন্ত্রী পদে অধিষ্টিত হন। তিনি ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। এই সময় তিনি পূর্ব প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং মালিক–

www.pathagar.com

উস-শর্ক উপাধিতে ভূষিত হন। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে খাজা জাহান দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া জৌনপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সমস্ত ঐতিহাসিকের মতে এই খাজা জাহান ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে মৃত্যু মুখে পতিত হন।"[২৩]

আমাদের আলোচ্য খাজা জাহান-এর ৬০ বছর পর অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই মৃত্যু তারিখ থেকেও স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বাগেরহাটের খান জাহান আলী ও জৌনপুরের খাজা জাহান কখনোই এক ব্যক্তি নন।

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে, হযরত খান জাহান আলী (রঃ)-এর মূল নাম ছিল শের খান বা কেশর খান। মার নাম ছিল আমিনা বিবি এবং পিতার নাম ছিল ফরিদ খান বা আজর খান।

আজর খান ভাগ্যান্বেশনে বাগদাদ থেকে পরিবার পরিজনসহ দিল্লী আসেন এবং সেখানে কিছু কাল অবস্থান করার পর গৌড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং এক সময় মৃত্যু মুখে পতিত হন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দরবেশ নুর কুতুব উল আলমের অনুরোধে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান ইব্রাহীম শর্কি পিতহীন কেশর খানকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে কেশর খান নিজ যোগ্যতা গুণে ইব্রাহীম শর্কির সেনাপতি নিযুক্ত হন। রাজা গণেশকে পরাজিত করার কারণে কেশর খানকে সুলতান ইব্রাহীম শর্কি 'খান-ই-জাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মুহম্মদ আবূ তালিব সাহেব বলেন, "তিনি রাজা ছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই। তিনি দরবেশ ছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর যথার্থ পরিচয় দেয়ার সাধ্যও নেই কারো। কিন্তু তাঁর খান-ই-জাহান উপাধি থেকে মনে হয়, তিনি প্রথম জীবনে কোন সুলতান বা রাজার মন্ত্রী বা সেনাপতি ছিলেন। পরে নিম্নবঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য সুন্দরবন এলাকায় প্রেরিত হন।"[২৪]

হযরত খান জাহান আলী (রঃ) জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কি ও গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহর ইচ্ছায় এবং আধ্যাত্মিক নেতা নুর কুতুব উল আলমের নির্দেশেই দক্ষিণ বঙ্গে আসেন। এ ব্যাপারে জনাব সেলিম আহমদ বলেন, "গৌড় অধিকারের পর হযরত নূর-ই-কুতুব-উল আলম কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত খান জাহান দক্ষিণ বঙ্গের দিকে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের জন্য রওনা দেন"।[২৫]

আমরা এ বক্তব্যের সাথে একমত এ কারণে যে, "স্বাধীন সুলতান বা রাষ্ট্রনায়ক হতে গেলে সুলতানী কায়দায় মুদ্রা নির্মাণ বা শিলালেখ প্রতিষ্ঠার যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, তার কোনটিরই তিনি অনুসরণ করেননি। তাই তাঁকে স্বাধীন সুলতান বলা যায় না। আর কোন স্বাধীন সুলতানের প্রতিনিধি শাসকও তাঁকে এই কারণে বলা যায় না যে, তিনি কারও প্রতিনিধিত্বও স্বীকার করেননি। অবশ্য 'খলিফা আবাদ' সাম্রাজ্যের নাম থেকে যদি কেউ বলেন যে, তিনি এখানে নিজেকে কোনো রাজার প্রতিনিধি প্রশাসক মনে করেছেন, কিন্তু তাও এই কারণে বলা ঠিক হবে না, তিনি

www.pathagar.com

নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলেও উল্লেখ করতে পারেন। অন্তত তাঁর মাযার গাত্রের শিলালেখের ধরণ থেকেও তাই অনুমিত হয়।

তিনি যেমন সুলতানী কায়দায় বিজয় স্তম্ভ বা মুদ্রার প্রচলন করে যাননি, তেমনি তিনি দুনিয়ায় কারও অধীনতার কথাও ঘোষণা করেননি। তিনি যা করেছেন, তাতে তাঁকে একজন অতি উচ্চ ধর্ম প্রাণ ব্যক্তি, অসাধারণ ঐশ্বর্যশালী মহান 'রাজ-দরবেশ' বলেও পরিচিত করে। বলা বাহুল্য, দেশবাসীর কাছে তিনি সেই নামেই পরিচিত হয়েছেন।"[২৬]

অর্থাৎ খান জাহান আলী তাঁর মুর্শিদ ও বাল্যকালের শিক্ষক নূর কুতুব উল আলমের নির্দেশে দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারে আসেন বিধায় তাঁর উপর তৎকালীন গৌড়ের শাসনকর্তা সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-৩২ খৃঃ), সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ (১৪৩২-৩৬ খৃঃ), সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৪৩৬-৫৯ খৃঃ) কারো সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করেননি। তবে অবশ্যই তৎকালীন বাংলাদেশ গৌড় রাজ্যের অধীন ছিল। সম্ভবতঃ দরবেশ নুর কুতুব উল আলমের প্রতি জৌন পুর ও গৌড়ের সুলতানদের প্রবল শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে তাঁর আধ্যাত্মিক শিষ্য হযরত খান জাহান আলী (রঃ)-এর সাথে অন্যান্য রাজ প্রতিনিধির মত ব্যবহার করা হত না। বরং তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখা হত অর্থাৎ সম্মানের চোখে দেখা হত। যার কারণে তাঁর খলিফাতবাদ (প্রতিনিধির রাজ্য) রাজ্য অনেকটা স্বাধীনভাবেই তিনি শাসন করতেন।

এবার আসা যাক হযরত খান জাহান আলী বাগেরহাট কিভাবে পৌঁছালেন সে কাহিনীতে। হযরত খান জাহান আলী (রঃ) তাঁর পীরের নির্দেশে দক্ষিণ বঙ্গের দিকে রওনা হন। যাত্রা পথে তিনি প্রথম আস্তানা গাড়েন বারবাজার। এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং পরবর্তী কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

"হযরত খান জাহান যখন বারবাজারে অবস্থান করছিলেন তখন বারবাজার ছিল নামকরা বন্দর। হিন্দু এবং বৌদ্ধ শাসন আমলেই এর বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বিশেষ করে এর পরিচিতি ছিল বৌদ্ধদের একটি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে। কথিত আছে, বিখ্যাত বণিক চাঁদ সওদাগরের একটি বাণিজ্য কেন্দ্রও ছিল এই বারবাজার।"[২৭]

"বারবাজার হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে এই দুই জাতির শাসন কেন্দ্র ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত গ্রীক ইতিহাস (Periplus of the Erythrean Sea) পেরিপ্লাসে বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী বারবাজারেই অবস্থিত ছিল।"[২৮]

"বারোবাজার অতি প্রাচীন স্থান। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এখানে প্রাচীন 'গঙ্গারিডি' নামে এক শক্তিশালী প্রাচীন জাতির আবাস ছিল। খান জাহানের আগমন কালে এ জাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। তবে এ জাতির কীর্তি-কাহিনী প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আজও বারোবাজারের মাটি খুঁড়লে

www.pathagar.com

প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। বারোবাজারে হযরত খান জাহান প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মসজিদ ও দীঘির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।"[২৯]

এছাড়া বারবাজার অঞ্চলের অসংখ্য পুকুর-দীঘি তার প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করে। কথিত আছে, এখানে ৬ বুড়ি ৬টা অর্থাৎ ১২৬টা পুকুর বা দীঘি আছে। অবশ্য আমরা ৭১টা দীঘির নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি। এর অনেক গুলোই এখনো প্রায় পূর্বাবস্থায় আছে। এখানে প্রায় ১০-১২ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান আমলে শহর বিস্তৃত ছিল।

"কথিত আছে যে সুবিদপুর গ্রামে সমস নদীর মধ্যে চাঁদ সওদাগরের দুইখানি বাণিজ্যপোত নিমজ্জিত হয়। এখনও জাহাজের ন্যায় মৃত্তিকার আকৃতি দেখিয়া লোকে চাঁদ সওদাগরের স্মৃতি চিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। গাজী কালুর ঐতিহাসিক বিরাট নগর এখানকার বেলাট দৌলতপুর মৌজা। এই শহরের সর্বত্র স্তূপ দেখা যায়। এখনও প্রায় ২০/২১টি স্তূপ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে জোড় বাংলা স্তূপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সর্বত্র ইষ্টক, মৃত্তিকা খুড়িলে প্রচুর ইট পাওয়া যায়।"[৩০]

বারবাজার যে মৃত প্রাচীন নগরী তার আরো প্রমাণ হল, "শ্রীরাম রাজার গড়বেষ্টিত রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট দীঘি তাঁহার কীর্তি অদ্যাপী রক্ষা করিতেছে। এই প্রাচীন শহরের যেখানে সেখানে প্রস্তর পড়িয়া আছে। অনেকগুলো প্রস্তর ও প্রস্তরখন্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি উহা বাগেরহাটের খান জাহান আলীর পাথরের ন্যায়। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে হাল কর্ষণের সময় একটি কামানের নল পাওয়া গিয়াছিল। জলাশয়ের মধ্যে রানী মাতার দীঘি, সওদাগরের দীঘি (সম্ভবতঃ চাঁদ সওদাগর নামীয় দীঘি), শ্রীরাম রাজার দীঘি, ভাইবোনের দীঘি, খোন্দকারের দীঘি, গোড়ার পুকুর, চাল ধোয়ানীর পুকুর, পাঁচ পীরের দীঘি, বেড় দীঘি, গলাকাটীর দীঘি, বিশ্বাসের দীঘি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেড়দীঘির মধ্যে এক সময় বাড়ী ছিল। পীর পুকুরের পার্শ্বে পূর্বে মেলা বসিত। খোন্দকারের দীঘির পার্শ্বে ছিলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। এই দীঘির পার্শ্বে দরগা ও মাযার আছে। বারবাজারের সর্বত্র এবং বিশেষ করিয়া পথিপার্শ্বে মানুষের অগণিত অস্থি দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকার নিম্নে প্রায় সর্বত্র মানুষের অখন্ড কঙ্কাল ও হাড় পাওয়া যায়। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এক সময় এই শহরের অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শহরটি মানুষ অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বারবাজারে খনন কার্য চালাইলে পাহাড়পুর বা মহাস্থানের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার সাধন হইতে পারে।"[৩১]

হযরত খান জাহান আলী (রঃ) উপমহাদেশের এই প্রাচীন স্থানকেই তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রথম মঞ্জিল হিসেবে বেছে নেন। তখন এ স্থানের নাম ছিল ছাপাই নগর। খান জাহান আলীর আগমনের পূর্বে এখানে হযরত বড় খান গাজী (গাজী-কালু-চম্পাবতী) ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে এই ছাপাই নগরকেই বেছে নিয়েছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ হযরত বড় খান গাজীর সাথে বারোজন সঙ্গী ছিলেন। সেখান থেকেই বারবাজার নামের উৎপত্তি। অথবা হযরত খান জাহানের যে প্রধান এগারজন শিষ্য ছিলেন এবং তিনি নিজে এই বারোজনের কারণেও বারবাজার নাম হতে পারে। আবার এমনো হতে পারে যে, এখানে ছোট ছোট বারোটা বাজার ছিল, সেখান থেকে এ নামের উৎপত্তি অথবা একটি বড় বাজার ছিল, সেখান থেকে বারবাজার। যাই হোক– হযরত খান জাহান সঙ্গী–সাথী সহ এখানে আস্তানা গাড়ার পর দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণের দিকে মনোনিবেস করেন। কথিত আছে, ষাট হাজার সৈন্য তাঁর সাথে ছিল। সৈন্যের সংখ্যা অস্বাভাবিক মনে হলেও এখানকার বিরাট বিরাট দীঘি খনন এবং কাছাকাছি অবস্থানে অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ প্রমাণ করে তাঁর সাথে প্রচুর লোক ছিল। বারবাজার থেকে সুদূর বাগেরহাট পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে এর স্বাক্ষর মিলবে।

যতদূর মনে হয় জনশ্রুতির ষাট হাজার সৈন্য তাঁর সাথে থাকায় স্বাভাবিক। আর এ সমস্ত সৈন্যদের ওজু–গোসলের জন্য প্রয়োজন হয়েছে পুকুর বা দীঘির এবং নামাজের জন্য মসজিদের। এ জন্যেই সম্ভবতঃ প্রতিটি পুকুর পাড়েই ছিল মসজিদ এবং পুকুরে ছিল সান বাঁধান ঘাট।

বারবাজার অবস্থান কালে এ অঞ্চলে ব্যাপক ইসলাম প্রচারের কাজ হয়। এখানে তিনি বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করেন। এর মধ্যে যে গুলো উদ্ধার করা গেছে, তা' হল গোড়া মসজিদ, জোড় বাঙলার মসজিদ, চেরাগদানী মসজিদ, সাতগাছিয়ার মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বারবাজারে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি যশোর মুড়লীতে উপস্থিত হন। মুড়লীকে তিনি কসবায় বা শহরে পরিণত করেন। অবশ্য মুড়লীও একটি অতি প্রাচীন স্থান। এ সম্পর্কে এ, এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, "বারবাজারে কিছুকাল অবস্থানের পর খানজাহান সদলবলে ভৈরব তীর বহিয়া মুরলী উপস্থিত হন। মুরলী অতীব প্রাচীন স্থান। মুরলী এবং বারবাজারে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। খান জাহান এই স্থানের নামকরণ করেন মুরলী কসবা। কসবা ফার্সী শব্দ, এর অর্থ শহর। মুরলী বর্তমান যশোর শহর সংলগ্ন উপশহর। মুরলীতে মধ্যযুগে সৈন্য বাহিনীর জন্য মৃত্তিকা গর্ভে কেল্লা ছিল। সে নিদর্শন এখন নেই। এখনও লোকে সেখানকার বসতবাটিকে কেল্লাবাটী বলে থাকে। প্রাচীন আমলের শিব মন্দির ও কালী বাড়ী আছে। হাজী মহসীন প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া এখানেই অবস্থিত।"[৩২]

মুড়লী সম্বন্ধে আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া লিখেছেন, "মুড়লী বেশ প্রাচীন স্থান। প্রাচীন কালে এ স্থান চার–পাঁচ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। পাল পাড়া, বামন পাড়া, পুরাতন কসবা, মুড়লী এবং তার উত্তর–পূর্বদিকে ২/৩ মাইল পর্যন্ত মুড়লী নগরী বিস্তৃত ছিল। স্যার কানিংহ্যাম অনুমান করেন যে প্রাচীন সমতট রাজ্যের রাজধানী ছিল এই মুড়লীতে। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও এ স্থান যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ স্থানে অনেক বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলেও কেউ কেউ অনুমান করেন।"[৩৩]

www.pathagar.com

সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন, "প্রাচীন কালে এখানে এক সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত কালী বাড়ি ছিল। এক প্রকান্ড বটবৃক্ষের কোটরে সেই মন্দিরের প্রাচীরগুলো দেখা যায়। চাঁচড়া রাজের উদার ব্যবস্থায় এখানে পূজাদির বিশেষ আয়োজন ছিল। কালে তাহা নষ্ট হইয়াছে। কালীর হস্তপদহীন দেহ পিন্ডটি আছে, কিন্তু শায়িত শিব মূর্তির প্রায় সম্পূর্ণই আছে। এখনও সেখানে প্রতি অমাবস্যায় পূজা হয়। ....এখানে কোন বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।"[৩৪]

খান জাহান আলী মুড়লীতে বেশী দিন অবস্থান করেননি। তবুও তিনি এখানে গড়ে তোলেন বেশ কিছু মসজিদ। খনন করেন কয়েকটি পুকুর ও দীঘি। মুড়লী কসবা ছাড়াও গড়ে তোলেন ছানি কসবা বলে আলাদা একটি গঞ্জ। যেটি আজকের পুরাতন কসবা। "সম্প্রতি যশোর মুরলী থেকে চার মাইলের মাথায় অবস্থিত রায়নগরের বিরাট দীঘিটির চার পাশে পাঁচিল বেষ্টিত করে একটি বিরাট উদ্যানের আকার দেওয়া হয়েছে। একটি সাধারণ বনভোজন কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'পিকনিক কর্ণার'। সারাদেশের ভোজন বিলাসী ব্যক্তিগণ কোনো কোনো উপলক্ষে এখানে বনভোজন কার্য সমাধা করে তৃপ্তি লাভ করে ও পূণ্যাত্মা হযরত খান জাহানের জল-দান পুণ্যের কথা স্মরণ করে।"[৩৫]

মুড়লী থেকে হযরত খান জাহান আলীর অনুচরবর্গ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল কপোতাক্ষ নদের তীর ধরে সুন্দর বনের বেদ কাশী পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করে। এ দলের নেতৃত্ব দেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ। "এরা মূলত কপোতাক্ষ নদের তীর ধরে অগ্রসর হন এবং সুন্দর বনের অভ্যন্তর ভাগে বেদকাশী পর্যন্ত অভিযান করে সুন্দর বন আবাদ করেন, পথিমধ্যে প্রয়োজন মুতাবিক দীঘি খনন করেন, মসজিদ খানকা নির্মাণ করেন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করেন।

তাঁরা মুরলী থেকে প্রথম যান খান পুর (খান জাহান পুর?)। খানপুর থেকে যান বিদ্যানন্দ কাঠি। বিদ্যানন্দ কাঠিতে যে বিরাট দীঘি খনন করেন, তা আজও এই অঞ্চলের বিস্ময় হয়ে আছে। দীঘিটি দৈর্ঘ ও প্রস্থে যথাক্রমে ১৬০০ হাত ও ৭০০ হাত। বিদ্যানন্দ কাঠিতে খান জাহানের নামে একটি দরগাহ বা আস্তানা (খানকাহ্) প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও এখানে বছর শেষে খান জাহানের নামে 'ওরস' ও মেলা বসে।"[৩৬]

অন্যদল ভৈরব নদীর তীর ধরে পয়গ্রাম কসবা হয়ে বাগেরহাট পৌছান। এ দলের নেতৃত্ব দেন স্বয়ং হযরত খান জাহান আলী (রঃ)। "বারোবজার থেকে মুরলী বা মুড়লী কশবা (বর্তমান যশোর) হয়ে হযরত খান জাহান তাঁর মূল বাহিনী নিয়ে পয়গ্রাম কশবা যান। পয়গাম কশবায় প্রায় দশ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি পয়গ্রামের শাসনভার আবূ তাহির নামক এক নবদীক্ষিত মুসলিম যুবকের উপর অর্পণ করে তিনি তাঁর সম্রাজ্যের ভবিষ্যত রাজধানী হাবেলী কশবার (বর্তমান বাগেরহাট) দিকে রওয়ানা হন। উল্লেখ্য, এই আবূ তাহিরই পরবর্তীকালে তাঁর মুখ্য মহাপাত্র বা প্রধানমন্ত্রীরূপে

www.pathagar.com

পরিচিত হন এবং বাংলাদেশে পীরালী নামক এক অভিনব ইসলামী সংস্কৃতি ধারার উদ্ভব ঘটান।"[৩৭]

বারবাজার হতে মুড়লী কসবা পর্যন্ত রাস্তাটিকে সেকালে গাযীর জাঙ্গাল বলা হত। আর মুড়লী হতে দক্ষিণ-পূর্ব অর্থাৎ সুন্দরবন ও বাগেরহাট পর্যন্ত খান জাহান আলীর শিষ্যদের তৈরী রাস্তাকে বলা হয় খাঞ্জালীর বা খান জাহান আলীর জাঙ্গাল বা রাস্তা। এ প্রসংগে মুহম্মদ আবূ তালিব বলেন, "সেকালে বারোবাজার থেকে মুরলী কশবা পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার নাম হয়েছিল 'গাযীর জাঙ্গাল' এবং গাযীর জাঙ্গালের যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হ'ল খাঞ্জালীর বা খান জাহান আলীর জাঙ্গাল বা রাস্তা। আজও বাগেরহাটে হযরত খান জাহানের দরগাহ পর্যন্ত এই রাস্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। বলাবাহুল্য, গাযী-খাঞ্জালীর রাস্তা এতদাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সম্রাজ্য বিস্তারের প্রাচীনতম স্মারক। যশোর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদূর বিস্তৃত খাঞ্জালী রাস্তাও অদ্যাবধি ব্যবহার যোগ্য থেকে এই মহান কর্মবীরের স্মৃতি বহন করছে।"[৩৮]

এ প্রসঙ্গে এ, এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, "সেকালে বারবাজার হইতে মুরলী পর্যন্ত রাস্তা ছিল। উহার নাম হইয়াছিল গাজীর জাঙ্গাল। যশোর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব দুই দিকেই খান জাহান আলী বা খাঞ্জা আলীর রাস্তা বা জাঙ্গাল আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি খান জাহানের অসংখ্য শিষ্য ও অনুচর জুটিয়াছিল। তাহারা সকলেই সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত ছিল। এই সৈন্যদল বসিয়া বসিয়া রাজকোষ শূন্য করিত না। তাহারা সর্বদা কায়িক পরিশ্রম করিয়া রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ এবং জলাশয় খনন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত। তাহাদের প্রত্যেকের এক একখানি কোদাল ছিল। খান জাহান যে অদ্ভুত কর্মা পুরুষ ছিলেন, ইহা তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন।"[৩৯]

অন্যত্র রাস্তা সম্বন্ধে জলিল সাহেব বলেছেন, "খানপুর ও বিদ্যানন্দ কাটি হইতে খান জাহানের অনুচরবর্গ রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এখনও সেই প্রাচীন রাস্তার স্থান লোকে দেখাইয়া থাকে। এই রাস্তা যশোর হইতে আরম্ভ হইয়া খানপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দ কাটি হইয়া মাগুরা ঘোনা, ডাঙ্গানলতা, ভায়ড়া, তালা, কপিলমুনি ও সরল হইয়া শিবসা নদী অতিক্রম করিয়াছে। শিবসা নদী পার হইয়া এই রাস্তা আমাদী ও মসজিদকুড়ে মিশিয়াছে। কথিত আছে যে এই রাস্তা তৎকালে সুন্দরবনের অন্তর্গত বেদকাশী নামক স্থানে শেষ হইয়াছিল। কপোতাক্ষ নদীর পার্শ্ব দিয়া এই রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। পথের দুইদিকে বহু কীর্তি চিহ্ন আজিও বিদ্যমান।"[৪০]

হযরত খান জাহান আলী'র (রঃ) শিষ্যদের মধ্যে হযরত বোরহান উদ্দীন ও হযরত গরীব শাহ (রঃ)কে যশোর অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে যান। তাঁরা দু'জন যশোরের মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন। অন্যান্য শিষ্যগণ স্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্বল। যথা স্থানে এদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

বারবাজার থেকে বাগেরহাট এবং বারবাজার থেকে সুন্দর বন পর্যন্ত হযরত খান

www.pathagar.com

জাহান আলী (রঃ) ও তাঁর শিষ্যদের কীর্তিরাজিতে ভরা। বিশেষ করে রাস্তা, দীঘি ও মসজিদ তার প্রমাণ।

খান জাহান আলী (রঃ)-এর বিপুল কীর্তিরাজির মধ্যে প্রধান প্রধান কীর্তি হলো- বারবাজার, মুড়লী কসবা, পয়গ্রাম কসবা ও বাগেরহাট নগরীর প্রতিষ্ঠা। তা'ছাড়া ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ, বিবি বেগেনীর এক গম্বুজ মসজিদ, চুনাখোলা এক গম্বুজ মসজিদ, খান জাহানের বসতবাটী, রণবিজয়পুর মসজিদ, খান জাহানের মাযার, পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের মাযার, দরগা মসজিদ, নয় গম্বুজ মসজিদ, সিঙ্গারা মসজিদ, মসজিদ কুড় মসজিদ, তিন গম্বুজ মসজিদ, বাবুর্চি খানা, খাঞ্জালীর জাঙ্গাল বা রাস্তা, ঠাকুর দীঘি, ঘোড়া দীঘি, করে দীঘি ইত্যাদি যা তাঁকে অমর করে রাখবে।

তবে তাঁর সর্ব শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো ষাট গম্বুজ মসজিদ। এই ষাট গম্বুজ মসজিদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেই হযরত খান জাহান আলী (রঃ) প্রসংগের ইতি টানতে চাই। মসজিদটি সম্পর্কে মুহাম্মদ আবু তালিব বলেন, "খান জাহানের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো ষাট গম্বুজ নামধারী বিশালকায় মসজিদ ও দরবার গৃহ এবং পার্শ্ববর্তী বিশাল বিস্তার ঘোড়া দীঘি। ঘোড়া দীঘিটি দৈর্ঘ্যে ১০০০ হাত এবং প্রস্থে ৬০০ হাত। এটি তাঁর একটি স্থায়ী কীর্তি। সুদীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হলেও দীঘিটি আজও সুনির্মল পানীয়ের এক বড় আধার হয়ে আছে।

এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বাগেরহাট পৌরসভা এই দীঘির পানি তিন মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত শহরের জন্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন।

ঘোড়া দীঘির পাড়েই অবস্থিত রয়েছে বিশালকায় ষাটগম্বুজ মসজিদ। যতদূর জানা যায়, বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের মধ্যেই ষাটগম্বুজ বৃহত্তম মসজিদ। এর দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট ও প্রস্থ ১০৮ ফুট।"[৪১]

এ, এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, "ঘোড়াদীঘি পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। ইহার পূর্ব তীরে খান জাহানের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি সুবিখ্যাত ষাট গুম্বজ অট্টালিকা। ইহার ন্যায় বৃহৎকায় মসজিদ বাংলাদেশে আর নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট। গৃহের অভ্যন্তরে গুম্বজের উচ্চতা ২২ ফুট। এই বিশালাকায় হর্মের সম্মুখ দিকে মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান ও উহার দুই পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া ছোট খিলান আছে। ইহার প্রাচীরের প্রশস্ততা প্রায় ৯ ফুট।"[৪২]

এ মসজিদে মোট ৮১টি (৭৭+৪) গম্বুজ আছে। ৬০টি খাম্বা বা থামের (PiLLar) উপর ৭৭টি গম্বুজ এবং চার কোণে ৪টি গম্বুজ রয়েছে।

"মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ পূর্ব-পশ্চিমে ৭ ভাগ ও উত্তর-দক্ষিণে ১১ ভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলির কেন্দ্রস্থল পরস্পর ১৩ ফুট দূরে দূরে সর্ব মোট ৬০টি স্তম্ভ আছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় দরজা ও কেন্দ্রীয় মেহরাবের মধ্যবর্তী স্তম্ভগুলির (উত্তর-দক্ষিণে) পারস্পারিক দূরত্ব ১৬-৬"। স্তম্ভগুলি সব পাথরের তৈরী। তৃতীয় সারির ২টি, অষ্টম সারির ২টি ও একাদশ সারির ১টি স্তম্ভের পাথর চারদিক ইট দ্বারা

www.pathagar.com

আবৃত।

কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ ও কেন্দ্রীয় মেহরাবের মধ্যবর্তী স্থানের উপর যে ৭টি আচ্ছাদন আছে, সেগুলি বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের আকারে নির্মিত। এগুলির তলদেশ বর্গাকৃতির এবং প্রত্যেক বাহু প্রায় ১৬ ফুট লম্বা। এই ৭টি আচ্ছাদনের দু'পাশে ৩৫টি করে যে ৭০টি গম্বুজ আছে সেগুলি অর্ধ গোলাকার। এই গম্বুজগুলির ব্যাস ১২´-৯´´।'[৪৩]

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ১১টি প্রবেশ পথ, পশ্চিম দেয়ালে ১০টি মেহরাব এবং একটি ছোট দরজা আছে।

মসজিদের স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যার উল্‌সে হেইগ বলেন, 'ষাট গুম্বজের চতুস্কোণের মিনারগুলি তোঘলক স্থাপত্য শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন। ইহার আভ্যন্তরীণ প্রশস্ত স্থান অতীব সুন্দর। তবে প্রস্তর স্তম্ভের আধিক্যের জন্য উহার সৌন্দর্য কিছুটা ম্লান হইয়াছে।'

এ, এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, 'উপমহাদেশে তুর্ক-আফগান স্থাপত্যের মধ্যে ষাট গুম্বজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রস্তর বিহীন সুন্দরবন প্রদেশে এই বিশালকায় অট্টালিকা যে মর্মর স্বপ্নের স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'[৪৪]

কোন স্বাধীন সুলতান না হয়েও খান জাহান আলী যে বিশাল কর্তীরাজি রেখে গেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। এই জন্যই সম্ভবতঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব তাঁকে সম্রাট শাহ জাহানের সাথে তুলনা করতে চেয়েছেন। তাঁর অন্তরের বিশালতা ছিল আকাশের মত, যাঁর কারণে প্রজা মঙ্গলের জন্য এত অধিক জনহিতকর কাজ করা সম্ভব হয়েছে। জলিল সাহেব ঠিকই বলেছেন, 'বিশালকায় জলাশয়, পাশে বিশালকায় মসজিদ ও দরবার গৃহ উহার নির্মাণ কর্তার অন্তরের বিশালতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।'[৪৫]

পাদটিকা

১.	হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)	-সেলিম আহমদ-	ভূমিকা
২.	বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ	-আ, কা, মো, যাকারিয়া	৩৪৩ পৃষ্ঠা
৩.	খুলনা জেলায় ইসলাম	-মুহম্মদ আবু তালিব	৫৭ ,,
৪.	বাংলাদেশে ইসলাম	-আবদুল মান্নান তালিব	১০৩ ,,
৫.	বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ	-আ, কা, মো, যাকারিয়া	৩৪৬ ,,
৬.	প্রাগুক্ত	- -	৩৪৬ ,,
৭.	বাংলাদেশে ইসলাম	-আবদুল মান্নান তালিব	১৫৩ ,,
৮.	খুলনা জেলায় ইসলাম	-মুহম্মদ আবু তালিব	৫৭ ,,
৯.	বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ	-আ, কা, মো, যাকারিয়া	৩৪৭ ,,
১০.	সুন্দর বনের ইতিহাস	-এ, এফ, এম আবদুল জলিল	৩২০ ,,

www.pathagar.com

১১.	প্রাগুক্ত	–	৩২১ ,,
১২.	প্রাগুক্ত	–	৩২১ ,,
১৩.	খুলনা জেলায় ইসলাম	–মুহম্মদ আবূ তালিব	৬৩ ,,
১৪.	হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)	–সেলিম আহমদ	৩–৪ ,,
১৫.	প্রাগুক্ত	–	৩ ,,
১৬.	প্রাগুক্ত	–	২ ,,
১৭.	প্রাগুক্ত	–	৩ ,,
১৮.	খুলনা গেজেটিয়ার	–মিঃ ওমালী	
১৯.	সুন্দর বনের ইতিহাস	–এ, এফ, এম আবদুল জলিল	৩১৩ ,,
২০.	প্রাগুক্ত	–	৩১৩ ,,
২১.	যশোর খুলনার ইতিহাস	–সতীশ চন্দ্র মিত্র	
২২.	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড)	–ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৩৮১ ,,
২৩.	সুন্দর বনের ইতিহাস	–এ, এফ, এম আবদুল জলিল	৩১৫ ,,
২৪.	খুলনা জেলায় ইসলাম	–মুহম্মদ আবূ তালিব	৬১ ,,
২৫.	হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)	–সেলিম আহমদ	৩ ,,
২৬.	খুলনা জেলায় ইসলাম	–মুহম্মদ আবূ তালিব	৬১ ,,
২৭.	হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)	–সেলিম আহমদ	৪ ,,
২৮.	সুন্দর বনের ইতিহাস	–এ, এফ, এম আবদুল জলিল–	৩২২ ,,
২৯.	খুলনা জেলায় ইসলাম	–মুহম্মদ আবূ তালিব	৮৭ ,,
৩০.	সুন্দর বনের ইতিহাস	–এ, এফ, এম আবদুল জলিল	৩২২ ,,
৩১.	প্রাগুক্ত	–	৩২৩ ,,
৩২.	প্রাগুক্ত	–	৩২৪ ,,
৩৩.	বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ	–আ, কা, মো, যাকারিয়া	৩২১ ,,
৩৪.	যশোর খুলনার ইতিহাস	–সতীশ চন্দ্র মিত্র	২০৯ ,,
৩৫.	খুলনা জেলায় ইসলাম	–মুহম্মদ আবূ তালিব	৮৯ ,,
৩৬.	প্রাগুক্ত	–	৯০–৯১ ,,
৩৭.	প্রাগুক্ত	–	৯০ ,,
৩৮.	প্রাগুক্ত	–	৮৮–৮৯,,
৩৯.	সুন্দর বনের ইতিহাস	–সতীশ চন্দ্র মিত্র	৩২৬ ,,
৪০.	প্রাগুক্ত	–	৩২৭ ,,
৪১.	খুলনা জেলায় ইসলাম	–মুহম্মদ আবূ তালিব	১০৬ ,,
৪২.	সুন্দর বনের ইতিহাস	–এ, এফ, এম আবদুল জলিল	৩৪২ ,,
৪৩.	বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ	–আ, কা, মো, যাকারিয়া	৩৫৫ ,,
৪৪.	সুন্দর বনের ইতিহাস	–এ, এফ, এম আবদুল জলিল	৩৪৩ ,,
৪৫.	প্রাগুক্ত	–	৩৪৪ ,,

www.pathagar.com

হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (রঃ)

ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে যে সমস্ত অলিয়ে কামিল ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছেন এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত উলূঘ খান জাহান (রঃ) নিঃসন্দেহে অন্যতম। এ মহান মনীষির সাথে যে সমস্ত শিষ্যগণ ছিলেন তারাও স্ব স্ব মহিমায় খ্যাতিমান হয়ে আছেন। কিন্তু এই বাংলার সন্তান একেবারে খাস বাঙালী কোন শিষ্য, হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির (রঃ)-এর মত যশস্বী হতে পারেননি।

আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দির গৌড়ার দিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে মুহাম্মদ তাহির জন্ম গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে নীল কান্ত বলেছেন-

"পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস
যে গায়েতে নবদ্বীপের হইলো সর্বনাস।"

তাঁর পূর্ব নাম ছিলো, 'গোবিন্দ ঠাকুর'। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে খাটো চোখে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'তাঁহার পূর্বে কি নাম ছিল, জানি না, জানিয়াও কোন কাজ নাই, এখন তাঁহার নাম হলো মোহাম্মদ তাহের।'[১] অবশ্য এ, এফ, এম, আবদুল জলিল সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বহুদিন অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে, এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব নাম ছিলো গোবিন্দলাল রায়। তিনি গোবিন্দ ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি খান জাহানের বিশেষ প্রিয় পাত্র ও আমত্য ছিলেন।'[২] তিনি হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (রঃ) এর পরশে ইসলাস গ্রহণ করেন। এবং প্রধান সহচরে পরিণত হন। হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (রঃ) এর এদেশীয় শিষ্যদের মধ্যে হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরই সব থেকে বেশী প্রসিদ্ধ ও জননন্দিত ছিলেন। তাঁর হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নব দীক্ষিত মুসলমানরা পীরেলি নামে পরিচিত হন।

পীরেলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ, এফ, এম, আবদুল জলিল সাহেব লিখেছেন, "পয়গ্রাম কসবায় বিখ্যাত পীর আলী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোর অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ খান জাহানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করেন। তাঁহার নাম মোহম্মদ তাহের। তিনি স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ণ নাম হইয়াছিলো পীর আলী মোহাম্মদ তাহের। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট। সতীশ বাবু তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,'ব্রাহ্মণ পরহিংসা করিতে গিয়া আত্মহিংসাই করিয়া ছিলেন। কারণ তিনি ধর্ম বা রাজ্য লাভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতি ধর্ম বিসর্জন দিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।'[৩] এ,এফ,এম, আবদুল জলিল অন্যত্র লিখেছেন-

www.pathagar.com

'খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহি প্রাচীন হিন্দু প্রধান স্থান। সেনহাটি, মূলঘর কালীয়া প্রভৃতি স্থানের বহু পূর্বে এখানে উচ্চ শ্রেণীর বসবাস ছিল। এই গ্রামের নাম ছিল পয়োগ্রাম, এখনও এ নাম আছে। এখানকার রায় চৌধুরী বংশের তৎকালে বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ তুর্ক-আফগান আমলের প্রথম দিকে এ ব্রাহ্মণ বংশ রাজ সরকার হইতে সম্মানসূচক রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা কনোজাগত ব্রাহ্মণ। ইহাদের পূর্ব পুরুষ গুড় গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ইহারা গুড়ী বা গুড়গাঞী ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত। এই বংশের কৃতি সন্তান দক্ষিণা নারায়ণ ও নাগর নাথ। কথিত আছে যে দক্ষিণা নারায়ণ দক্ষিণ ডিহি এবং নাগর উত্তর ডিহির সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

দক্ষিণ ডিহি নামের সহিত দক্ষিণা নারায়নের সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নাগর বেজের ডাঙ্গায় একটি হাট বাসাইয়া ছিলেন। উহা নাগরের হাট নামে পরিচিত ছিল। খান জাহানের আমলে চৌধুরীগণ সমাজে সম্মানিত ছিলেন। নাগর নিঃসন্তান। ভ্রাতা দক্ষিণা নারায়ণের চারিপুত্র ছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব এই নবাগত শাসনকর্তার অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং এই ঘটনাই ইতিহাসে পীরালিদের উৎপত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।'[৪]

এ সম্পর্কে মিঃ ওমালি বলেন, 'খান জাহান একদা রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ লইতে থাকেন। ইহাতে তদীয় হিন্দু কর্মচারী মোহাম্মদ তাহের (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই) বলেন যে, "ঘ্রাণেন কার্ধ ভোজনং" অর্থাৎ ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন। খান জাহান পরে একদিন খানা পিনার আয়োজন করেন। মাংসের গন্ধে তাহের নাকে কাপড় দিলে খান জাহন বলেন, যখন ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। তদানুসারে তাহের ইসলাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তাহেরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি হিন্দু থাকিয়া যান। তিনিই সর্ব প্রথম হিন্দু পীরালী এবং তাহেরকে লোকে উপহাসচ্ছলে পীরালি বলিত। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এদেশে পীরালি গান ও বহু কাহিনী রচিত হয়। ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত তাহের পীরালি আখ্যা পান।'[৫]

অন্য এক বর্ণনা মতে, 'মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে জয়দেব ও কামদেবের অন্তরের মিল ছিল না। তাহের মনে মনে তাঁহাদিগকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিতেন। এ সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি গল্প প্রচলিত আছে, উহা কতদুর সত্য জানি না। গল্পটি বর্ণনা করিতেছি-একদিন পবিত্র রমজানের সময় তাহের রোজা রাখিয়াছেন। দরবার গৃহে জয়দেব ও কামদেব অন্যান্য কর্মচারীসহ বসিয়া আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার বাটি হইতে একটি সুগন্ধি নেবু আনিয়া তাহেরকে উপহার দেন। পীরআলী নেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন। এমন সময় কামদেব বলিলেন হুজুর, ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন- 'ঘ্রাণেন

www.pathagar.com

কার্য ভোজনং' – আপনি গন্ধ শুকিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন? এ কথার পর পীরআলি ব্রাহ্মণের প্রতি চটিয়া যান। গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, একদিন তিনি সমস্ত কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইবেন। নির্ধারিত দিনে কামদেব ও জয়দেব সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাগৃহের প্রাঙ্গনে গো-মাংসের সহিত নানা প্রকার মসলা দিয়া রন্ধন কার্য ধুমধামের সহিত চলিতেছিল। রান্নার গন্ধে সভাগৃহ ভরপুর। জয়দেব ও কামদেব নাকে কাপড় দিয়া প্রতিরোধ করিতেছিলেন। পীরআলী নাকে কাপড় কেন জিজ্ঞাসা করিলে কামদেব মাংস রন্ধনের কথা উল্লেখ করেন; পীরআলী নেবুর গন্ধ উল্লেখ করিয়া বলিলেন- 'এখানে গো-মাংস রন্ধন হইতেছে। ইহাতে আপনাদের অর্ধেক ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনারা জাতিচ্যুত হইয়াছেন।

অতঃপর কামদেব ও জয়দেব ঐ মাংস খাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। পীর আলী তাঁহাদিগকে জামাল উদ্দীন, কামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়া আমাত্য শ্রেণীভূক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব দোষে অন্য দুই ভ্রাতা শুকদেব ও রতিদেব পীরালী ব্রাহ্মণ হিসাবে সমাজে পরিচিত হইলেন। ইহাই পীরালি সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিকথা।'[৬]

এ প্রসংগে জনৈক নীল কান্তের বরাত দিয়ে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে ঘটকদিগের পুঁথি থেকে কিছু উল্লেখ করেছেন, তা'হল-

খান জাহান মহামান পাতশা নফর।
যশোর সনন্দ লয়ে করিল সফর।।
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।
মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির।।
পূর্বেতে আছিল সেও কুলীনের নাতি।
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি।।
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হইল সর্বনাশ।।
সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর।
চেঙ্গুটিয়া পরগণায় হইল হাজির।।

এখানে লেখক খান জাহানকে কোন মুসলমান সুলতানের সনদ প্রাপ্ত প্রশাসক বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর মুহাম্মদ তাহিরের পরিচয় তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে নয় বরং কোন নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে মুসলমান হয়েছে। প্রকারন্তরে লেখক (সম্ভবত) বলতে চেয়েছেন ইসলাম প্রচার এদেশে কৌশলে হয়েছে। পুঁথির অনত্র এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-

আঙ্গিনায় বসে আছে উজীর তাহির।
কত প্রজা লয়ে ভেট করিছে হাজির।।
রোজার সে দিন পীর উপবাসী ছিল।

www.pathagar.com

হেন কালে একজন নেবু এনে দিল।।
গন্ধামোদে চারিদিকে ভরপুর হইল।
বাহবা বাহবা বলে নাকেতে ধরিল।।
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন।
বসে ছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ।।
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে।
ঘ্রাণেতে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে।।
কথায় বিদ্রুপ ভাবি তাহির অস্থির।
গোঁড়ামি ভাঙ্গিতে দোহের মনে কৈলা স্থির।।
দিন পরে মজলিস করিল তাহির।
জয়দেব কামাদেব হইল হাজির।।
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন।
শতশত বকরী আর গো মাংস রন্ধন।।
পলান্ডু লশুন গন্ধে সভা ভরপুর।
সেই সভায় ছিল আরও ব্রাহ্মণ প্রচুর।।
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
ফাঁকি দিয়া ছলে বলে কত পালাইল।।
কামদেব জয়দেবে করি সম্বোধন।
হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তখন।।
জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে।
ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে।।
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকি তো চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানা পিনা।।
উপায় না ভাবিয়া দোহে প্রমাদ গণিল।
হিতে বিপরীত দেখি শরম মরিল।।
পাকড়াও পাকড়াও হাঁক দিল পীর।
থতমত হয়ে দোহে হইল অস্থির।।
দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত।
পীরালী হইল তাঁরা হইল জাতি ভ্রষ্ট।।
কামাল জামাল নাম হইল দোহার।
ব্রাহ্মণ সমাজে পড়ে গেল হাহাকার।।
তখন ডাকিয়া দোহে আলী খানজহান।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান।।

'নবদীক্ষিত কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন প্রচুর সম্পত্তির জায়গীর পাইয়া

www.pathagar.com

সিঙ্গিয়া অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণ খুব সম্ভব খান জাহানের পয়গ্রাম ত্যাগের পরেই হইয়াছে। কথিত আছে খান জাহান তাঁহাদিগকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বাগের হাট অবস্থান কালে এই দুই ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় আসিতেন। বাগের হাটের পশ্চিমে সোনাতলা গ্রামে আজিও কামাল খাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।'[৭]

ছল চাতুরী বা কলা কৌশল নয় ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের হাতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। এই নবদীক্ষিত মুসলমানরা পীরেলি নামে পরিচিত হন। আর যে হিন্দু মুসলমান হতেন, তার হিন্দু আত্মীয়রা ঐ বংশের লোকদেরকে সমাজচ্যুত করতো। তারা পীরেলি ব্রাহ্মণ বা পীরেলি কায়াস্থ হিসাবে পরিচিত হন। এই পীরেলিদেরকে কুলীণ ব্রাহ্মণরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলতেন–

মোসলমানের গোস্ত ভাতে
জাত গেল তোর পথে পথে
ওরে ও পীরেলী বামন।

জানা যায়, 'পীরালি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বহন করতো। তাই দেখতে পাই, কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিঙ্গিয়ার মুস্তফী পরিবার, দক্ষিণ ডিহির রায় চৌধুরী পরিবার, খুলনার পিঠাভোগের ঠাকুর পরিবার, এই পীরালিদের উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত। বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথও এই পীরালি ঠাকুর পরিবারেরই সুসন্তান।

সংশ্রব দোষে রায় চৌধুরী বংশের লোকেরা পুত্র কন্যার বিবাহ লইয়া বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা প্রতিপত্তি ও অর্থ বলে সমাজকে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতে লাগিল। ইহাদের সহিত কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং আরও কতিপয় বংশ সংশ্রব দোষে পতিত হইয়াছিল। কলিকাতার ঠাকুরগণ ভট্টনারায়ণের সন্তান এবং কুশারী গাঞিভুক্ত ব্রাহ্মণ। খুলনা জেলার আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে কুশারীদের পূর্ব নিবাস ছিল। পীঠাভোগের কুশারীগণ রায় চৌধুরীদের সহিত আত্মীয়তা করিয়া পীরালী হন।' [৮]

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ট অংশের ১৭২ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, 'বর্তমান কালে খুলনা জিলার অন্তর্গত পিঠাভোগ গ্রামের কুশারী মহাশয়েরা চেঙ্গুটিয়ার গুড় চৌধুরী গণের ন্যায় শক্তিশালী প্রবল শ্রোত্রিয় জমিদার ছিলেন। ইহারা শান্ডিল্য ভট্টনারায়ণ পুত্র দীন কুশারীর বংশধর। যে সময় শুকদেব রায় চৌধুরী চেঙ্গুটিয়া পরগণার অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে কুশারী বংশের জগন্নাথ কুশারী বিশেষ বিখ্যাত জমিদার হইয়াছিলেন। ইনি পিঠাভোগের কুশারী বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত খানের কোন আত্মীয় হওয়াই সম্ভব।'[৯]

'কুশারী বংশের পঞ্চানন থেকেই পরবর্তীকালে কলকাতার জোড়া সাঁকোর

www.pathagar.com

বিখ্যাত ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।'[১০]

অন্যদিকে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ কে অনেকেই পীরালী বংশোদ্ভূত মনে করেন। এ প্রসংগে এ, এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এই পীরালি বংশের কৃতি সন্তান। তাঁহার আত্মীয় স্বজন পীরালি খাঁ বলিয়া পরিচিত। আমি মাওলানা সাহেবের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার বংশ পীরালি তাহা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, গৌড়ের সুলতান যদু বা জালাল উদ্দীনের সময় হইতে তাঁহারা মুসলমান এবং জনৈক আলী খানের বংশধর।'[১১]

এ বিষয়ে হান্টার সাহেব বলেছেন, 'সমস্ত রায়চৌধুরীগণ খান চৌধুরীতে পরিণত হয়। কিন্তু মাওলানা সাহেবের বংশ খান চৌধুরী নহে, শুধু খাঁ উপাধিধারী।'[১২]

অন্যত্র এ, এফ, এম আবদুল জলিল সাহেব লিখেছেন, ' কলিকাতা এবং স্থানীয় সাম্ভব্য সমস্ত সূত্র হইতে জানিয়া আমাদের মন্তব্য সন্নিবেশিত করিলাম। রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সহিত রবি বাবুর যেরূপ রক্ত সম্পর্ক, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সম্পর্ক ঠিক ততটুকু।'[১৩]

'হযরত পীর আলী মুহাম্মদ তাহির পয়গ্রাম অঞ্চলের শাসন কর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। জানা যায়, পরে তিনি খলিফতাবাদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।'[১৪]

গবেষক জনাব অধ্যাপক আবূ তালিব বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "সত্যি বলতে কি, পীরালী আবূ তাহিরই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বসূরী। আবূ তাহিরের আবির্ভাব যাদেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, শ্রী চৌতন্য তাদেরকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।"[১৫] এরপরই তালিব সাহেব বলেছেন, "ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে পীরালী সাহেব শ্রীচৈতন্যের দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁরই পথের অনুসারী ছিলেন। আরও বলা যেতে পারে, নির্যাতিত হিন্দু পীরালী সমাজ একাধারে চৈতন্যের ধর্ম ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শান্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"[১৬]

যাহোক পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় পয়গ্রাম কসবায়। 'হযরত খানজাহান এই গ্রামটিকে তার বিশাল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত রাজধানী শহর করার সুসংবাদ দান করেন। এবং অবিলম্বে গ্রামটিকে একটি 'কসবা' বা শহরে পরিণত করেন।'[১৭]

পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের জন্মস্থান হচ্ছে যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার (বর্তমানে জেলা) পেড়োলি গ্রামে। হযরত পীর আলী'র নামেই গ্রামটির নামকরণ হয় 'পীরালী'। বর্তমানে নামটির বিকৃত রূপ হচ্ছে 'পেড়োলি'।

হযরত পীর আলী'র নিকট এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ মুসলমান হন যে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ আর ছিল না বললেই চলে। এ জন্য অন্যান্য হিন্দু ব্রাহ্মণ গণ ভয় পেয়ে যান ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে এর স্বাক্ষ্য মেলে–

পীরাল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন

www.pathagar.com

উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।।
ব্রাহ্মণ জবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।।
কবি আরো বলেন–
পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গায়েতে নবদ্বীপের হৈল সর্বনাস।।
অথবা
"বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের আড়ে"

৮৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৪৫৯ সালে এ মহান কামেলে দ্বীন ও ইসলাম প্রচারক ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার বাগেরহাট হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (রঃ) এর মাজারের পাশেই রয়েছে। এ সম্বন্ধে সতীশ চন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "মহম্মদ তাহের এখানে মারা যান নাই, এখানে মাত্র তাঁহার একটি শূন্যগর্ভ সমাধিবেদী গাঁথা রহিয়াছে।... বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন রাখা কর্তব্য এই বুদ্ধিতে খাঁ জাহান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সেই একই জেলহজ্জ মাসে মহম্মদ তাহেরের জন্য এই স্মৃতি স্তম্ভ গঠিত করিয়া রাখিয়া যান। সমাধির উপরি ভাগটি প্রায় খাঁ জাহানের সমাধির ন্যায়, তবে ইহার ভিতরে কিছুই নাই, সিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করা যায়।"[১৮] সতীশ বাবুর এ মন্তব্যের সাথে আমরা কোন ক্রমেই এক মত হতে পারি না। কবরের নীচে এ ধরনের সুড়ঙ্গের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তা'ছাড়া আমরা পূর্বেই তাঁর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেছি।

তাঁর মাজারের শিলালিপিতে লেখা আছে, "হাজিহি রওজাতুন মুবারাকাতুন মির রিয়াজিল জান্নাতি ওয়া হাজিহি সাখরিয়া তুল লিহাবীবিহি এসমুহু মুহাম্মদ তাহির ছালাছা সিত্তিনা ওয়া সামানিয়াতা।।" অর্থাৎ এই স্থান বেহেশতের বাগিচা সাদৃশ এবং ইহা জনৈক বন্ধুর মাযার, নাম– আবু তাহির, ওফাত কাল –৮৬৩ হিঃ/১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। এই একই বৎসর হযরত খান জাহান (রঃ) এর ওফাত হয়।

পাদটিকা

১। যশোহর–খুলনার ইতিহাস, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা– শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র
২। সুন্দর বনের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল
৩। প্রাগুক্ত– ৩৩২ পৃষ্ঠা
৪। প্রাগুক্ত– ৩৩৩ ''
৫। প্রাগুক্ত– ৩৩৩/৩৪ ''
৬। প্রাগুক্ত– ৩৩৪ ''
৭। প্রাগুক্ত– ৩৩৬ ''
৮। প্রাগুক্ত– ৩৩৭ ''

www.pathagar.com

৯। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ট অংশের ১৭২ পৃষ্ঠা–নগেন্দ্রনাথ বসু
১০। খুলনা জেলায় ইসলাম, ৭১ পৃষ্ঠা– মুহম্মদ আবূ তালিব
১১। সুন্দর বনের ইতিহাস।, ৩৩৭ পৃষ্ঠা– এ, এফ, এম আবদুল জলিল
১২। প্রাগুক্ত
১৩। প্রাগুক্ত, ৩৩৮ পৃষ্ঠা
১৪। হযরত খান জাহান আলী (রঃ), ৬ পৃষ্ঠা– সেলিম আহমদ।
১৫। খুলনা জেলায় ইসলাম, ৬৯ পৃষ্ঠা– মুহম্মদ আবূ তালিব
১৬। প্রাগুক্ত
১৭। প্রাগুক্ত ৬৮ পৃষ্ঠা
১৮। যশোর খুলনার ইতিহাস, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা– সতীশ চন্দ্র মিত্র

হযরত পীর খালাস খাঁ (রঃ)

কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে সুন্দরবনের বেদকাশী নামক স্থানটি পীর খালাস খাঁর ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ছিলো। সম্ভবত তিনি পাঠান আমলে ইসলাম প্রচার করেন। বেদকাশীতে খালাস খাঁর দীঘি নামে একটি বিশাল দীঘি আছে। এই দীঘির পাড়েই পীর খালাস খাঁর মাজার রয়েছে। জনাব গোলাম সাকলায়েন তাকে যশোরের একজন সুফী দরবেশ বলে উল্লেখ করেছেন।

খালাস খাঁ সম্বন্ধে এ, এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, "বুড়ো খাঁর জনৈক প্রধান সহকর্মীর নাম ছিল খালেস খাঁ। তিনি এদেশে খালাস খাঁ নামে সুপরিচিত। তিনি বেতকাশীতে একটি প্রকান্ড দীঘি খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া ছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব অত্যাধিক। সর্বত্র লবনাক্ত জল। দূর দূরান্ত হইতে অসংখ্য লোক এই বেতকাশীর দীঘির জল লইয়া সেবন করিয়া থাকে। আজিও বহু হাট বাজারে গ্রীষ্ম কালে এই জল বিক্রয় করিয়া বহু দরিদ্র লোক জীবন ধারণ করে। খনন কারীর নামানুসারে এই দীঘির নাম হইয়াছিল খালাস খাঁর দীঘি।"[১]

গবেষক জনাব মুহম্মদ আবূ তালিব খালাস খাঁ সম্বন্ধে বলেন, "বুড়ো খাঁর এক অনুচর খালাস খাঁ অদূরে (আমাদি গ্রামে) বেদ কাশিতে একটি বিরাট দীঘি খনন করেন। এই দীঘির পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুস্বাদু বলে দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে এই দীঘির পানি আহরণ করে নিয়ে খায়। গরম কালে বহু গরীব পরিবার এই দীঘির পানি

১. এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল–সন্দুরবনের ইতিহাস–পৃ–৩২৯।

www.pathagar.com

দূর অঞ্চলে সরবরাহ করে জীবিকার উপায় করে থাকে। খনন কারীর নামানুসারে দীঘিটি খালাস খাঁ দীঘি নামে পরিচিত হয়।'' ১

কিন্তু জনাব আবদুল মান্নান তালিব খালাস খাঁকে হযরত খান জাহান আলীর শিষ্য বা বুড়ো খাঁর শিষ্য বলে স্বীকার করেননি, তিনি তাঁকে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রথম ইসলাম প্রচারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে সুন্দরবনের বেদকাশী নামক স্থানটিকে খালাস খাঁ নিজের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তখন যশোহর জেলা ও সুন্দরবনের এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত এসে পৌছেনি। তিনিই এ অঞ্চলের প্রথম ইসলাম প্রচারক। সম্ভবত তার আগে বা সমসময়ে যশোহর জেলার অন্যান্য অঞ্চলে বড় খাঁন গাজী ও খান জাহান আলীর আবির্ভাব হয়েছিলো। তুর্কী সুলতানদের রাজত্ব কালে তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে তার আগমন কালের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বেদকাশী গ্রামে 'খালাস খাঁ দীঘির' পাড়ে একটি প্রাচীন কালি মন্দিরের নিকট খালাস খাঁর মাজার অবস্থিত। দীঘি খনন করা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনিও খান জাহান আলীর ন্যায় জনহিতকর কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অভিযান চালিয়েছিলেন। কোন রাজশক্তির সহায়তা ছাড়াই পৌত্তলিকতার অবসান করে এ অঞ্চলকে তৌহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য তাঁকে যে বিপুল সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয়েছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।''২

তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সতীশ চন্দ্র মিত্র তার যশোর খুলনার ইতিহাসে দীঘিটিকে কালী খালাস খাঁর দীঘি. বলে উল্লেখ করেছেন। খালাস খাঁর নামের পূর্বে কালী শব্দটি তিনি কোথা থেকে যে আমদানী করেছেন তা জানা যায়নি।

হযরত গরীব শাহ (রঃ)

হযরত গরীব শাহ (রঃ) যে হযরত উলুঘ খানজাহান আলীর সহচর ছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। উলুঘ খান জাহান আলী যখন, 'বারোবাজার পরিত্যাগ করে ভৈরবের তীর ধরে বাগেরহাটের দিকে যাত্রা শুরু করেন, তখন অসংখ্য ভক্ত তাঁর অনুসরণ করে। বারোবাজার হতে তিনি যশোরের কয়েকটি স্থানে ধর্ম প্রচারার্থে শিষ্যদের প্রেরণ করেন। বাহরাম শাহ ও গরীব শাহ তাদের অন্যতম। এরা দু'জনে মুরলীতে এসে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। কথিত আছে, বারোবাজার হতে যখন পীর খান জাহান আলী মুরলী অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন অনুচর বর্গের খাদ্য প্রস্তুতের ভার দিয়েছিলেন এই দুই শিষ্যকে। তারা যথা সময়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে না পারায় পীর

১. মু হম্মদ আবূ তালিব–খুলনা জেলায় ইসলাম–পৃ–৯৬।

২. আবদুল মান্নান তালিব–বাংলাদেশে ইসলাম–পৃ–১৫৫)

www.pathagar.com

খান জাহান আলী পথিমধ্যে অপেক্ষা ও বিশ্রাম না করে নদীর কুল ধরে সামনে চলে যান। প্রেসিডেন্সি বিভাগের মনুমেন্টের তালিকায় এই প্রচলিত গল্পটি কৌতুহলী মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।'

হযরত গরীব শাহ (রঃ) যশোর এর কেন্দ্রস্থল দড়াটানা মোড়ের সামান্য পশ্চিমে ভৈরব নদীর তীরে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর মাজারটি ছোট হলেও বেশ পরিপাটি ও সুন্দর। সব সময় ভক্তের আনা-গোনা পরিলক্ষিত হয়। মাজারের পাশদিয়ে দড়াটানা থেকে যে সড়কটি এয়ারপোর্টের দিকে গেছে,এ সড়কটির নাম হযরত গরীব শাহ(রঃ) সড়ক । একজন লোককবি হযরত গরীব শাহ সম্পর্কে লিখেছেন-

'বন্দিলাম গরীবশাহ
তাঁর মোকাম কসবা
তেনার পায় হাজার সালাম।'

জনৈক পর্যটক ভোলানাথ চন্দ ১৮৪৬ সালে যশোর ভ্রমণ করেন, 'কসবা' সমন্ধে তার দৃষ্টি ভঙ্গি হলো -"প্রকৃত পক্ষে এটি ছিল মুসলমান অধ্যুষিত একটি স্থান বা কসবা যার মাধ্যমে নামটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই কসবার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গরীব পীর; যিনি ষষ্ঠদশ শতাব্দিতে বাংলায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই পীর সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী রয়েছে। স্থানীয় ভাবে জানা যায় যে একদা এই পীর নৌকা যোগে ভৈরব পাড়ি দিচ্ছিলেন, একটা নতুন আস্তানার সন্ধানে। এই কসবা লক্ষ্য করে এখানে তিনি তাঁর আস্তানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হন এবং নৌকার মাঝি মাল্লাদের নৌকা লাগানোর জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু স্রোতের প্রচন্ড বেগ থাকায় মাঝিদের পক্ষে একাজ দুরুহ হয়ে পড়ে। রাগ হয়ে দরবেশ নদীর স্রোতকে ভৎসনা করেন, ফলে পরবর্তীকালে এই নদীর স্রোত স্তিমিত হয়ে যায়। জন সাধারণ বিশ্বাস করে যে দরবেশের জন্যই নদীর এই অবস্থা হয়েছে।"[১]

হযরত বাহরাম শাহ (রঃ)

হযরত বাহরাম শাহ, গরীব শাহ (রঃ) এর সঙ্গী ছিলেন অর্থাৎ হযরত উলুঘ খান জাহান আলীর নির্দেশে বারবাজার থেকে মুড়লী কসবা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। যশোর কারবালা পুকুরের পশ্চিম পাড়ে হযরত বাহরাম শাহ (রঃ) মাজার রয়েছে। কারবালার পুকুরটি পীর বাহরাম শাহ (রঃ) এর খনন করা।

পীর বাহরাম শাহ(রঃ)-এর কবর নিয়ে মতভেদ আছে, সাধারণ লোকেরা যে ইটের বেদীটিকে বাহরাম শাহ'র কবর বলেন ঐতিহাসিকরা ঐ বেদীটিকে একটা

১. যশোর পরিচিতি ৫ম সংখ্যা-পৃঃ ১১৩।

www.pathagar.com

প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ বলে মনে করেন। "বেদীটি দোলমঞ্চের মত। এর পরিধি, ২৪' X ১৮' ফুট। নিম্নের বেদীর উপর তাকে তাকে আরো তিনটি বেদী আছে। এটা একটা প্রাচীন কালের ছোট খাট বৌদ্ধ স্তূপ। বেদীর দক্ষিণ ধারে যে সুন্দর পাকা কবর আছে, তা' বাহরাম সাহেবের কবর।"[১]

এ সমন্ধে ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন,"কার্ববালা পুকুরের সন্নিকটে পশ্চিমে যে বিস্তৃত উচ্চ ইষ্টক বেদীকে বেহরাম বা করোণ সাহের সমাধি বলা হয়, উহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া অনুমান করি। বেদীটি দোল মঞ্চের মত, উহা ইদ্‌গা নহে, এমন সমাধি দরগা ও অন্য কোথাও দেখি নাই। মঞ্চটি ২৪'x ৮', নিম্নের বেদীটি এখনও ৪/৫ ফুট উচ্চ আছে। উহা প্রাচীরে ঘেরা ছিল। দোল মঞ্চ হইলে সেরূপ প্রাচীর থাকে না। নিম্ন বেদীর উপর তাকে তাকে আরও তিনটি বেদী আছে। উহা একটি প্রাচীন কালের ছোট খাট বৌদ্ধ স্তূপ হওয়া বিচিত্র নহে। বেদীর দক্ষিণ ধারে যে সুন্দর পাকা কবর আছে, তাহাই বেহরাম সাহের কবর হইতে পারে।[২]

পীর বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ (রঃ)

পীর বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ হযরত উলুঘ খান জাহান আলী(রঃ) এর বারোজন শিষ্যের একজন। 'মুরলী কসবা হতে পীর খান জাহান আলী তাঁর অনুচর বর্গদের দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দু'টি দিকে প্রেরণ করেন। একদল রওনা হন কপোতাক্ষ নদের কুলরেখা ধরে। এ দলের নেতা ছিলেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ । তাঁর পুত্র ফতে খাঁও এ দলে ছিলেন।' এ সমন্ধে এ, এফ, এম, আবদুল জলিল বলেন, " খান জাহানের যে বাহিনী যশোর হইতে সুন্দরবনের দিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার নেতা ছিলেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ । তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নাম ফতে খাঁ। পিতা পুত্র উভয়ে ধর্মপ্রাণ ও কর্মনিপুন সৈনিক ছিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে মসজিদ নির্মাণ, জলাশয় খনন, জঙ্গল কর্তন ও ইসলাম প্রচার করিতে করিতে সুদূর সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যশোর হইতে সর্বপ্রথম তাঁহারা খান পুরে উপস্থিত হইয়া তথাকার বহু অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। খানপুর হইতে অনুচরবর্গ বিদ্যানন্দ কাটীতে আস্তানা স্থাপন করেন। এখানে তাহারা একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। সেই আমলের বহু কীর্তি মালার ধ্বংসাবশেষ এখনও এতদঞ্চলে বিদ্যমান। বিদ্যানন্দ কাটীর দীঘির দৈর্ঘ্য ১৬০০ হাত এবং প্রস্ত প্রায়৭০০ হাত।"[৩]

---

১. আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত–যশোর পরিচিতি।

২. সতীশ চন্দ্র মিত্র–যশোর খুলনার ইতিহাস।

৩. এ. এফ. এম আবদুল জলিল–সুন্দর বনের ইতহাস–পৃঃ ৩২৬।

www.pathagar.com

বিদ্যানন্দ কাটীতে বোরহান খাঁ ও ফতে খাঁ দলবল সহ মাগুরা ঘোনা, ডাঙ্গানলতা , ভায়ড়া, তালা, কপিলমুনি হয়ে শিবসা নদী অতিক্রম করে। পরে তাঁরা আমাদী গ্রামে আসে। "আমাদি প্রাচীন স্থান। এখানে বোরহান খাঁ ও ফতে খাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পিতাপুত্রে শাসন কার্যও পরিচালনা করিতেন। তখনকার দিনে সুদূর সুন্দর বন অঞ্চলে কোন সুশৃঙ্খলিত সরকার না থাকলেও খান জাহানের শিষ্যবর্গ খলিফাতাবাদ হইতে গুরুর আদেশ লইয়া বিচার কার্য ও জমি পত্তন করিতেন। কপোতাক্ষীতীরে আজিও লোকে বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁর সমাধিস্থল দেখাইয়া থাকে। বুড়ো খাঁর সমাধি নদীর স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনও টিকিয়া আছে।"[১]

এই সমাধি স্থলের নিকটেই তাঁদের গড়বেষ্টিত বসতবাড়ী ও আস্তানা ছিল। আজ সে সব ধ্বংস স্তুপে পরিনত হয়েছে। মিঃ জেমস ওয়েষ্ট ল্যান্ড বলেন, "এই স্থানে বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁ একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়াছিলেন। উহা নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে। পরবর্তীকালে উহা 'হাতি বান্ধার দীঘি', নামে পরিচিত হয়।"[২]

জানা যায়, 'আমাদী গ্রামে বুড়ো খাঁর কর্মকেন্দ্রে প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটি করিয়া একটি নয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়।' কিন্তু কালের করাল গ্রাসে এক সময় তা মাটি চাপা পড়ে।এলাকা জনশূন্য হয়ে যাওয়ার কারণে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে নতুন বসতি গড়ে উঠলে জঙ্গল পরিস্কার হয়। মাটির স্তুপ খুঁড়ে বের করা হয় মসজিদ। সেই থেকে গ্রামটির নাম হয়–মসজিদ কুড়।

মসজিদটির ভেতরের আয়তন ৪০x৪০ ফুট। দেয়ালের ভিত্তি ৭ ফুট প্রশস্ত। মসজিদটির ৪ কোণে ৪টি মিনার এবং পশ্চিম দেয়ালে ৩ টি মেহরাব আছে।

"বুড়ো খাঁ একজন ধর্ম প্রাণ ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর বিদেশে প্রবাসী হইয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিত। স্বীয় গুরুকে দর্শন মানসে তিনি মধ্যে মধ্যে বাগেরহাট যাইতেন। খান জাহানের দরবারে তাঁহার যথেষ্ঠ প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বাগেরহাট আজিও বুড়ো খাঁ নামীয় দীঘি তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। কথিত আছে যে, ঈশ্বরীপুরেও বুড়ো খাঁর আস্তানা ছিল।"[৩]

এ ছাড়া "পাইকগাছা থানার সোলায়মানপুরে বোরহান উদ্দীনের দীঘি নামেও একটি প্রকাণ্ড দীঘি আজও খননকারী বোরহান উদ্দীনের স্মৃতি বহন করছে। এখানে কয়েকখানি পুরানো পাথর খন্ড পড়ে আছে। সম্ভবত এগুলিও হযরত বুরহান উদ্দীন ওরফে বুড়া খাঁ ও তাঁর অনুসারীদের কীর্তি।"[৪]

---

১. সুন্দর বনের ইতহাস –পৃ৩২৭।

২. প্রাগুক্ত পৃঃ৩২৮।

৩. প্রাগুক্ত

৪. মুহম্মদ আবূ তালিব–খুলনা জেলায় ইসলাম–পৃঃ৯৪।

www.pathagar.com

বুড়ো খাঁ ও তাঁর পুত্র ফতে খাঁর প্রচার কেন্দ্র ছিল খান পুর, বিদ্যানন্দকাটি, সরবাবাদ ও মীর্যাপুর অঞ্চলে।

"কুড়ো খাঁ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি স্বীয় গুরু হযরত খান জাহানের প্রতিনিধি হিসাবেই গ্রাম শাসন করতেন। জানা যায়, প্রতি বৎসরই তিনি বাগেরহাট (হার্ডলী) শহরে হযরত খান জাহানের দর্শন মানসে যেতেন ও তাঁর নির্দেশ মুতাবিক শাসন কার্য পরিচালনা করতেন।

আমাদি গ্রামে তাঁর অন্দর বাড়তে চাল ধোয়া ও ডাল ধোয়া দীঘি দু'টির অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। বুড়ো খাঁ খনিত আরও একটি বড় দীঘি নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে বলে জানা যায়।"[১]

পীর মেহের উদ্দীন (রঃ)

পীর মেহের উদ্দীন হযরত খান জাহান আলী'র (রঃ) শিষ্য গণেরই একজন ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ছিল মেহেরপুর গ্রামে। এ,এফ, এম আবদুল জলিল বলেন, 'ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোপালপুরে খান জাহানের জনৈক শিষ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান। গোপালপুর হইতে দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষের কুলে মেহেরপুর গ্রামে পীর মেহের উদ্দীনের সমাধি সৌধ দৃষ্টি গোচর হয়। এই গোরস্থানের পার্শ্বে পীর সাহেবের সর্প ও হাতীর গোরস্থান আছে বলিয়া কথিত হয়। উহাও ইষ্টক নির্মিত বেদীর দ্বারা চিহ্নিত। উত্তর দিকে একটি পাকা ইন্দিরা আছে।'[২]

এ প্রসংগে সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন, "ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে....গোপালপুরে নদীর ধারে একটি সুন্দর খাঞ্জালী মসজিদ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এখানে নদীর পা'ড়ের উপর মাটি ফেলিয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। গোপালপুর হইতে দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষের কূলদিয়া অগ্রসর হইলে, মেহেরপুরে পীর মেদ্দিন বা মেহের উদ্দীনের সমাধি মন্দির দৃষ্টি পথে পতিত হয়। এই মসজিদটি খুব ছোট, বাহিরে (১৬´ x ৩´ x ১৬´ –৩´), চারকোণে চারিটি গাত্রলগ্ন মিনার, একটি মাত্র দরজা (৫´ x ২´–২´), উহার পার্শ্বে উপরিভাগে কারুকার্য করা ইষ্টক আছে। মসজিদের সম্মুখে একটি বেদী, পরে চারপাশে প্রাচীর বেষ্টিত।.....বাহিরে পীর সাহেবের সর্প ও হাতীর গোরস্থান আছে; উহাও ইষ্টকের বেদী দ্বারা চিহ্নিত। উত্তর দিকে পাকা ইন্দারা ও কূয়া আছে।"[৩]

---

১. খুলনা জেলায় ইসলাম, পৃঃ–৯৫।

২. এ. এফ. এম. আবদুল জলিল–সুন্দর বনের ইতিহাস পৃঃ৩২৬।

৩. সতীশ চন্দ্র মিত্র–যশোর খুলনার ইতিহাস– প্রথম খন্ড– পৃঃ ৩২৬।

www.pathagar.com

সম্ভবত সতীশ বাবু ভুল করে এখানে মসজিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাজারের বর্ণনদিয়েছেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব সাহেব পীর মেহের উদ্দীন সমন্ধে অন্যান্যদের মত একই কথা বলেছেন কিন্তু তাঁকে তিনি হযরত খান জাহান আলীর শিষ্য বলে মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'ত্রিমোহিনী–সন্নিকটে গোপালপুরে খান জাহানের জনৈক শিষ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। গোপালপুরের দক্ষিণে কপোতাক্ষ কূলে পীর মেহের উদ্দীন নামে জনৈক দরবেশের মাযার অবস্থিত। মাযারটি পাকা ইমারতের। তাঁর নামে কথিত একটি সাপ ও হাতীর কবর লোকে দেখিয়ে থাকে। সম্ভবত পীর মেহের উদ্দীন খান জাহানের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত নন।'[১]

উপরোক্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে তিনি হযরত খান জাহান আলী'রই একজন শিষ্য ছিলেন এবং এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তার নামানুসারেই পরবর্তীতে গ্রামটির নামকরণ করা হয় মেহেরপুর।

হযরত পীর সুজন শাহ্ (রঃ)

হযরত উলুঘ খান জাহান আলী'র (রঃ) একজন অন্যতম শিষ্য পীর সুজন্ শাহ্। সুজন শাহ্ গ্রামেই ছিলো তাঁর আস্তানা। তাঁর নামানুসারেই গ্রামটির নামকরণ হয় সুজন শাহ্। এ সমন্ধে অধ্যাপক আবূ তালিব বলেন, 'মাগুরা থেকে কপোতাক্ষ তীর বেয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলে হযরত সুজন শাহ্ সাহেবের দরগাহ্ ও মাজার নজরে আসে। এখানেও একটি বিরাট দীঘি আছে। গ্রামটি সুজন শাহের নামে পরিচিত। তাঁর আসল নাম খুব সম্ভব শুজা উদ্দীন ছিলো। লোক ব্যুৎপত্তির ফলে সুজন শাহ্ হয়েছে। যয়েন উদ্দীন নামও এভাবে হয়েছে পীর জয়ন্তী।'[২]

উপোরক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় সুজন শাহও তদীয় নেতা পীর হযরত খান জাহান আলী'র মতই সমাজ কল্যাণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন। তাঁর বিচরণের সময়টা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বলে অনুমিত হয়। তবে তিনি খান জাহান আলী'র এদেশীয় কোন শিষ্য না পশ্চিম থেকে এসেছিলেন তা জানা যায়নি।

---

১. মুহম্মদ আবূ তালিব–খুলনা জেলায় ইসলাম–পৃঃ ৯২।
২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

পীর জয়েন উদ্দীন ওরফে পীর জয়ন্তী (রঃ)

পীর জয়ন্তীর জন্ম তারিখ ও স্থানের কথা জানা যায়নি। তবে তিনি যে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন এ কথা এক বাক্যে সবাই স্বীকার করেছেন। তিনি যশোরের মাগুরা অঞ্চলের অসংখ্য হিন্দু ও অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ছিল মাগুরা গ্রামে। মাগুরা অঞ্চলে তার সুখ্যাতি কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে। বড় পীর সাহেব নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। অনেকেই মনে করেন তিনি খান জাহান আলী'র (রঃ) সাথী ছিলেন না।

অধ্যাপক আবূ তালিব পীর জয়ন্তী সমন্ধে বলেন, 'মেহের পুরের দক্ষিণে তালা থানার এলাকাধীন মাগুরা গ্রামে পীর জয়েন উদ্দীন ওরফে জয়ন্তীর মাযারকে লোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করে। ইনি হযরত খান জাহানের অনুসারীদের কেউ কিনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু ভক্তদের কল্যাণে যয়েন উদ্দীন নামটি জয়ন্তী নামে পরিচিত হয়েছে। এ-ভাবে চব্বিশ পরগনার হযরত সৈয়দ আব্বাস আলী ওরফে পীর গোরাচাঁদ ও হিন্দুর ঠাকুর গৌরাঙ্গদেব নামে চিহ্নিত হয়েছেন।'[১]

তাঁর সমন্ধে গোলাম সাকলায়েন বলেন, 'যশোহর জেলার মাগুরা নামক স্থানে পীর জয়ন্তী নামক এক নবদীক্ষিত মুসলমান বহু হিন্দু এবং অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষাদান করেছিলেন। তাঁর দরগায় এখনো আম্বুবাচীর সময়ে মেলা বসে। পীর জয়ন্তী এ অঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত 'বড় পীর সাহেব'। কেউ কেউ বলেন, ইনি হযরত খান জাহানের সাথী ছিলেন না।'[২]

হযরত মানিক পীর (রঃ)

মানিক পীর কবে কি ভাবে যশোর অঞ্চলে এসেছিলেন তা জানা যায়নি। তাঁর জন্ম ও জন্মস্থান সমন্ধেও ঐতিহাসিকগণ, কিংবদন্তী এবং জনশ্রুতি নিরব। তবে যতদুর জানা যায় তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে এ অঞ্চলে বিচরণ করেন। "মানিক পীর লোক সাহিত্যের 'জাগগানে' গৃহস্থের গরুবাছুরের রক্ষাকর্তা এবং পুঁথি সাহিত্যের 'মানিক পীরের গীত' কাব্যে (ফকির মহাম্মদ কতৃক রচিত) ব্যাধির দেবতা হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। উক্ত পুঁথির বন্দনা অংশে দেখা যায়, মানিক পীর ব্যাধিকে দমন করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে মর্তে অবতীর্ন হয়েছেন।"

---

১. মুহম্মদ আবূ তালিব-খুলনা জেলায় ইসলাম-পৃঃ ৯২।
২. গোলাম সাকলায়েন-বাংলাদেশের সুফী সাধক-পৃঃ ৭৮।

www.pathagar.com

যশোর শহর সংলগ্ন যশোর ক্যান্টনমেন্টের বিমান বন্দরে যে রানওয়েটা রয়েছে তার উত্তর প্রান্তের শেষ দিকে 'মানিক পীরের দরগাহ'। জায়গাটা মানিক তলা নামে পরিচিত। এখানে একটি মসজিদ ও দরগা আছে। জানা যায় এর কিছু দূরেই বুকভরা বাওড়ের তীরেই ছিল 'গোকুল নগর' নামে জনবসতি। আজ আর গোকুল নগরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এখনো একটি বুড়ো বটগাছ ও একটি মাটির ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়। পাশেই ছোট্ট একটি পুকুর, পুকুরটি দুধ পুকুর নামে পরিচিত। আর ঢিবিটি কানু ঘোষের ভিটে নামে পরিচিত। কানু ঘোষের ভিটেকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে যে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা থেকে সহজেই মানিক পীরকে খুঁজে পাওয়া যায়।

কিংবদন্তী হচ্ছে এই–পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কানু ঘোষ নামে এক গোয়ালা গোকুল নগর গ্রামে বাস করতেন। তিনি ছিলেন বিরাট ধনী। কোন কিছুরই তার অভাব ছিলো না। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, আর ছিলো অসংখ্য গরু। মূলতঃ গরুই ছিল তার মূল পূজি। এ সময় ব্রাহ্মণ নগরের রাজা ছিলেন মুকুট রায়। এখানে বলে রাখা ভাল যে, তৎকালীন ব্রাহ্মণ নগর ছিল আজকের 'লাউজানি'। যা এই গকুল নগর থেকে মাত্র ২$\frac{১}{২}$ মাইল দূরে। কানু ঘোষ এই মুকুট রাজার বাড়ীতে দুধ যোগানদিতেন।

মানিক পীর সাধারণতঃ আস্তানা ছেড়ে বের হতেন না। একদিন একজন সঙ্গীর কাছে জাহির হবার ইচ্ছে পোষণ করেন। এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা গোকুল নগরকে বেছেনেন। যেমন–

'দমে আয় দমে বয় দমে দস্তগীর–
দেল কেতাবে ভেবে দেখ মানিক জীন্দাপীর।
গুপ্ত মানিক উঠে বলে পীর মানিক ভাই
গোকুল নগরে চলো জাহেরেতে যায়–
সেই খানে করবো মোর জাহিরী।'

এখান থেকে জানা যায় উক্ত দু'জন ব্যক্তিই মানিক পীর নামে পরিচিত ছিলেন। একজন ছিলেন আন্ডার গ্রাউন্ড এবং অপরনজন প্রকাশ্য ঘুরা ফেরা করতেন। যাহোক পীর দু'জন রওনা হলেন। এক সময় গোকুল নগরে এসে পৌছিলেন। গোকুল নগরে এসে প্রথমেই তাঁরা কানু ঘোষের বাড়ীতে ভিক্ষে নিতে গেলেন। কথিত আছে–এ সময়ে কানু ঘোষ বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি তাঁর গরু মহিষ দেখা শোনার জন্য মাঝে মাঝেই বাইরে থাকতেন। কানু ঘোষের গরুর সংখ্যা এই ভাবে বোঝানো হয়, 'নবলক্ষধেনু তার' তার দশলক্ষ গরু।' গরু গুলো ১২ ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে বিচরণ করতো।

পীর দু'জন ফকিরের বেশে কানু ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে যখন ভিক্ষে প্রার্থনা করলেন, তখন কানুর মা বললেন–

www.pathagar.com

'কেনোর মা বুড়ী বলে নন্দ ঘোষের ঝি
সকালে এসেছে ফকির ভিক্ষে দেব কি?
সুবর্ণের বাটাতে তার চাল পয়সা লয়ে
মানিক ফকিরের কাছে পৌছালো গিয়ে।
ধর ধর ফকির সাহেব মোর ভিক্ষা লও
এই ভিক্ষা লয়ে তোমরা খুশী হয়ে যাও।'

পীর দু'জন কিন্তু ভিক্ষে নিলেন না। তারা বল্লেন–

'চাল কড়ির ফকির না মা চাল কড়ি নেব
এক ফোঁটা দুগ্ধ পেলে দোয়া করে যাব।'

এ সময় ঘোষ মশায়ের ভেতর বাড়ীতে গাই দোয়া হচ্ছিল। কিন্তু কানু ঘোষের মা দুধের কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন–

'পয়লা কার্তিক মাসে ঘোষ গিয়েছে বাতানে
ছেলেপিলে মারা গেল দই দুগ্ধ আভানে
কেবা রান্ধে কেবা ছান্দে কেবা কাটে ঘাস
দই দুগ্ধ কেমন জিনিষ দেখিনি ছয় মাস।'

কানু ঘোষের মায়ের এই ডাহা মিথ্যা কথায় মানিক পীর খুব কষ্ট পেলেন। এমনকি মুখে বললেন 'মা এ তুমি ভাল করলে না।' কিন্তু পীরের কথায় কানু ঘোষের বুড়ো মা নরম না হয়ে বরং ক্ষেপে গেলেন এবং গালিগালাজ করলেন, 'আটা গোটা ফকির বেটা জানে যাদুগীরি।' এর পর পীর আল্লার কাছে প্রার্থনা জানালেন–

'দম দম বলে মানিক ছাড়িল জিকির
উন কোটি ব্যাধি এসে হইল হাজির।
ঘরে মলো কোলের ছেলে বাথানে মলো গাই
মলো যতো কোবলে বাছুর লেখা জোখা নাই।'

মড়কের ভয়াবহ পরিণাম দেখে কানু ঘোষ আছাড়ি বিছাড়ি করতে লাগলেন।

'ছান দড়ি লয়ে কুবির জুড়িল কান্দন।'

ছুটে আসলেন বাড়ী, সেখানেও দেখলেন একি অবস্থা।

'গোকুল নগরে গিয়ে দিলো দরশন।'

একমাত্র জীবিত মায়ের নিকট থেকে সব ঘটনা শুনে কানু ঘোষ পীরদ্বয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং পীরের কাছে এসে ক্ষমা চাইলেন–

'আগে যদি জানতাম আমি তুমি মানিক পীর
আগে দিতাম দই দুগ্ধ পরে দিতাম ক্ষীর।'

এ প্রসংগে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, কানু ঘোষের কান্নাকাটিতে মানিক পীর বললেন, যা বাড়ী ফিরে যা। বাড়ী গিয়ে দেখতে পাবি বাড়ীতে একটি গাভী বেঁচে আছে। কিছু দিনের মধ্যে এর একটা এঁড়ে বাছুর হবে। খবরদার এই গাভীর দুধ তোরা খাবিনে। এ বাছুরটি একটি শক্তিশালী ষাড়ে পরিণত হবে। এরপর একদিন

www.pathagar.com

পূর্ণিমার রাতে দেখবি বুক ভরার বাওড় থেকে অন্য একটি ষাড় উঠে আসবে এবং এর সাথে লড়াই করবে। যদি গাভীটির দুধ তোরা কোন দিনও না খাস তো তোর এঁড়েটি জিতে যাবে। আর যদি দুধ খাস তো তোর এঁড়েটি নির্ঘাত হারবে। জিতলে তুই তোর পূর্ব সম্পদ ফিরে পাবি। কথিত আছে কানু ঘোষের মা কানু ঘোষকে ফাঁকি দিয়ে গাভীটির কিছু দুধ দোহন করতো। ফলে নির্দিষ্ট পূর্ণিমার রাতে ষাড় দু'টির ভেতর লড়াই হলেও কানু ঘোষের ষাড়টি হেরে যায়। ষাড়টির হেরে যাওয়া দেখে কানু ঘোষ বুক ভরার বাওড়ের শীতল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের জ্বালা জুড়োই।

মানিক পীরকে রোগ নিরাময়ের পীর হিসেবেও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–

'মাথায় রঙ্গিন টুপি ব্যেধের জাম্বিল
হাতে লয়ে আসা বাড়ী ফেরে মানিক পীর।'[১]

ডাঃ হক বলেছেন,'মানিক পীরের উদ্দেশ্যে গ্রাম বাসীরা দুধ ও ফল ফলারী ভোগ দিয়ে থাকে। তাঁর মতে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে মানিক পীরের প্রভাব আছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু বলেছেন, খুলনা, চব্বিশ পরগনা, হুগলী ও নদীয়া জেলায় মানিক পীরের থান বা দরগাহ আছে। হরিণ ঘাটায় কাঠডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বছর ১লা মাঘ মানিক পীরের উরস উৎসব হয়।' ২

হযরত মানিক পীর সমন্ধে এত টুকুই জানা যায়। আগে অবশ্য যশোরাঞ্চলে 'কানু ঘোষের পালা' প্রচলিত ছিল। বর্তমানে তাও লোপ পেয়েছে। কানু ঘোষের পালা থেকে মানিক পীর সমন্ধে আনেক কিছুই জানা যেত।

হযরত শাহ্ বুলু দেওয়ান (রঃ)

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার ধোপাদি গ্রামে আনুমানিক ষোল'শো শতাব্দীতে জন্ম। শিশু কালে পিতৃহারা হন। পিতৃহারা বুলু দেওয়ান মায়ের সাথে মামার বাড়ী হাজরা খানা গ্রামে আশ্রয় নেন এবং তিলে তিলে বেড়ে ওঠেন। মামার বাড়ীতে তাঁর কাজ ছিল মামার গরু ছাগল চরাণ। এই গরু ছাগল চরাতে চরাতে এক সময় তাঁর ভেতর আধ্যাত্মিক চেতনার আত্ম প্রকাশ ঘটে। এ সমন্ধে এ এলাকায় বিস্তর জনশ্রুতি আছে। আরো জনশ্রুতি আছে তাঁর নানা ধরনের কেরামতির। তাঁর নামে ধোপাদি, হাজরা খানা, বেলে মাঠ, কলকাতা শহর ও নদীয়া শহরে থান আছে।

হাজরা খানা গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত। এই মাজার কে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ মঙ্গল বার ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয়, যা যশোরের আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

---

১. বাংলার লৌকিক দেবতা–পৃঃ ১৭৩।
২. ডঃ হক বাংলার লোক সংস্কৃতি–পৃঃ৩২২)

www.pathagar.com

এ সমন্ধে হোসেন উদ্দীন হোসেন তাঁর যশোর জেলার কিংবদন্তী গ্রন্থের-২য় পর্বের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"যশোর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত কপোতাক্ষী নদীর তীরবর্তী চৌগাছার উত্তরে হাজরাখানা গ্রামে এই পাগলের রওজা শরীফ বিদ্যমান। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ মঙ্গলবারে রওজা শরীফকে কেন্দ্র করে মেলা হয়। বহু দূর দূরান্তর থেকে অসংখ্য লোক এসে দর্শন করে যায় এই তীর্থ কেন্দ্র। এমন জমজমাট মেলা এতদাঞ্চলে আর দেখা যায় না।"

বর্তমানে চৌগাছা-মহেশপুর সড়কের পাশেই 'হযরত বুলু দেওয়ান দাখিলী মাদ্রাসা' চলছে। তাছাড়া উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কপোতাক্ষ নদের তীরের মাজার সংলগ্ন একটি হুজরা খানা তৈরী করে দেওয়া হয়েছে।

জনাব হোসেন উদ্দীন তাঁর-'যশোর জেলার কিংবদন্তী' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে-তাঁকে পাগল হিসাবে আমাদের সামনে এনেছেন। তিনি বুলু দেওয়ানের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে লিখেছেন, 'একবার ভাদ্র মাস। মাঠে মাঠে সোনার ধান ফলেছে। পাকা পাকা ধান যেন সোনার গুচ্ছ। দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বিধাতা যেন সারা মাঠে অজস্র সোনা ঢেলে দিয়েছে। সেই ধান দেখে কৃষকের মনে আনন্দ আর ধরে না। সারা বছরের পরিশ্রমের লব্ধ ফল আর কয়েকদিন পরে ঘরে উঠে আসবে।

পাগল মাঠে গরু চরাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গরুগুলি আপন মনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। একটা গাছের ছায়ায় বসে অন্যান্য রাখালদের সংগে পাগলামী করে তিনি সময় কাটাচ্ছিলেন। গরুগুলি ঘাস খেতে খেতে একজন কৃষকের ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়লো। পাকা পাকা ধান ডলে মলে খেয়ে একাকার করতে লাগলো। পাগলের সেদিক কোন খেয়ালই ছিলো না।

হঠাৎ তিনি কি মনে করে তাকিয়ে দেখলেন একটাও গরু নেই। অন্যান্য রাখালদের গরু সব চরে বেড়াচ্ছে। অথচ তার গরু নেই। তিনি খোঁজ করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুদূর এসেই লক্ষ্য করলেন একটা ধানের ক্ষেতে গরুগুলি সব ঢুকে পড়েছে। একজন কৃষক তাই দেখে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তিরস্কার দিতে দিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাগল আবোল তাবোল বলতে বলতে ছুটতে লাগলেন সেদিকে। ওগো-দাঁড়াও, দাঁড়াও-

কৃষক বোল চাল দিতে দিতে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গরুগুলি নিয়ে হাঁটতে লাগলো গ্রামের দিকে। পাগলের দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। গরুতে তার ক্ষেতের ফসল ভয়ানক ক্ষতি করেছে। কি সুন্দর ফসল ফলেছিলো! তাই গরু দিয়ে খাইয়ে দিয়েছে এই পাগল। হাতের কাছে এলেই হয়। কি করে পাগলামী ছুটিয়ে দিতে হয়, তা বেশ ভালোই জানা আছে তার। পাগল হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে লাগলেন। তিনি যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলেন, ততই কৃষকের শরীর জ্বলছিলো আগুনের মত হু হু করে। কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করতে পারছিলো না।

www.pathagar.com

পাগল ছুটছেন আর বলেছেন, ওগো–দাঁড়াও–দাঁড়াও–

কাছে আসতেই রুখে দাঁড়ালো কৃষক।

ভাগ, ভাগ, গরুর কাছে আসবি তো ঠেঙিয়েই–

পাগল অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন।

এবারকার মত ছেড়ে দাও ভাই, আর কোনদিন যাবে না।

গরুর সামনে গিয়ে বাঁধা দিতে লাগলেন পাগল।

কৃষকের মাথায় তখন টগবগ করে আগুন জ্বলছে। সে কিছুতেই গরু ফিরিয়ে দেবে না। ফাঁড়িতে না দেওয়া পর্যন্ত তার বুকের আগুন নিভবে না। এক মাঠ আবাদ নষ্ট করেছে গরুর পাল। সেই গরু সে কি করে ফেরত দেবে?

গরুগুলি ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো কৃষক।

তখনকার আমলে মানুষেরা সরকারের আইন কানুনকে যমের মত ভয় করতো। কেউ আইন লংঘন করতে বিশেষ সাহস করতো না। কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করলে সরকার কঠিন ভাবে বিচার করতেন। শাসন ব্যবস্থা ছিলো মজবুত। মানুষ যতটুকু পারতো অন্যায়কে পরিহার করে চলবার চেষ্টা করতো। বিশেষ করে গ্রাম দেশের মানুষের অবিচল আস্থা ছিল আইনের উপর।

বার বার অনুনয় বিনয় সত্বেও যখন গরুগুলি মোটেও ফেরৎ পাওয়া গেলনা, পাগল তখন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাড়ীতে গিয়ে গৃহস্থকে কি কৈফিয়ত দেবেন? একটা দুটো গরু নয়– বিশ–তিরিশটি গরু। এতোগুলি গরু খোয়াড়ে গেলে গৃহস্থের সাধ্যে কুলোবে না ছাড়িয়ে নেবার। এ সবই তার নিজের গাফলতির জন্যে হয়েছে। তিনি যদি একটু গরুগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন, তা হলে তো এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

গরুর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন পাগল।

একটা বট গাছের তলায় এসে কি মনে করে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। কৃষকটি তখন হৈ হৈ করে গরু গুলি খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জোরে জোরে চেঁচাতে লাগলেন পাগল, হেই, হেই, তা হলে তুই গরুগুলি দিলিনে? আচ্ছা, তবে তুই নিয়ে যা, দেখি কেমন করে নিয়ে যেতে পারিস? হেই গরু, তোরা সব পাখী হয়ে উড়ে যা– উড়ে যা! বিড় বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণের মত আবোল তাবোল বকতে লাগলেন পাগল। তাই দেখে মনে মনে হেসে আর বাঁচে না কৃষক। পাগল কি আর লোকে সাধে বলে? পাগলামী করেই তো সারা জীবন কেটে গেলো তোর, বেশী যদি আবোল তাবোল বকিস, মেরে ভূত বানিয়ে দেবো।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখনও জোরে জোরে চিল্লাচ্ছেন পাগল,–যা, যা, সব ভেগে যা–বক হয়ে যা–উড়ে যা–উড়ে যা।–কৃষক গরু তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। পাগলের দিকে ভ্রুক্ষেপও করলো না। কিছুদূর আসতেই আর কিছুই দেখতে পেলো না কৃষক। চোখের সামনে থেকে এক একটা গরু উধাও হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে নিজেই বুঝতে পারলো না। শুধু দেখতে পেলো পেঁজা তুলোর মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে

www.pathagar.com

গরুগুলো।

এক সময় গরুগুলো দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো কৃষকের।

এদিকে গ্রামে গৃহস্থের কানেও খবরটা গিয়ে পৌঁছলো।–দেখো, তোমার গরুগুলো সব খোয়াড়ে চলে গেছে।

খবরটা শুনে তাজ্জব হয়ে যায় গৃহস্থ। কেন?

ক্ষেতের আবাদ বরবাদ করে দিয়েছে, তাই ধরে নিয়ে গেলো।

কেন, সংগে যে দেওয়ান রয়েছে?

রেখে দাও তোমার পাগল–ছাগলের কথা। লোক তো আর খুঁজে পাও না! যত পাগল নিয়ে তোমার কাজ কারবার। সে বেটা কি মাঠে গিয়ে তোমার গরু দেখে? ছেলে–ছোকরাদের সংগে পাগলামী করেই কাটায়।

খবরটা শুনেই মাটিতে বসে পড়ে গৃহস্থ। যেন তার গালে মাছি পড়েছে।

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে গৃহস্থ। খোয়াড়ে এসে কিছুই দেখতে পেলো না। একটা গরুও নেই। সেখান থেকে ফিরে আসতেই পথিমধ্যে দেখা হয়ে গেলো পাগলের সাথে। পাগলামী করতে করতে বাড়ীর দিকে চলেছেন। কি যেন আবোল তাবোল বকছেন! ওর সাথে গরু নেই।

গৃহস্থকে দেখতে পেয়েই চেঁচাতে লাগলেন পাগল।–সর্বনাশ হয়ে গেছে! ও পাড়ার আবেদ মুন্‌শী গরুগুলো খোয়াড়ে নিয়ে গেছে।

কেন?

ওর নাকি ধান খেয়েছে।

তুই কি করছিলি?

আমি গাছ তলায় বসে ছিলাম। গরুগুলি কখন ক্ষেতে নেমেছে দেখতে পাইনি।

তা দেখবি কেন? যেখান থেকে পারিস, গরুগুলো নিয়ে আয়–

গৃহস্থ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

পাগল মাথা নীচু করে অপরাধীর মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

গৃহস্থ আবার গ্রামের দিকে ছুটলো। কিছুদূর আসতেই দেখা হয়ে গেলো আবেদ মুন্‌শীর সাথে আবেদ মুন্‌শী গৃহস্থকে দেখে অভিযোগ করলো, দেখো, তোমার গরু ফসলের ক্ষেতে গিয়ে আমার কি সর্বনাশ করেছে।

গৃহস্থ অপরাধীর মত অনুনয় বিনয় করতে লাগলো।

তা এবারকার মত মাফ করে দাও, আর ভবিষ্যতে হবে না। আমার গরুগুলো ফিরিয়ে দাও মুন্‌শী ভাই, গুনাগারি লাগিও না।

কেন, তোমার গরুগুলো পাওনি?

কোথায় পাবো ভাই, তুমি নাকি খোয়াড়ে নিয়ে গিয়েছো?

নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নিয়ে যাইনি।

রেখেছো কোথায়?

www.pathagar.com

পাগল গরুগুলোকে ও ক করে ডাক দিতেই, কোথায় কোন দিকে যে ছুটে পালালো, বুঝতে পারলাম পাগলের কাছে জিজ্ঞেস করো, সে–

সে যে বললো, তুমি ে ড়ে নিয়ে গেছো?

বললাম তো, পাগলের ক শুনে সব ক'টা গরু পালিয়ে গেলো। তা খোয়াড়ে নিয়ে যাবো কি করে? দে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। এখন তোমার সাথে একটু পাগলামী করছে।

পাগল তখনো সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

গৃহস্থ এসে রাগ ঝাড়তে লাগলেন। বল, গরু কি করেছিস, বল?

আবেদ মুন্শী খোয়াড়ে নিয়ে গেছে, সেখানে খোঁজ করো।

সে যে বললো, নিয়ে যাইনি। তোর ডাক শুনে নাকি গরুগুলো দৌড় মেরেছে?

পাগল প্রলাপ বকতে লাগলেন।

বললেই হলো, গরুগুলো দৌড় মেরেছে?

মুন্শী মিথ্যা কথা বলবে কেন?

তা আমি কি করে বলব?

দেখ, আমি অতশত বুঝিনে, তুই আমার গরু চরাতে নিয়ে এসেছিস, যেখান থেকে পারিস, গরুগুলো নিয়ে আয়।

ক্ষিপ্ত বাঘের মত গর্জন করতে লাগলো গৃহস্থ।

যদি ভালো চাস, গরুগুলো নিয়ে আয়।

পাগল আবার প্রলাপ বকতে লাগলেন, তা হলে এক কাজ করো, তুমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে গরুগুলোর নাম ধরে ডাক দাও–

কেন, তুই ডাক দে–

আমি ডাক দিলে হবে না। তুমি ডাক দাও। বলো, ও কালা গাই, চলে আয়, বলো, ও ধলা গাই, চলে আয়–এ রকম এক এক করে নাম ধরে ডাকো–

সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো। একটু পরেই সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাবে। দিগন্ত রেখা ঘিরে এক কালো আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে সমগ্র পৃথিবী। গোধূলি লগ্নে রাখালেরা গরুগুলো ঘরে নিয়ে চলেছে। গরুর ক্ষুরের আঘাতে ধূলি উড়ছে। সকলের গরু ফিরে যাচ্ছে ঘরে, কেবল একজনের গরু ফিরে যাচ্ছে না। এক অব্যক্ত বেদনায় গৃহস্থ ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

পাগল বার বার তাগাদা দিতে লাগলেন, ডাক দাও–বলো, ও কালা গাই, ও ধলা গাই, চলে আয়–চলে আয়। নাম ধরে সবাইকে ডাকো–

গৃহস্থ কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্মোহিত হয়ে গেলেন। যাদুমন্ত্রের মত তার শরীরের সমস্ত উত্তেজনা কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো।

সে করুণ কণ্ঠে উচ্চ স্বরে ডাকতে লাগলো, ও কালা গাই, চলে আয়–

একবার, দু'বার, তিনবার ডাকতেই বট গাছের আগডাল থেকে বকের রূপ ধরে

www.pathagar.com

কালা গাই উড়ে এসে মাটিতে পড়লো।

গৃহস্থ তাকিয়ে দেখলো, তার সামনে দাঁড়িয়ে আ নয়- কালা গাই।

আবার মন্ত্রমুগ্ধের মতন এক এক করে গরুর না ডাকতে লাগলো গৃহস্থ।

যতবার ডাকলো, ততবার বকের রূপ ধরে গ পাতার আড়াল থেকে উড়ে মাটিতে নেমে আসতে লাগলো গরুগুলো।

পাগলের কেরামতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো গৃহস্থ। এ কি দেখছে সে? সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হলো গৃহস্থের। এমন অলৌকিক কান্ড যে ঘটতে পারে, তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। যাকে সে এতকাল পাগল বলে মনে করে এসেছে, সে তা পাগল নয়-একজন অলৌকিক পুরুষ।

শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে পাগলের পদতলে লুটিয়ে পড়লো গৃহস্থ।

সেদিন থেকেই রাখালীর কাজে ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন পাগল।

একবার এক গ্রামের মধ্য দিয়ে পাগল কোথায় যেন যাচ্ছিলেন।

একজন কৃষক এসে পাগলের কাছে জানালো, দেওয়ান, আমার একটা প্রার্থনা আছে।

পাগল শুধালেন, বলো, কি তোমার প্রার্থনা?

আমি সাধ করে দুটি কাঁঠাল গাছ লাগিয়েছি। গাছও বড় হয়েছে, অথচ তাতে একটা কাঁঠালও ধরে না।

এ তো দেখছি মুশকিলের ব্যাপার। বলো, কি করতে হবে আমাকে?

আপনি একটু তদ্বির করে দিলে ভালো হয়। যদি আপনার কৃপায় কাঁঠাল ধরে, তাহলে আপনার নামে দু' গাছ থেকে চারটি কাঁঠাল দেবো।

পাগল বললেন, আচ্ছা, তাই হোক।

সেবার দেখা গেলো সত্যি সত্যিই দুটি কাঁঠাল গাছে চারটি বড় বড় কাঁঠাল ধরেছে। কৃষকের আনন্দ আর ধরে না। সে খুশী হয়ে একটি গাছ থেকে দুটি কাঁঠাল এবং অপর গাছটি থেকে একটি কাঁঠাল দুভাগ করে পাগলের আস্তানায় নিয়ে চললো।

পাগলে দেখে শুধালেন, তুমি যে কাঁঠাল দুভাগ করে নিয়ে এলে? আর কোথায়?

আর আনতে পারিনি দেওয়ান।

তুমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, রক্ষা করতে পারোনি। তোমার নিজেরই ক্ষতি হলো। যে গাছ থেকে একটি কাঁঠাল এনেছো-যেটা দুভাগ করে নিয়ে এসেছ-ওই গাছের কাঁঠাল অর্ধেক পাকবে, আর অর্ধেক থাকবে কাঁচা।

নির্বোধের মত বাড়ী চলে গেলো কৃষক।

তারপর থেকে দেখা যেতো ওই গাছে প্রতি বছর যে কাঁঠাল ধরতো, সেই কাঁঠালের একাংশ মৌসুমের সময় পাকতো, আর এক পাশের অংশ থাকতো কাঁচা।'

www.pathagar.com

সরদার চাঁদ খাঁ (রঃ)

বৃহত্তর যশোর জেলার একটি প্রাচীন থানা শহর কৌটচাদপুর। কপোতাক্ষ বিধৌত ছোট মনোরম শহরটি ১৫৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সরদার চাঁদ খাঁ। সরদার চাঁদ খাঁ ছিলেন একজন কামেল ব্যক্তি। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সুদূর পশ্চিমের কোন দেশ থেকে আসেন এবং বর্তমানে কোটচাঁদপুরে আস্তানা গাড়েন। সরদার চাঁদ খাঁর নামেই জনপদটির নামকরণ করা হয় চাঁদপুর। পরে এখানে কোর্ট স্থাপিত হলে স্থানটির নামকরণ করা হয় কোর্টচাঁদপুর। ১৮৮৩ সালে এটি পৌরসভার মর্যাদা পায়। কামেলে দ্বীন হযরত চাঁদ খাঁর অধঃস্তন ৭ম পুরুষ হলেন–মরহুম কবি সামসুদ্দীন আহমদ (১৯১০–১৯৮৫)

১৬৫৬ সালে এই বোজর্গ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বর্তমান কৌটচাদ পুর বাজারের পশ্চিম দিকে রূপালী ব্যাংকের সমানে যে বাধাঁনো কবরটি দেখা যায় এটাই সরদার চাঁদখাঁর সমাধি।

ম ওলানা সুফী মুহাম্মদ আরব (রঃ)

সুফী মুহাম্মদ আরবের জন্ম তারিখ ও স্থান জানা যায় নি। তিনি শাহ্ মুহাম্মদ আরিফ–ই–রব্বানী ওরফে আরব শাহ্ নামেও পরিচিত। হোসেন শাহী আমলে সুলতান নসরত শাহ শৈলকূপাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি আজো কালের সাক্ষী হিসাবে টিকে আছে। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচারের জন্য ম ওলানা আরবকে নসরত শাহ এখানে নিয়োগ করেন। ম ওলানা আরব এখানেই বসতি স্থাপন করেন। এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। জানা যায় ম ওলানা আরব ও তাঁর সহযোগী আবদুল হাকিম খান ও সৈয়দ শাহ আবদুল কাদির বোগদাদীর হাতে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত শাহ সুফী সুলতান আহমদ (রঃ)

মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে এই বোজর্গাণে দ্বীন যশোর আগমন করেন। যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি যশোর অঞ্চলে ইসলামের আবাদ করার জন্য থেকে যান। জানা যায়, "চাঁচড়ার রাজা শুকদেব সিংহ রায় তাঁর বসবাসের জন্য রাজবাড়ীর খীড়কীর দিকে বেশ কিছু লাখে রাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। খিড়কী

www.pathagar.com

এলাকা পরে খড়কী এলাকায় পরিণত হয়।"[১] এই পরিবারের শ্রেষ্ঠ সন্তান মাওলানা শাহ মুহম্মদ আবদুল করীম।

হযরত পীর জল্লু জালাল শাহ (রঃ)

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার অন্তর্গত ঘোড়াদহ গ্রামে পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত গাঙণীর খালের তীরে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন হযরত পীর জল্লু জালাল শাহ (রঃ)। এখানে ছোট একটি দরগাহ আছে। যেখানে পথিক থমকে দাঁড়ায়, দু' রাকাত নামায আদায়ের মানষে। আল্লার কাছে প্রার্থনা জানায় পীর সাহেবের মাগফেরাতের।

এ সম্বন্ধে হোসেন উদ্দীন হোসেন বলেন, "গ্রামের নাম ঘোড়াদহ। পুরাকালে সম্পূর্ণ গ্রামটি ঘোড়াকৃতি দহের মত ছিল বলে এর নাম ঘোড়াদহ। এর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে একটি খাল। সবাই বলে গাঙণীর খাল। কেহ কেহ বলে নিদয়ার খাল। এই খালের তীরে ঘোড়াদহের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন পীর জল্লু জালাল শাহ। পীর সাহেবের পায়ের কাছে শুয়ে আছেন তাঁরই অনুগত পুত্র সিরাজ দেওয়ান। পিতা-পুত্র একই মাটিতে অনন্ত ঘুমের গভীরে ডুবে আছেন। তাঁদের দু'জনের কবরের পাশে শীতল ছায়া ফেলে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে একটি আম গাছ। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে এই গাছটি সতর্ক প্রহরীর মত কবরগাহ পাহারা দিয়ে চলেছে।"[২]

পীর জল্লু জালাল শাহ সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাহল এই-ষোল শ' শতাব্দীর দিকে 'যশোর জেলার শেখপাড়া রহিতা গ্রামের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহ্য সূত্রে তিনি সাধারণ ঘরের লোক ছিলেন না। সেই আমলে ছিল তাঁদের মস্তবড় জমিদারী। পীর জল্লু জালাল শাহের এসব বৈষয়িক সম্পত্তির প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। আল্লার রাহে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন খোদা প্রেমিক।'[৩]

জানা যায়, যৌবনে তিনি সংসারী হন। কিন্তু সংসার জীবনের নানাবিধ যন্ত্রণা তাকে পুনরায় সংসার বিরাগী করে তোলে। পরবর্তীতে তিনি নির্জন স্থানে আল্লার ধ্যানে রত হন। কথিত আছে, এক পর্যায়ে তিনি কামেলিয়াত হাসিল করেন এবং ঘোড়াদহ গ্রামের গাঙণী খালের তীরে আস্তানা গাড়েন। এখান থেকেই তিনি এতদাঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন।

পীর জল্লু জালাল শাহের নামে এ অঞ্চলে প্রচুর অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। মশহুর কাহিনীটি হল- পার্শ্ববর্তী 'কায়েমকোলা' গ্রামে চান্দর মোল্লা নামে এক যাদুকর বাস করতো। পীর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা চান্দর মোল্লাও

১. আসাদুজ্জামান আসাদ-যশোর পরিচিতি, পৃঃ-১৪২
২. হোসেন উদ্দীন হোসেন-যশোর জেলার কিংবদন্তী, পৃঃ ৮৮।
৩ প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৯।

www.pathagar.com

জানতো। কিন্তু চান্দর মোল্লা পীর সাহেবের অলৌলিক ক্ষমতাকে নিজের যাদুর ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতো এবং ফাঁক খুঁজতো পীর সাহেবকে খাটো করবার জন্য।

একদিন চান্দর মোল্লা ফাঁক পেয়েও গেল। চান্দর মোল্লা মাঠে কাজ করার সময় দেখতে পেলো পীর সাহেব মেঠো পথ ধরে কোথায় যেন যাচ্ছেন। পীর সাহেব হাটতে হাটতে মোল্লা সাহেবের নিকট দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন মোল্লা পীর সাহেবকে বসার জন্য অনুরোধ জানালেন। পীর সাহেব বসলেন। এক সময় সুযোগ বুঝে মোল্লা পীর সাহেবকে তামাক খাবার আহবান জানালেন। পীর সাহেবও রাজি হলেন। কিন্তু গোল বাঁধলো আগুন নিয়ে–কারণ যাদুকর চান্দর মোল্লা আগুন ছাড়াই পীর সাহেবকে ডেকেছিলেন। চান্দর মোল্লা তাই হেসে বললেন, আগুন নেই তাতে হয়েছে কি? তারপর নিকটস্থ কিছু পল জোগাড় করে পীর সাহেবকে টেক্কা দেয়ার জন্যে তাতে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাল।

পীর সাহেব সব বুঝলেন। চান্দর মোল্লাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চান্দর ভাল করলিনে। বাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখ এ আগুনে তোর সব পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।'

বাড়ী পুড়ার কথা শুনে মোল্লা গ্রামের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো। দেখলো তার ঘরের উপর আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। চান্দর মোল্লা এবার হায়! হায়! করতে করতে বাড়ীর দিকে দৌড় দিল।

হযরত পীর সিরাজ দেওয়ান (রঃ)

সিরাজ দেওয়ান ষোল শ' শতাব্দীর শেষ দিকে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ঘোড়াদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত পীর জল্লু জালাল শাহ (রঃ)। সিরাজ দেওয়ান একজন আল্লাহ ওয়ালা লোক ছিলেন। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি পিতার কাছ থেকে পীরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাদের পিতা–পুত্রের নামে এ অঞ্চলে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। 'এদেশে তাঁর অসংখ্য ভক্তের দল আজো দেখা যায়। খড়কীর বিখ্যাত পীর সাহেব জল্লু জালাল শাহের প্রধান শিষ্য ছিলেন।' সিরাজ দেওয়ানের ঔরসে দু'টি সন্তান হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

তাঁদের পিতা–পুত্রের নামে যে অলৌকিক ঘটনার কথা ছড়িয়ে আছে, 'যশোর জেলার কিংবদন্তী' গ্রন্থে জনাব হোসেন উদ্দীন হোসেন তার দু'–একটি তুলে ধরেছেন। আমরা হুবহু তা তুলে দিলাম–ঘোড়াদহের নিকট আজও একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামটির নাম হালসা। এই হালসা গ্রামে মার্জন বিশ্বাস নামক জনৈক গ্রাম্য ধনী লোক বাস করতেন। তার অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল। ছিল প্রচুর অর্থ। বহুকাল যাবৎ তিনি কঠিন এক পীড়ায় ভুগছিলেন। রোগ মুক্তি পাবার জন্যে দেশ–বিদেশের অনেক স্বনামধন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। অবশেষে

www.pathagar.com

একদিন মনের দুঃখে চল্লিশটি টাকা হাতে করে পীর গল্লু জালাল শাহের দরবারে এসে হাজির হলেন। পীর সাহেব তার আগমনের হেতু বুঝতে পেরে বললেন, মার্জন, তুই ঘরে ফিরে যা। তোর কঠিন ব্যাধি নিরাময় হবার নয়। এ তোর কাল ব্যাধি।

মার্জন তবুও নাছোড় বান্দা। পীর সাহেবের হাতে-পায়ে ধরতে লাগলেন। বললেন, এই চল্লিশ টাকা হাতে নিয়ে এসেছি হুজুর। আপনি আমায় আরোগ্য করে দিন।

পীর সাহেব বললেন, তা সম্ভব নয় মার্জন। তুমি টাকা কয়টি ফেরত নিয়ে গিয়ে তোমার সংসারের কাজে ব্যয় করো।

মার্জন তবুও পীর সাহেবকে টাকা কয়টি নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পীর সাহেব তার ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হলেন। অবশেষে নিরাশ হয়ে মার্জন গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল সিরাজ দেওয়ানের সংগে। সিরাজ দেওয়ান মার্জনের বিষাদক্লিষ্ট মুখের ছবি দেখে সুধালেন, এ বেশে কোথায় গিয়েছিলেন? বড় মলীন মনে হচ্ছে যে-

মার্জনের অবস্থা তখন আরো করুণ। সিরাজ দেওয়ানের কথা শুনে সে কেঁদে ফেললেন। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, দেওয়ান সাহেব আমার অবস্থার কথা কি বলবো, গিয়েছিলাম হুজুরের কাছে, হুজুর আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আজ দীর্ঘদিন রোগে বড় কষ্ট পাচ্ছি।

আপনার হাতের মুঠোয় কি?

হাতে চল্লিশটি টাকা। হুজুরকে নজরানা দিতে গিয়েছিলাম। তিনি ফিরিয়ে দিলেন। সিরাজ দেওয়ান মুহূর্তেই কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, টাকা কয়টি আমাকে দিন ত। আপনার হয়ে হুজুরের কাছে আমি আর্জী করব।

মার্জন অত্যন্ত খুশী হলেন। টাকাগুলি সিরাজ দেওয়ানের হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। টাকাগুলি হাতে করে সিরাজ দেওয়ান বাড়ীতে পা দিতেই পীর সাহেব ভয়ানক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। রুষ্ট হয়ে বললেন, সিরাজ, তুই করেছিস কি? ও টাকা ফেরত দিয়ে আয়।

সিরাজ দেওয়ান বললেন, তা হয় না। যে টাকা আমি নিয়ে এসেছি সে টাকা কেমন করে ফেরত দেব? এ টাকা আমার কাছেই গচ্ছিত থাক।

তা হয় নারে হতভাগা। তুই এমন কাজ করিসনে। তুই দেখতে পাবি, দুই একদিনের মধ্যে মার্জন ইন্তেকাল করেছে। এ টাকা তোর হেফাজতে থাকলে, মার্জনের মৃত্যুর কাফফারা তোকে দিতে হবে।

সিরাজ দেওয়ান পীর সাহেবের কথা শুনে মনোক্ষুণ্ন হলেন। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে টাকাগুলি ফেরত দিয়ে এলেন মার্জন বিশ্বাসকে।

ঘটনার তিনদিন পরের কথা। সিরাজ দেওয়ান গাঙণীর চরের উপর বসে কি একটি কাজ করছিলেন । ভোরের রোদ তখন সবে মাত্র উঠেছে। পীর সাহেব এই সময় হজরা খানায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। সারা রাত তিনি কাটিয়ে দেন এখানে। কিন্তু

www.pathagar.com

সেদিন ভোরের সূর্য উঠতে না উঠতেই তলব করলেন সিরাজ দেওয়ানকে। সিরাজ কাছে আসলে স্নেহ ভরা কণ্ঠে বললেন, আজ মার্জনের মৃত্যুর দিন। ওকে যদি দেখতে চাস তো এখন চলে যা।

সিরাজ দেওয়ান পিতার কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। কোন উদ্বেগ প্রকাশ না করে তিনি ছুটে চললেন হালসা গ্রামের দিকে। মার্জনের বাড়ীর কাছে পৌছতেই তিনি শুনতে পেলেন শোকের আহাজারী। সারা বাড়ী জুড়ে মরাকান্নার রোল বিলম্বিত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সিরাজ দেওয়ান অবস্থা দৃষ্টে সেখানে আর দাঁড়ালেন না। বাড়ীর দিকে ফিরে চললেন।

একবার সিরাজ দেওয়ান গাঙণীর খালের পাড়ে বসে বসে কি যেন ভাবছিলেন। তখন অপরাহ্ন কাল। এই সময় সাধারণতঃ পল্লী গ্রামের মেয়েরা কলস কাঁখে করে খালে পানি নিতে আসে। সিরাজ দেওয়ানকে এই ভাবে বসে থাকতে দেখে তারা শরমে মরিমরি হয়ে গেল। কেউ কেউ হাসতে হাসতে সরে গেল ঘাট থেকে। সিরাজ দেওয়ান মেয়েদের এই রহস্যময় হাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন কারণ বুঝতে পারলেন না। অবশেষে তিনি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করে লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে গেলেন। একি অসংযত অবস্থায় বসে আছেন তিনি। পরিধানের কৌপীন অসংবৃত হয়ে গেছে। শরীরের বিশেষ একটি অঙ্গ নিরাবরণ দেখে মাথা হেঁট ক[illegible] [illegible]ঠে পড়লেন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন। একি করেছেন তিনি। মেয়েদের সামনে কি করেই বা তিনি মুখ দেখাবেন। ভেবে কিছুই কূল কিনারা করতে পারলেন না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে নিজের প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ করে গাঙের নির্জন পাড়ে একটি মাদার গাছের তলায় এসে উপস্থিত হলেন। কোন ভাবনা-চিন্তা না করেই উত্তেজনায় নিজের হাতের রামদা দিয়ে এক কোপে কেটে ফেললেন গুপ্তাঙ্গ।

খবরটা যথা সময়ে পীর সাহেবের কানে গিয়ে পৌঁছলো। পীর সাহেব ছুটে এলেন হায় হায় করে। হাজার হোক নিজের সন্তান। গাছতলায় এসে দেখলেন, সিরাজ দেওয়ান যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করছেন। এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না পীর জল্লু জালাল শাহ। তিনি তিরস্কার করে বললেন, তোর কেন এই মতিভ্রম হলো? এখনো যে তোর ঔরসে দু'টি সন্তান হবে।

সিরাজ দেওয়ান কোন উত্তর দিতে পারলেন না। পিতার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

পীর সাহেব তাকে আরোগ্যের জন্য ব্যবস্থা পত্র দিলেন। সেই ব্যবস্থা পত্রের ফলে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠলেন দেওয়ান। বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনার পরেও সিরাজ দেওয়ানের ঔরসে আরো দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এমনি অজস্র কাহিনী তাঁদের পিতা-পুত্রের নামে এ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যা বংশ পরম্পরায় শ্রুত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

'এই ঘোড়াদহের পীর বংশের সাবেকী শ্রী আজ বিলুপ্ত, দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে তারা জর্জরিত। যারা একদিন আলোর বৃত্ত থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারা আজ তিমির অন্ধকারের বুকে বিলীয়মান। পৃথিবীর কি নির্মম পরিহাস! পীর জল্লু জালাল ও তাঁর প্রিয়তম পুত্র সিরাজ দেওয়ান অনন্তকাল ধরে ঘুমিয়ে আছেন এখানকার মাটিতে।' কিন্তু কেউ আজ আর তাঁদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কোন কোন পথিক হয়ত কবরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, সম্ভব হলে যেয়ারতটা করে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে।

সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রঃ)

সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রঃ)–এর জন্ম কোথায় এবং কত খৃষ্টাব্দে তা জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা গেছে যে, তিনি সুদূর আরব থেকে আগত একজন ইসলাম প্রচারক। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাক ভারত উপমহাদেশে আসেন। কালক্রমে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার শেখ পুরায় এসে আস্তানা গাড়েন।

যশোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ও ইসলাম প্রচারের জন্য স্থায়ীভাবে এখানে থেকে যান। তিনি এখানে একটি সুরম্য মসজিদ স্থাপন করেন। মসজিদটি ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন।

জানা যায়, সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রঃ) তাঁর শিষ্যদের সহযোগিতায় এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

অযত্ন অবহেলায় সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ (রঃ)–এর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক শেখপুরা মসজিদটি এখন ধ্বংসের মুখোমুখি।

হযরত শাহ আবদুল্লাহ ওরফে ভালাই শাহ আল বোগদাদী (রঃ)

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে শাহ আবদুল্লাহ ও শাহ হাতেম আলী নামে দু'জন বোজর্গ ব্যক্তি বর্তমানের ভালাইপুরে এসে আস্তানা গাড়েন। এরা সহোদর ভাই। জনশ্রুতি রয়েছে, তাঁরা ৩৬০ জন আউলিয়ার সদস্য ছিলেন। ঐ সময় মহেশপুরের (যেখানে আস্তানা) এই স্থানটা উঁচু ছিল বিধায় এখানেই তাঁরা আস্তানা গাড়েন।

আশেপাশে ছিল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর বসবাস। যতদূর জানা যায়, এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বর্ণশ্রেণীর দ্বারা লাঞ্ছিত হত। ফলে তারা এই ভালাই শাহের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হতে থাকে।

ইসলাম প্রচার করাই ছিল পীরদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য। দিনে দিনে পীরদ্বয় পরিচিত

www.pathagar.com

হয়ে ওঠেন।

কুষ্টসহ বিভিন্ন রোগীকে ভালাই শাহ খুব সহজে সুস্থ করে দিতেন। নাম শাহ আবদুল্লাহ হলেও মানুষ যেহেতু তাঁর কাছে আসলে ভাল হত, তাই সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালাই বাবা বলে ডাকতো। কালক্রমে তিনি এই ভালাই বাবা নামেই খ্যাতি লাভ করেন।

আজও মহেশপুর উপজেলার ভালাই পুর তাঁর নাম বহন করে যাচ্ছে। পরে তিনি এখান থেকে মেহেরপুরের পিরোজপুর চলে যান। সেখানেও তাঁর নামে অর্থাৎ ভালাই পুর নামে একটি গ্রাম গড়ে উঠে। এখান থেকেও তিনি অন্যত্র চলে যান। কিন্তু কোথায় যে তাঁর সমাধি আছে তা কেউ বলতে পারে না। তবে সবাই দাবি করে সমাধি তাদের ওখানেই অবস্থিত।

জানা যায় জীবননগর উপজেলার খয়েরহুদা গ্রামে ভালাই শাহের একজন সাথী হযরত শাহ সুফী খয়ের শাহ আস্তানা গাড়েন এবং তিনি খয়ের হুদা গ্রামেই শায়িত আছেন। খয়ের হুদা গ্রামের নামটি এই আধ্যাত্মিক পুরুষের বিজয় ঘোষনা করছে।

মহেশপুর–খালিশপুর রোডে ভালাইপুর ব্রিজটা ছাড়িয়েই মসজিদের পাশে অর্থাৎ রাস্তার পশ্চিম পাশে যে প্রাচীর বেষ্টিত জায়গাটি আছে ওর মধ্যে যে সমাধিটি দেখা যায় ওটা তাঁদেরই এক শিষ্যের সমাধি। তার বাড়ী ছিল ফরিদ পুর। শাহ হাতেম আলীর সমাধিটি অবশ্য এখানেই আছে। এখানে যে বটগাছটি রয়েছে, এ গাছটির নীচে তাঁর সমাধি।

বর্তমানে এ দরগাহ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে একটি মসজিদ ও একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা পরিচালিত হয়।

হযরত শাহ জিয়া আলী (রঃ)

যশোর চৌগাছা সড়ক ধরে ৭ মাইল পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই পড়ে দোগাছিয়া আহসান নগর বাজার, এর কোয়াটার মাইল উত্তরেই অবস্থিত প্রাচীন জনপদ সাজিয়ালী। অবশ্য জনপদটি নানা কারণে তার পূর্ব ঐতিহ্য প্রায় হারাতে বসেছে।

গ্রামটির ভেতর আছে একটি বাওড়। বাওড়টি মৃত প্রায়। বাওড়টির ভেতর এলোমেলো বাঁধ দিয়ে বর্তমানে ধান চাষ করা হচ্ছে। বাওড়টির ধারে ছিলো প্রাচীন একটি বাজার তাও কিছুদিন আগে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই প্রাচীন জনপদের সাথে মিশে আছে এক মহান সাধকের কর্মময় জীবনের স্মৃতি। আনুমানিক প্রায় তিনশ' বছর আগে হযরত শাহ জিয়া আলী (রঃ) নামে এক

www.pathagar.com

অলিয়ে কামিল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমা কোন দেশ থেকে এই জনপদে আগমন করেন। দ্বীনের এ মহান সাধক অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটান। হিন্দু জমিদার শ্রেণীর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে তিনি তাঁর মিশন অব্যাহত রাখেন। ফলে নিম্ন বর্ণের হিন্দুসহ উচ্চ বর্ণের প্রচুর হিন্দু ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়।

জানা যায়, তিনি হযরত শাহ মাখদুম (রঃ)-এর বংশের লোক ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে এই জনপদের নামকরণ হয় 'সাজিয়ালী'। পার্শ্ববর্তী গ্রাম এনায়েতপুরে এই মহান সাধকের কবর রয়েছে।

হযরত শাহ হাফিজ (রঃ)

হযরত শাহ হাফিজ-এর পূর্ব পুরুষ হলেন ফরিদপুর-এর শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামিল হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রঃ)। তিনি গেরদা নামক স্থানে বসবাস করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হযরত শাহ হাফিজ মাগুরা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন এবং খানকা স্থাপন করেন। জানা যায়, "নলডাংগার মহারাজা তাঁর বসবাসের জন্য বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি দেন। হযরত শাহ হাফিজের প্রপিতামহ হযরত শাহ আলী বোগদাদী পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সৈয়দ সালতানাতের যুগে বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য ফরিদপুর অঞ্চলে এসে খানকা স্থাপন করেন। দিল্লীর সুলতান তাঁকে ফরিদপুরের ঢোল সমুদ্র অঞ্চলে বারো হাজার বিঘা জমি লাখেরাজ দেন।"

এ সম্বন্ধে এ পরিবারের বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, "বাগদাদ থেকে আমার পূর্ব পুরুষ হযরত শাহ আলী বোগদাদী ভারতে আসেন সৈয়দ বংশ যখন দিল্লীতে রাজত্ব করছিলেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁর কন্যাকে বিবাহ দেন তাঁর সঙ্গে। তিনি এক সন্তান জন্ম দিয়ে ইন্তেকাল করেন। আমি সেই সন্তানেরই বংশধর। শাহ আলী উন্নত ওলী ছিলেন। তাঁর মাযার মিরপুরে। ফরিদপুরের গেরদায় তিনি বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর বংশধররা বসবাসকরছেন।

শাহ আলী বোগদাদীর প্রথম সন্তান শাহ ওসমানের কয়েক পুরুষ পরে শাহ হাফিজ গেরদা থেকে যশোর জেলার আলোকদিয়া গ্রামে নতুন বসতি স্থাপন করেন। বংশানুক্রমিক রীতিতে তিনি সমস্ত সম্পত্তির মুতোওয়াল্লী ছিলেন। কিন্তু শাহ আলী বোগদাদীর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানাদির সঙ্গে বংশ পরম্পপরায় একটি রেষারেষি ছিল। সেই বিরোধ দূর করবার জন্য শাহ হাফিজ গেরদা ত্যাগ করে আলোকদিয়া গমন করেন। তাঁকে এ কাজ করতে উপদেশ এবং সাহায্য দেন নওয়াব আলীবর্দী খাঁর শ্যালক এবং প্রধানমন্ত্রী মোল্লা শের আলী। মোল্লা শের আলী তাঁর ভগ্নীকে শাহ হাফিজের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং অনেক লাখেরাজ জমি দিয়ে আলোকদিয়াতে আনয়ন করেন।

www.pathagar.com

আলোকদিয়ার পীর বাড়ি বলে এ বাড়ি এখনো বিদ্যমান।"[১]

হযরত শাহ আলী বোগদাদী কিভাবে বাগদাদের ফোরাত নদীর তীর থেকে ফরিদপুর এসে পৌছালেন সে সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় লিখিত তাঁর জীবনীতে উল্লেখ আছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে জনাব সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আত্মজীবনী (শৈশব ও কৈশোর) 'স্রোতবাহী নদী'তেও উল্লেখ করেছেন। শিয়া-সুন্নী বিরোধকে কেন্দ্র করে শাহ আলী বোগদাদী একদিন চল্লিশ জন সঙ্গী-সাথীসহ জন্মভূমি বাগদাদ ত্যাগ করেন। সবারই সাথে ছিল সুদৃশ্য ঘোড়া। বহু পথ অতিক্রম করার পর এক রাতে তাঁরা একটি মরুদ্যানে আলো জ্বলতে দেখলেন। ততক্ষণে ঘোড়াগুলো পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে। ঘোড়া ও সঙ্গী-সাথীদের পিপাসা নিবারণ করার মানসে জনাব শাহ আলী দলবলসহ সেখানে যান এবং তাবুতে গিয়ে এক অনিন্দ্য রূপসী নারীকে দেখতে পান। সেই নারীর সাহায্যে পানির পিপাসা মিটলো ঠিকই কিন্তু সমস্যা হল অন্যখানে। জানা গেল, নারীটি বন্দীনি। সে এখান থেকে মুক্তি চায়। জনাব শাহ আলী নারীটির প্রস্তাবে জানালো, 'সে নিজেই মুক্তির জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে পথে-প্রান্তরে ছুটছে। সুতরাং অন্যকে মুক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অবশ্যই, তার (নারীটির) মুক্তির জন্য পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করবে।' এরপর তাঁরা পথ চলতে শুরু করে। পথের নানা ঝামেলা পেরিয়ে এক সময় তারা কাশ্মীর এসে পৌছেন এবং এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু স্থায়ী আবাস গড়েননি। তাই আবার যাত্রা। এবার এসে পৌছুলেন দিল্লী। বিয়ে করলেন শাহী পরিবারে। তারপর রওনা হলেন একেবারে বাংলা মুল্লুকের দিকে। এসে পৌছুলেন ফরিদপুরের ঢোল সমুদ্রের তীরে। পছন্দ হল যায়গাটা। বসতি স্থাপন করলেন এখানেই।

মাহমুদ আলী শাহ (রঃ)

জনশ্রুতি আছে যে রাজা সীতারাম একদিন সদলবলে বের হয়েছিলেন ভ্রমণে। ভ্রমণ পথের এক পর্যায়ে তাঁরা একটা ঘন ঝোপের ভেতর থেকে আল্লাহু আল্লাহু জিকিরের আওয়াজ শুনে থেমে যান এবং এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে আবিষ্কার করেন।

কথোপকথনের এক পর্যায়ে সীতারাম এই মুসলমান দরবেশের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। দরবেশ দোয়া করতে গিয়ে বলেন-

'যাও সীতারাম, মনে রাখবে যেখানে তোমার ঘোড়ার পায়ের রক্তে রঞ্জিত হবে, সেখানে তোমার যাত্রা বিরতি দেয়া উচিত হবে, কারণ সেখানেই গড়ে উঠবে তোমার রাজধানী।'

---

১. সৈয়দ আলী আহসান-স্রোতোবাহী নদী-পৃঃ১৮।

www.pathagar.com

দরবেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ঘোড়া ছুটাল সীতারাম। এক সময় সীতারামের দলের লোকজন রক্ত রক্ত বলে চিৎকার করে উঠল। থেমে গেল ঘোড়ার গতি। খুঁজে বের করা হল রক্তরঞ্জিত স্থান এবং তাবু গাঁড়া হল সেখানে। তারপর। তারপরই রাজা সীতারাম রায় তিলে তিলে গড়ে তুললেন অট্টালিকার পর অট্টালিকা। রাজা সীতারাম দরবেশ বাবার নাম অনুসারে তাঁর গড়ে তোলা রাজধানীর নাম দিলেন মাহমুদ পুর বা মোহাম্মদ পুর'। তৎকালীন নবাবের নিকট থেকেও সীতারাম পেলো স্বীকৃতি। কেউ কেউ বলে থাকেন এই স্বীকৃতিই ছিল সীতারামের মূল লক্ষ্য। এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা।

সীতারাম কিন্তু দরবেশের নামে রাজধানীর নামকরণ করেই ক্ষ্যান্ত হলেন না, তিনি দরবেশের নামে দু'শ বিঘা জমি লাখেরাজ দিয়েছিলেন। যদিও সে জমি আজ এলাকার লোকজনের কব্জায় চলে গেছে।

কেউ কেউ মাহমুদ আলী শাহকে সুফী মুহাম্মদ আলী শাহও বলে থাকেন। এই মাহমুদ আলী শাহের উত্তর পুরুষ হলেন আলী মাওলা। আজও মোহাম্মদপুর থেকে মাইল দুই পশ্চিমে 'আলী মাওলার' দরগাহ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

শাহ সূফী সৈয়দ কারামতুল্লাহ বোগদাদী (রঃ)

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে শাহ সূফী সৈয়দ কারামতুল্লাহ বোগদাদী (রঃ) সুদূর বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আগমন করেন। বাগদাদ থেকে আগমনের কারণে তাঁর নামের শেষে বোগদাদী লাগান হয়েছে। তিনি মাগুরার মোহাম্মদ পুরের নাকোল গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন এবং পরবর্তীকালে এখানে বিয়ে করে স্থায়ী হন। এতদাঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। আনুমানিক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সৈয়দ আহমদ আলী সিদ্দিকী (রঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৈয়দ আহমদ আলী সিদ্দিকী মাগুরার মোহাম্মদ পুরের নাকোল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন প্রখ্যাত অলিয়ে কামিল শাহ সূফী সৈয়দ কারামতুল্লাহ বোগদাদী (রঃ)। তিনি যশোবন্ত পুরের পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ–এর শ্বশুর ছিলেন।

পিতা সৈয়দ কারামতুল্লাহ'র চেয়ে পরিচিতির পরিধি সৈয়দ আহমদ আলী সিদ্দিকী (রঃ)–এর কম ছিল না।

www.pathagar.com

অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

হযরত সাতকড়ি ফকির

সাতকড়ি ফকির, গাজী সানাউল্লাহ ওরফে রণগাজীর বংশধর। যশোর জেলার মাগুরার অন্তর্গত দ্বারিয়াপুর অঞ্চলে চারজন গাজীর আগমনের কথা জানা যায়। এ চৌগাজীর নাম অনুসারে পরবর্তীতে দ্বারিয়াপুরের পাশে 'চৌগাছি' নামে একটি জনপদ গড়ে ওঠে। রণগাজী ছিলেন উক্ত চৌগাজী বা চারগাজীর একজন। এক সময় গাজীরা দ্বারিয়াপুরেই বসতি স্থাপন করে।

সাতকড়ি ফকির একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। আজও দ্বারিয়াপুরে তাঁর মাযার বর্তমান। 'দ্বারিয়াপুরের বর্তমান পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী তোয়াজ উদ্দীন আহমদ এই গাজীদেরই উত্তর পুরুষ। তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দাদই জামান হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)–এর অন্যতম প্রধান খলীফা। দ্বারিয়াপুর খানকা শরীফে প্রতি বছর ৪ মাঘ হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ইসালে সওয়াব ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।'[১]

হযরত গরীব শাহ দিউয়ান (রঃ)

হযরত গরীব শাহ দিউয়ান সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায়নি। যশোর জেলার মাগুরার অন্তর্গত শন্দালপুর ন'হাটা গ্রামে গরীবশাহ দিউয়ানের মাযার রয়েছে। 'গরীব শাহ দিউয়ানের সাথে অনেকেই ভুল করে খান জাহান আলীর সাথে আগত গরীব শাহকে এক করে ফেলেন। অথচ এরা দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি এবং ভিন্ন সময়ের।' যাঁর মাযার যশোর শহরে অবস্থিত।

হযরত মওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রঃ)

যশোরে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে শাহ আবদুল করীম এক চির উজ্জ্বল নক্ষত্র। যখন যশোরের অলিতে গলিতে চলছিল হিন্দু ও খৃষ্টান মিশনারীদের অপ দৌরাত্ম, যখন ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অপপ্রচারের ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করেছিল, তখনই এই মহান সাধক ইসলামের সুমহান বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেন।

মওলানা শাহ আবদুল করীমের পূর্ব পুরুষ হলেন হযরত শাহ সূফী সুলতান

১. আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত–যশোর পরিচিতি।

www.pathagar.com

আহমদ। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। জানা যায়, সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের পদাতিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি যশোর আগমন করেন এবং যশোর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যশোর থেকে যান। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজা ছিলেন শুকদেব সিংহ রায়।

রাজা শুকদেব সিংহ রায় রাজা মানসিংহ ও সম্রাট আকবরকে খুশী করার উদ্দেশ্যে শাহ সুফী সুলতান আহমদকে 'বসবাসের জন্য রাজবাড়ীর খিড়কীর দিকে বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। খিড়কী এলাকা পরে খড়কী এলাকায় পরিণত হয়।' বর্তমানে খড়কী যশোর শহরের একটি অংশ। যশোর সরকারী এম, এম, কলেজ এই খড়কীতে অবস্থিত।

মোগল আমল থেকে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত হযরত মওলানা শাহ আবদুল করীম সাহেবের বংশের লোকেরা যশোর অঞ্চলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে আসছেন।

যশোর শহরতলীস্থ খড়কী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারে হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল করীম ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ সালীম উদ্দীন চিশতী একজন কামিল পীর ছিলেন।

শাহ আবদুল করীম বাল্যকালেই পিতৃহারা হন এবং দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী (রঃ)–এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।

দাদা শাহ কালিম উদ্দীন চিশতী দ্বীনি ইলমের প্রাথমিক সবক দিয়ে তাঁর হাতেখড়ি দেন। পরে স্থানীয় বিদ্যালয় হতে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি দাদাকে হারান। দাদাকে হারিয়েও শাহ আবদুল করীম তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি টানেননি। তিনি পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে জামা'আতে উলা পাস করেন।

শিক্ষা জীবন শেষে এই মহান মনীষি যশোর জেলা স্কুলে হেড মৌলবী হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন।

শিক্ষকতা করা অবস্থায় তাঁর ভেতর 'ইলমে তাসাউফ' সম্বন্ধে জানার কৌতুহল জাগে এবং সে সম্বন্ধে জানার জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়েন। তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলার মৌজা কোর্টের আবদুল খালিক নামক স্থানের প্রখ্যাত সুফী সাধক আবু সা'আদ মুহাম্মদ আবদুল খালিক–এর নিকট মুরীদ হন। এখানে দীর্ঘ বার বছর তিনি তাসাউফ চর্চায় নিজেকে নিমগ্ন রাখেন এবং ইলমে তাসাউফের উচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হন। 'তাঁর পীর তাঁকে নাকশ বান্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, কাদিরিয়া, চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার খিলাফত প্রদান করে স্বদেশে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন।'

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি ইসলাম প্রচার ও সমাজে কুসংস্কার দূর করার প্রচেষ্টা চালান। এ সময় অনেক বিধর্মীই তাঁর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শাহ আবদুল করীম অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে চলাফেরা করতেন। পিতার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি আড়ম্বরহীন, বিনয়ী ও নম্র জীবন যাপনকরেছেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক সময় যশোর জেলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি এই সময় শাহ আবদুল করীমের একান্ত সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর লেখা আধ্যত্ম পুণ্যময় লক্‌খী ছাড়া গল্পটি পীর আবদুল করীম সাহেবকে লক্ষ্য করে (বমনার পীর সাহেব) লেখা। গল্পের নায়ক রমজানকে ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের সমকালীন প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।

শাহ মুহাম্মদ আবদুল করীম একজন উচ্চ স্তরের সাহিত্যিকও ছিলেন। ইলমে তাসাউফের ওপর তিনি 'এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তি' নামক প্রায় তিন'শ পৃষ্ঠার একখানি পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক জনাব মুহম্মদ আবূ তালিব লিখেছেন, "বইখানি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, এ যাবত বাংলা ভাষায় সূফী বা তাসাউফ তত্ত্বমূলক যত বই লেখা হয়েছে, তন্মধ্যে এ খানি শ্রেষ্ঠ।

আবদুল করীম সাহেব ব্যক্তিগত ভাবে একজন নিষ্ঠাবান সূফী, তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে রঙিন এই বইখানি সাধারণ পাঠকের জন্য এক অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছে।

সুবিস্তৃত দশটি অধ্যায়ে তিনি তত্ত্বের মর্মকথা, তাসাউফের দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ সূফী-খান্দানের ইতিকথা, শাজরা নামা (পীর-পরম্পরা) ইত্যাদির সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। শেষ বা দশম অধ্যায়ে তিনি অমুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থাদি, যথা- বেদ-উপনিষদ-পুরানাদির সঙ্গে ইসলামী সূফীতত্ত্বের (Metaphysical) তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।'

শাহ আবদুল করীম সাহেব গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তাঁর পীর হযরত খাজা আবু সা'আদ মোহাম্মদ আবদুল খালিক সাহেবের অনুপ্রেরণায়।

এ সম্বন্ধে শাহ আবদুল করীম সাহেব উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "পীর সাহেব বললেন, তুমি নিজ ভাষায় স্পষ্টভাবে যেমত আমার নিকট শিক্ষা পাইয়াছ সেইরূপ এক খন্ড কিতাব লিখ। যাহা বুঝিতে লোকের কষ্ট না হয় এবং সন্দেহ ভঞ্জন হয়। কারণ তাছাওয়ফের বিদ্যা ক্রমশঃ লোপ হইয়া যাইতেছে; কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্টভাবে তাহার উত্তর পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে; সুতরাং লোকের মূল উদ্দেশ্য পরম সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালাকে চেনার পথ একেবারে সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অতএব তুমি সত্বর কিতাব লিখিতে প্রবৃত্ত হও।"

'পীরের নির্দেশ মুতাবিক লেখক তাঁর কিতাবখানি সর্বসাধারণ বোধ্য ভাষায় লিখেছেন। বলাবাহুল্য, ইসলামী চিন্তা ধারার এক মৌলিক উৎসের সন্ধান দিয়েছে

www.pathagar.com

কিতাব খানি।'

গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব শাহাদত আলী আনসারী বলেন, 'মওলানা মোহাম্মদ আবদুল করীম সাহেব নকশবন্দীয়া তরিকার একজন কামেল সূফী ছিলেন। সূফী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর গ্রন্থখানিতে প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি তাসাউফের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন; পঞ্চম থেকে নবম অধ্যায়ে সুফী সাধনায় নকশবন্দীয়া, কাদেরীয়া এবং চিশতীয়া তরিকার বিশ্লেষণ করেছেন এবং দশম হতে শেষ অধ্যায়ে বেদ, পুরান প্রভৃতিতে প্রচলিত বিষয়বস্তুর তত্ত্ব তিনি উদঘাটন করেছেন এবং সুফী মতবাদের সাথে তার তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। তাসাউফ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় লিখিত এইরূপ দ্বিতীয় কোন বই পাওয়া যায়না।'

শাহ আবদুল করীম (রঃ)–এর জীবদ্দশায় গ্রন্থটির দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর। প্রকাশক ছিলেন মুন্‌শী শেখ জমির উদ্দীন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে শাহ সাহেবের পুত্রদ্বয় (মোহাম্মদ আবু নঈম ও মোহাম্মদ আবুল খায়ের) লিখেছেন, "পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক রেভারেন্ড মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবকে অত্র সংস্করণ দান করিলাম। টাইটেল পেজে কেবলমাত্র প্রকাশকের স্থানে তাঁহার নাম থাকিবে।"

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ ৪০ বছর পর প্রখ্যাত সমাজ সেবক ও সাহিত্যিক মরহুম মৌলভী ওয়াহেদ আলী আনসারী ১৩৫৬ সালে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে ভূমিকা লেখেন শাহ সাহেবের পুত্র জনাব আবুল খায়ের। পরবর্তীতে ১৩৮১ সালে তার পৌত্র শাহ আবদুল মতিন বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ বের হয়েছে ৩০ মার্চ ১৯৮৬। এর প্রকাশক শাহ আবদুল মতিন।

এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব নামক তাসাওউফের উপর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার সর্ব প্রথম প্রকাশিত বিস্তারিত ও তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলেছেনঃ মোহাম্মদ আবদুল করীমের খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বের মতো বাংলায় তাসাওয়াফ সম্পর্কিত বই আর দ্বিতীয় দেখা যায় না।' বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, 'প্রকৃত পক্ষে এ পুস্তক খানা সাধনার পথিকদের জন্য একখানা মূল্যবান গ্রন্থ। শাহ মোহাম্মদ আবদুল করীম (রঃ) আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।'

শাহ আবদুল করীম (রঃ) ১৩২২ বাংলা সনের ৩০ অগ্রহায়ণ খড়কীস্থ নিজ খানকা শরীফে ইন্তেকাল করেন। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। প্রতিদিন বহু যিয়ারতকারী আসেন। তাঁর নামে শহরে শাহ আবদুল করীম সড়ক রয়েছে। তাঁর

www.pathagar.com

বংশধররা আজও ইসলামের কাজে নিয়োজিত আছেন। খড়কীর বর্তমান পীর হযরত মাওলানা শাহ আবদুল মতিন তাঁর পৌত্র।

সূফী সদরউদ্দীন

১৮৬৩ সালে শালিখা থানার অন্তর্গত গঙ্গারাম পুর গ্রামে সূফী সদরউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। এন্ট্রার্স পাস করার পর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি বনবিভাগে চাকরি নেন। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইসলাম প্রচারে নেমে পড়েন। তিনি একজন উচ্চমানের সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো–

'এলম তাছাওয়োফ (আল্লাহ পাইবার তত্ত্ব নকশবন্দিয়া মোজাদ্দাদিয়া তরিকা), আল্লাহ তায়ালার তরিকা (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ), 'এলম তাছাওয়োফ (কাদেরিয়া তরিকা), 'এলম তাছাওয়োফ (চিশতিয়া তরিকা), 'বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য', 'আমার প্রাণের রছুল নবী মোহম্মদ (সঃ), 'ওলি বিবির কাহিনী', 'বুজর্গ নামা,' 'আকায়েদোল এছলাম,' 'সন্দীপে টানা শাহের মাজার', 'ফজিলতে কোরবানী' ইত্যাদি।

তিনি ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী ফেনীতে দেহ ত্যাগ করেন। ফেনীতে তাঁর সমাধিরয়েছে।

আলহাজ্ব মুন্সী আবদুল আজীজ (রঃ)

বৃহত্তর যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমান মাগুরা জেলা) মোহাম্মদপুর থানার–যশোবন্তপুর গ্রামে আনুমানিক ১২৮০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আরিচ উদ্দীন। মুন্সী আরিচ উদ্দীনের ছিল ৪ পুত্র–মুন্সী আবদুর রহীম, মুন্সী আবদুল আজীজ, মুন্সী আবদুল গফুর ও মুন্সী তকী মাহমুদ।

মুন্সী আবদুল আজীজ (রঃ) ছিলেন অত্র এলাকার মশহুর অলিয়ে কামিল। তিনি জনগণের কাছে এত বেশী গ্রহণীয় ছিলেন যে অত্র এলাকার অমিমাংসিত বিষয়সমূহ তাঁর নিকটই মিমাংসার জন্য আসত। অর্থাৎ তাঁকে কাজীর দায়িত্ব পালন করতে হত। এমন কি অনেক দোষী ব্যক্তি তার নাম শুনে ভয়ে আগেই তার দোষ স্বীকার করত এবং ক্ষমা ভিক্ষা করত।

তাঁর কারামত সম্বন্ধে নদের চাঁদ ঘাট কাচারীর হিন্দু নায়েব দিনেশ বাবু বলেন– 'আমার এক কর্মচারী চাঁদপুর কাচারী থেকে গভীর রাতে টাকা নিয়ে নদের চাঁদ ঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু কাছে টাকা থাকার দরুন ভীত হয়ে পড়ে। ঠিক এ মুহূর্তে পথে যশোবন্ত পুরের পীর আবদুল আজীজ সাহেবকে দেখতে পান। পরে পীর সাহেব কর্মচারীটিকে নদের চাঁদ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান। আমার কাছে যখন

www.pathagar.com

কর্মচারীটি এল তখন এত রাতে আসার জন্য বকাঝকা করতে গেলে সে পীর সাহেবের কথা বললো। পীর সাহেবের কথা শুনে এবং তাঁকে এই রাতে একাকী ছেড়ে দেয়ার জন্য কর্মচারীটিকে ভৎর্সনা করে পীর সাহেবকে দ্রুত ধরে আনার জন্য বললাম। কর্মচারীটি ছুটতে ছুটতে পেরেশান হল কিন্তু পীর সাহেবকে পেল না। শেষ পর্যন্ত সে পীর সাহেবের বাড়ী গিয়ে দেখল তিনি ভোরের নামায পড়ছেন। পরে জানা গেল পীর সাহেব কয়েকদিন ধরে বাড়ীতেই আছেন বাহিরে কোথাও যাননি।"

মুন্সী আবদুল আজীজ অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচারের সুমহান দায়িত্ব পালন করেন। আল্লার এই মহান খাদেম ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে হজ্ব করতে গিয়ে হজ্বের শেষদিন শুক্রবার পবিত্র হজ্বব্রত পালন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর রয়েছে 'জান্নাতুল বাকীতে'।

প্রতিবছর ১লা মাঘ তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করে যশোবন্তপুর ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত মওলানা সামসুদ্দীন (রঃ)

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার মৎস রাঙ্গা (মাছরাঙা) গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্র এলাকার একজন মশহুর পীর ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৎস রাঙ্গা গ্রামে তাঁর মাজার রয়েছে। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে এখানে ইছালে ছওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে আসে ও ইসলামের কথা শুনে নিজেদেরকে ধন্য করে।

হযরত মওলানা মোহাম্মদ শাহ সুফী জয়নাল আবেদীন জিলানী (রঃ)

শাহসুফী জয়নাল আবেদীন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে চৌগাছা উপজেলার (সাবেক মহেশপুর উপজেলা) কমলাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি অত্র এলাকায় অলিয়ে কামিল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান সাহিত্যিক মওলানা মোহাম্মদ গোলাম জিলানী। যাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থাবলী–মেহেদী (উপন্যাস), ভুলের বাঁধন (উপন্যাস), মাহুয়া (কাব্য), উৎসর্গ (কাব্য) ও বারোয়ারী সাহিত্য সংকলন (বারোজন লেখকের লেখা)।

খান বাহাদুর মওলানা আহমদ আলী এনায়েত পুরী (রঃ)

১৮৯৮ সালে যশোর সদর উপজেলার এনায়েত পুর গ্রামে আহমদ আলী এনায়েত পুরী (রঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এতদাঞ্চলে পীরে কামিল হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

www.pathagar.com

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়। প্রকাশিত গ্রন্থ হলো–ফতোয়ায়ে এসলামিয়া, তফসিরে সুরায়ে ইয়াসিন, ওজীফা এরশাদে ছিদ্দিকীয়া, তালিমে মুসলিম বা নামাজ শিক্ষা, দাফেয়ে জ্বোলমাত বা দ্বীন দুনিয়ার শান্তি, কারামতে আউলিয়া বা শাহ সাহেবের জীবনী, একামাতুস সুন্নাৎ বা বেদয়াত খন্ডন ইত্যাদি।

তিনি ১৯৪৮ সালে 'মাসিক সরিয়তে এছলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯৫৯ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উপস্থিতিতে এখানে ইছালে সওয়াব ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলহাজ্ব মুন্সী মুহাম্মদ শামনূর (রঃ)

মুন্সী শামনূর ১৮৯৭ সালে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার বাড়ীয়ালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সাতাশে ছিলেন অর্থাৎ সাতমাস মাতৃগর্ভে থাকার সময় জন্ম গ্রহণ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, জন্মের দু'দিন পর তাঁর চোখ ফোটে। তাঁকে প্রথম কয়েকটি দিন তুলার ভেতর রাখতে হয় বলেও জানা যায়। তিনি একাডেমীক কোন লেখা পড়া শিখতে পারেননি। যতটুকু লেখাপড়া করেছেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়।

ছোটবেলায় তিনি ছিলেন রাখাল। অবশ্য নিজেদের গরু ছাগলই তাঁকে চরাতে হতো। একদিন তিনি ছাগল গরু চরাচ্ছিলেন এমন সময় এ পথ দিয়ে মৎস রাঙার পীর মওলানা সামসুদ্দীন সাহেব যাচ্ছিলেন, কিন্তু বালক শামনূরকে দেখার সাথে সাথে তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং স্বগোক্তি করে বললেন, 'এই ছেলে বড় হয়ে এক বিশিষ্ট কামিল ব্যক্তি হবেন।' পীর সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে খেটে গেছে।

মুন্সী শামনূর জীবনে দু'টি মামলার প্রধান আসামী হয়েছেন এবং দু'টিতে অত্যন্ত সম্মানের সাথে জিতে গেছেন। তখন তাঁর যৌবনকাল–এই ২৫–২৬ বছর বয়স আর কি! সবে তিনি একটি মাটির মসজিদ গড়েছেন। রীতিমত নামায কালাম শুরু হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে সামান্য দূরেই তো পুজো মন্ডব। প্রথমে বর্ণ হিন্দুরা আযানের ফলে পুজোর ব্যাঘাত হচ্ছে বলে ধুয়ো তুললো, এরপর নানা ধরনের ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে শুরু হলো বাদানুবাদ। শেষে কোরবানীকে কেন্দ্র করে ঘটলো মূল ঘটনা। মুন্সী সামনূর যখন পুরো একটা গরুই কোরবানী করলেন, তখন হিন্দু প্রতিবেশীদের মাথায় পড়লো বাজ। তারা তো রাম রাম বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সাথে সাথে যশোর গিয়ে ঠুকে দিল 'গো হত্যা মামলা'। করবেই বা না কেন, দেবতার দেশে দেবতা জবাই? সে যাই হোক, মামলা চললো পুরো এগারো বছর। এর মাঝে মুন্সী শামনূরসহ তাঁর অপর তিন ভাইকে নলডাঙ্গার রাজবাড়ীতে নিয়ে বেদম প্রহার করা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলার রায় মুন্সী সাহেবের পক্ষেই গেল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মামলাটি একটি রাস্তা সংক্রান্ত। মুন্সী সাহেবের নেতৃত্বে এক রাতে দু' মাইল দীর্ঘ একটি কাচা রাস্তা তৈরী করা হয়। পার্শ্ববর্তী উজিরপুর গ্রামের লোক তাদের জমি নষ্ট হয়েছে–এজন্য মামলা দায়ের করে। মামলাটি ৭ বছর চলার পর মুন্সী সাহেবের পক্ষে রায় আসে। রাস্তাটি বর্তমানে আরো প্রশস্ত হয়ে মুন্সী সাহেবের বিজয় ঘোষণা করছে।

১৯৭১ সালে মুন্সী শামনুর হজ্বব্রত পালন করেন। ১৯৭৮ সালে এই মহান সাধক পরলোকগমন করেন। ঝিকরগাছা, শার্শা, চৌগাছা, যশোর সদর, কালিগঞ্জ ও মহেশপুর এলাকায় তার প্রচুর মুরিদান রয়েছে। তিনি বাড়ীয়ালীর পীর সাহেব নামে পরিচিত।

খাজা মুহাম্মদ আলী শাহ (রঃ)

মুহাম্মদ আলী শাহ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরান থেকে যশোরের নওয়া পাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ পরিবারের অবদান নিঃসন্দেহে বিরাট। খাজা মুহাম্মদ আলী শাহের সুযোগ্য পুত্র নওয়া পাড়ার বিখ্যাত পীর খাজা আবদুল মজিদ শাহ। তিনি ১৯০৭ সনে নওয়া পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিকও বটে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ–বার চাঁদের ফজিলত ও ছেরাতোল মোমেনিন।

তাঁর সম্বন্ধে জনাব মুহাম্মদ আবূ তালিব 'খুলনা জেলায় ইসলাম' গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "খান বাহাদুর সাহেবের (খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্ ১৮৭৩–১৯৬৭) পীর হযরত মওলানা মুহম্মদ আলী সাহেবও খুলনা–যশোরে ইসলাম প্রচারে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। জনাব মুহাম্মদ আলী সাহেব যশোর জেলার নওয়াপাড়া বাসী। তিনি সাধারণত ইরানী পীর সাহেব নামে পরিচিত। খুলনা থেকে যশোর যাওয়ার পথে যশোর–খুলনা সড়কের পাশে নওয়াপাড়া শহরে এই পীর সাহেবের মাযার ও খানকাহ অবস্থিত।

তাঁর বিখ্যাত মুরীদ ও খলীফাদের মধ্যে সিদ্ধি পাশার (যশোর জেলা) কাজী আবদুর রউফ (সাধারণ্যে ইনি কাজী সাহেব নামেই পরিচিত) এবং খুলনা দৌলতপুরের নদীর অপর পাড়ে দীঘলিয়া নিবাসী ম ওলানা দীন মুহম্মদ সাহেবদ্বয়ের নাম বিশেষ বিখ্যাত। কাজী সাহেব একজন খ্যাতিমান দরবেশ তো বটেই উপরন্তু একজন আধ্যাত্মবাদী লোক চিকিৎসক হিসাবেও সুপরিচিত। বহু দূরারোগ্য ব্যাধি বিশেষ করে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবসার প্রত্যাখ্যাত রোগীও নিরাময় করে তিনি অসাধারণ সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এই সব চিকিৎসার কাহিনী সারা দেশে বহু কিংবদন্তীর' জন্ম দিয়েছে।

দীঘলিয়ার মওলানা দীন মুহম্মদ সাহেবও (১৮৯১–১৯৫৫, ২৬শে ফেব্রুয়ারী)

www.pathagar.com

কাজী সাহেবের মত খ্যাতিমান হয়েছেন। বলাবাহুল্য, নওয়াপাড়ার পীর সাহেবের অনুসারী সম্প্রদায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা সকলেই লোক চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং এই চিকিৎসার ব্যয় অত্যন্ত সামান্য এবং চিকিৎসার উপাদানও নিত্যন্তই তুচ্ছ। এবং এই চিকিৎসা ধর্মীয় চেতনা সমৃদ্ধ এবং জনসেবার একটি আদর্শ নমুনা।"[১]

হযরত মওলানা জয়নুল আবেদীন (রঃ)

আনুমানিক ১৯০১ সালে মওলানা জয়নুল আবেদীন (রঃ) যশোর জেলার চৌগাছা (তৎকালীন ঝিকরগছা থানার) উপজেলার বাড়ীয়ালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা, শাহারানপুর মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাশেষে দেশে ফিরে আসলে অল্পদিনের মধ্যেই তার সুখ্যাতি চতুর্দিকে মেশকে আম্বরের মত ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে লোক তাঁর বায়াত হতে থাকে। জানা যায়, তিনি নিজস্ব ঘোড়ায় চড়ে মুরিদানদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিতেন। তিনি খুব উঁচু দরের আলেম ছিলেন। তাঁর কামিলিয়াত সম্পর্কে অনেক গল্পই প্রচলিত আছে।

এই মহান অলিয়ে কামিল মাত্র ৪৫ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের শেষদিকে ইহধাম ত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি বাড়ীয়ালী গ্রামের মাধব পুকুর কবর স্থানে ঘুমিয়ে আছেন। কবরস্থানে যে বিরাটকায় জাম গাছটি আছে, ঐ গাছটি মরহুম মওলানার মাথা বরাবররয়েছে।

হযরত মওলানা আবদুল লতিফ (রঃ)

আনুমানিক ১৩০০ বঙ্গাব্দে মাগুরার যশোবন্ত পুরের পীর পরিবারে অর্থাৎ মুন্সী আবদুল আজীজ (রঃ)–এর ভাই মুন্সী আবদুর রহিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল লতিফ সাহেব দেওবন্দ থেকে পড়ালেখা করেন। আবদুল আজীজ সাহেবের কোন সন্তান না থাকায় যোগ্য ভ্রাতুস্পুত্র আবদুল লতিফকে খেলাফত দান করেন। মওলানা আবদুল লতিফের মাতার নাম ছিল–আছিরন নেসা। তিনি লেখাপড়া শেষ করে প্রথম জীবনে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ৭ বছর মোদারেস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত মওলানা আবদুল লতিফ (রঃ) চাচার মতই মশহুর হয়ে ওঠেন। তাঁর পীর ছিলেন পাঞ্জাবের আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রঃ)।

এই মহান ইসলাম প্রচারক ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

---

১. মুহম্মদ আবূ তালিব– খুলনা জেলায় ইসলাম, পৃঃ ১৪২।

www.pathagar.com

আলহাজ্ব হযরত মওলানা নিজামউদ্দীন

১৯৪১ সালে মওলানা নিজাম উদ্দীন বাড়ীয়ালী গ্রামের পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন প্রসিদ্ধ অলিয়ে কামিল আলহাজ্ব মুন্সী সামনূর রহমান। মওলানা নিজাম উদ্দীন শর্শিনা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা জীবন শেষ করেন। তিনি চৌগাছা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। গত ১৯৮৭ সালে আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রীয়া বন্ধ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের খলীফা ছিলেন।

আলহাজ্ব হযরত মওলানা ইছাহাক মিয়া

প্রাক্তন যশোর জেলার বনগাঁ থানার পিপলি পাড়া গ্রামে ১৯১২ সালে মওলানা ইছাহাক মিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বর্তমান যশোর জেলার শার্শা থানার বেনাপোল দরগাপুর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। পদ্ম বিলা মাদ্রাসা থেকে দাখেলী, ফুরফুরা শরীফ থেকে আলিম ও কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল ও কামিল পাশ করেন।

তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর কাইউমে জামান মরহুম শাহ সুফী আলহাজ্ব মওলানা আবু নসর মোহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের হাতে বায়াত হন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। মরহুম আবদুল হাই সিদ্দিকী (রঃ) তাঁকে 'হাফেজুল হাদীস সানী রুহুল আমীন' খেতাবে ভুষিত করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন।

দেওয়ান ঘোরনশাহ ফকির

উত্তরের কোন এক দেশ থেকে সাধক প্রবর ঘোরনশাহ ফকির খড়ম পায়ে বৃহত্তর যশোর জেলার কালিয়া উপজেলার বাঐসোনা গ্রামে আগমন করেন। যতদুর জানা যায় তিনিই এই গ্রামের প্রথম মুসলমান। তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভুমিকা রাখেন। এ অঞ্চলে তাঁর নামে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।
বাঐসোনা গ্রামে এখনো ঘোরনশাহ ফকিরের বংশধরগণ আছেন।

www.pathagar.com

কুরেলা শাহ দেওয়ান

কালিয়া উপজেলার কদম তলা গ্রামে মোঘল আমলে কুরেলা শাহ দেওয়ান নামে একজন ইসলাম প্রচারক আগমন করেন। তিনি কোন্ দেশ থেকে যশোর অঞ্চলে আসেন, তা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও বুঝা য়ায় যে, তিনি ইরান অথবা তুর্কীস্থান থেকে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে কালিয়া উপজেলার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক মহসিন হোসাইন বলেন, "মুঘল আমলে কুরেলা শাহ দেওয়ান বর্তমান চাঁচুড়ী হাটের পরপারে কদম তলা গ্রামে আগমন করেন। সম্ভবতঃ তিনি ইরান কিংবা তুর্কীস্থান থেকে এসেছিলেন।"

কদম তলা গ্রামে কুরেলা শাহ দেওয়ানের মাজার এখনো বিদ্যমান। মাজারের পাশেই রয়েছে প্রাচীন আমলের একটি মসজিদ যা কুরেলা শাহ দেওয়ানের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে।

কুরেলা শাহ দেওয়ানের আলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহসিন হোসাইন লিখেছেন, "কুরেলা শাহের বহু অলৌকিক কর্মের ইতিহাস আজও হাজার হাজার স্থানীয় লোকদের মুখে শোনা যায়। কুরেলা শাহের সময়ে আখড়াবাড়ী গ্রামে জনৈক হিন্দু সাধুর সন্ধান পাওয়া যায়। কুরেলা শাহ ও সাধুর মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একবার সাধু কুরেলা শাহের দরবারে উপস্থিত হলে, ঘরে খেতে দেওয়ার মতো কোন খাবার না থাকায় তিনি একটি শশার বীজ মাটিতে পুতে রাখেন– কিছু সময়ের মধ্যে মাটি হতে গাছ জন্মে, গাছ বেড়ে ওঠে এবং গাছে শশা ধরতে দেখা যায়। আর ঐ শশা কুরেলা শাহ সাধুকে খেতে দেন। আর একদিন অভ্যাস মতো আখড়াবাড়ীর সাধু কুরেলা শাহের দরবারে উপস্থিত হন। দেওয়ানজী ভীষণ জ্বরে কাতর ছিলেন। তিনি লেপ–কাঁথা রেখে উঠে বসলেন এবং সাধুর সাথে সুস্থ্য মনে ও দেহে কথা বলতে লাগলেন। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাকি জ্বর? আমিতো জ্বরের কথা শুনে আপনাকে দেখতে এসেছি।' এ কথা শুনে দেওয়ানজী অঙ্গুলী নির্দেশে তাঁর রেখে আসা লেপ ও কাঁথা দেখালেন। সাধু দেখতে পান লেপ ও কাঁথা থর্ থর্ করে কাঁপছে। দেওয়ানজী মুখে বললেন, 'জ্বর লেপ ও কাঁথার মধ্যে রেখে এসেছি, তাই ঐগুলি কাঁপছে।' শোনা যায়, কুরেলা শাহ খড়ম পায়ে রেখে চিত্রা নদীর এপার ওপার হতেন।"

হাজী হাফেজ আবদুল করীম

হাফেজ আবদুল করীম কালিয়া উপজেলার নলীয়া নদীর তীরবর্তী কলাবাড়ীয়া গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার মাটিয়া বুরুজ মসজিদ সংলগ্ন হেফজ খানা হতে হাফেজী পড়েন। আল্লাহ ও রসুলের প্রতি মহব্বত এতো তীব্র ছিলো যে, তিনি পায়ে হেটে হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন একজন সিদ্ধ পুরুষ। হাফেজ সাহেব সে যুগে এ অঞ্চলের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। কবি হিসেবেও তাঁর যতেষ্ট খ্যাতি ছিল। ১৩১১ বঙ্গাব্দে তাঁর 'নূরুল ইসলাম ছহি জুলফক্কার হাদী' নামক একটি পুঁথি কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁর অপ্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'গুপ্ত কালাম রত্ন মানিক'। ইসলাম প্রচারক এই মহান সাধক মাত্র ৪০ বছর কাল জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৯২৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

জানা যায়, 'হাফেজ আবদুল করীম অল্প বয়সে বাদাখশানের জনৈক তাপস পুরুষের নিকট মুরিদ হন। এবং অবিভক্ত ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারে বাহির হয়েছিলেন। তাঁর হাতে বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। হাফেজ আবদুল করীম ছিলো নির্ভীক আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ।'

এখনো হাফেজ সাহেবের অগনিত ভক্ত দক্ষিণ–মধ্য বঙ্গের বহু স্থানে রয়েছে। খুলনা বাইনতলা, হাকিমপুর, প্রভৃতি স্থানের নিকেরী সম্প্রদায়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

ওয়ালী মাহমুদ খাঁ

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে লোহাগড়া উপজেলার কলাবাড়ীয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি নলীয়া নদীর পশ্চিম তীরে 'কেল্লা বাড়া' বা 'কেল্লা বাড়ী' স্থাপন করেন। এই 'কেল্লা বাড়ী' থেকেই পরবর্তী কালে গ্রামের নাম হয় কলাবাড়ীয়া।

'কিংবদন্তিতে জানা যায় ওয়ালী মাহমুদ খাঁ পীর খান জাহানের ভ্রাতুস্পুত্র এবং জাহান্দার খাঁনের পুত্র। খাঁ বংশীয় উপাধি হলেও সম্ভবতঃ স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে ওয়ালী মাহমুদ কিংবা তাঁর পিতা লস্করই– লস্কর উপাধি পেয়েছিলেন। জাহান্দারের বংশধরেরা যশোর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে লস্কর, খাঁ, মোল্লা, মিয়া, মুন্সী প্রভৃতি গোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়ে আসছে। ওয়ালী মাহমুদ তাঁর পিতা পিতৃব্যের ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সাধক পীর ছিলেন।'

সেই আমলে ওয়ালী মাহমুদ তাঁর কেল্লা বাড়ীতে একটি মসজিদ ও একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলহাজ্ব মওলানা আদম আলী

লোহাগড়া উপজেলার কোলা গ্রামে মওলানা আদম আলী সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত আলেমে দ্বীন ও সাধক পুরুষ ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে আদম আলী সাহেব কালিয়া উপজেলার চিত্রা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক পেড়োলী গ্রামে খানকাহ স্থাপন করেন। পেড়োলীর ঐ খানকাহ্টি আজও পীর সাহেবের খানকাহ্ নামে পরিচিত।

পীর মওলানা আদম আলী'র ইন্তেকালের পর তাঁকে ঐ খানকাহ্র একটি কক্ষে দাফন করা হয়।

মওলানা কাওসার আহ্মদ

মওলানা কাওসার আহমদ সাধক পুরুষ মওলানা আদম আলী'র জামাতা ছিলেন। কাওসার আহমদ ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তী কালে শ্বশুরালয়ে অর্থাৎ কোলা গ্রামে চলে আসেন। এর পরে আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্বশুর মওলানা আদম প্রতিষ্ঠিত পেড়োলী গ্রামের খানকাহ্তে অবস্থান করতে থাকেন।

মওলানা আদম আলীর ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মওলানা কাওছার আহমদ। তাঁর পান্ডিত্যের কথা এতদাঞ্চলে মশহুর হয়ে আছে। তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আদম আলী সাহেবের মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়।

মওলানা ফয়েজ আহমদ ফয়েজী

ফয়েজ আহমদ ফয়েজী কালিয়া উপজেলার চিত্রা নদীর তীরবর্তী গ্রাম পেড়োলীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পীর মওলানা কাওছার আহমদ (রঃ)। ফয়েজ আহমদ পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিশিক্ত হন। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ভুমিকা প্রশংসনীয়। পিতা ও মাতামহের মাজারের পাশেই এই মহান ব্যক্তিত্বের মাজার রয়েছে।

মওলানা আবদুল হামিদ সাহেব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আবদুল হামিদ সাহেব কালিয়া উপজেলার নলীয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কলাবড়ীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের শাহরান পুর মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা জীবন শেষ করেন। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহসিন হোসাইন বলেন, "তিনি ছিলেন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহীর মুরীদ, খাস খলিফা। মওলানা আবদুল হামিদ ছাহেব অবিভক্ত ভারতের রাজনীতির সঙ্গে বিজড়িত ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি মওলানা মাহামুদুল হাসানের ভাবানুসারী ছিলেন।"

মওলানা সাহেব আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। জনশ্রুতিতে তাঁর অনেক

www.pathagar.com

অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়।

জানা যায়, একবার কলকাতার বিখ্যাত যাদুকর পি, সি, সরকারের 'আত্মাকর্ষণে' বাঁধা দিলে মিডিয়া মৃত্যুর উপক্রম হয়– যাদুকর মওলানার নিকট ক্ষমা চেয়ে 'আকর্ষণ' চির কালের জন্য ত্যাগ করেন।

যাহোক মওলানা আবদুল হামিদ সাহেব ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭৪ সালে নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন।

সাধক মহিউদ্দীন মুন্সী

মহিউদ্দীন মুন্সী কালিয়া উপজেলার জামরিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পেড়লীর পীর সাহেবের একান্ত খাদেম ও মুরীদ ছিলেন। নড়াইল উপজেলার বড়গাতির নীল কুঠির গভীর জঙ্গলে ১২ বৎসর ধ্যানস্থ থেকে তিনি ঐশী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নড়াইলের আফ্রায় এক দরবার নির্মাণ করেছিলেন এবং আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান করেছেন।

মাওলানা নুরুদ্দিন শিকদার

নুরুদ্দিন শিকদার আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে কালিয়া উপজেলার বড়নাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মোহাক্কিক আলিম ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর সমন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প শোনা যায়। এখানে জনাব মহসিন হোসাইন তাঁর কালিয়া উপজেলার ইতিহাস গ্রন্থে যে ঘটনার অবতারনা করেছেন তা তুলে ধরছি, "একবার দুদো মাতাল নামক এক ব্যক্তি নুরুদ্দিন ছাহেবের গাছের কলা চুরি করতে গেলে কলা গাছের কাছেই হাঁত পা আটকে যায় এবং সারা রাত সে দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে পীর নুরুদ্দিন ছাহেব এসে দুদো মাতালকে কলা বাগান হতে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

অপর একটি ঘটনা– কুঞ্জপুর গ্রামের জনৈক জহুর মিস্ত্রি পীর ছাহেবের বাড়ীতে কাঠের কাজ করছিলেন। দেখা গেল এক খন্ড কাঠ কম পড়ে যাওয়ায় কাজ ব্যাহত হচ্ছে। মিস্ত্রি পীর ছাহেবকে নতুন কাঠ আনার জন্য অনুরোধ করলেন। পীর ছাহেব মিস্ত্রিকে বললেন, 'যাও আগামীকাল কাঠের ব্যবস্থা হবে।' পর দিন জহুর মিস্ত্রি দেখলো পীর ছাহেব কোন নতুন কাঠের ব্যবস্থা করেননি। তবে পীর ছাহেব ঐ কাঠ দিয়ে কাজ করতে আদেশ করেন। পীরের নির্দেশ মতো মিস্ত্রি কাঠ পরিমাপ করে দেখলেন, কাঠ খন্ড প্রয়োজন মাফিক দৈর্ঘে রয়েছে– কোনো আর কমতি পড়েনি।"

পীর নুর উদ্দিন সাহেব ১৯৭৬ সালে বড়নাল গ্রামে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মৌলভী ইয়াকুব আলী মোল্লা

ইয়াকুব মোল্লা কালিয়া উপজেলার বাঐসোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত দেওয়ান ঘোরন শাহ ফকিরের বংশধর। তাঁর সম্বন্ধে মহসিন হোসাইন বলেন, "ইয়াকুব মোল্যা বাঐসোনা গ্রামের দেওয়ান ঘোরন শাহ ফকিরের উত্তর বংশধর। মৌলভী ছাহেব আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি বাঐসোনা মিনেদের বাড়ীর সামনে নড়াগাতি নদীতে 'গজগীর' ভাসিয়ে লোকদের গজগীর দেখিয়েছেন এবং গজগীরের সংগে আলাপ করেছেন। বেশ কাল আগেই ইয়াকুব মোল্যাহ মৃত্যু বরণ করেছেন। তার পুত্র খুলনা বারের আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ মৌলভী তৈয়াবুর রহমান মোল্যা।"

গরীব উল্লাহ শাহ্ সরদার

গরীব উল্লাহ শাহ্ কালিয়া উপজেলার বাঐসোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর ভুসম্পত্তির মালিক ছিলেন। এলাকায় গাতিদার হিসেবে গরীব উল্লাহ শাহ পরিচিত ছিলেন। অন্য দিকে তিনি ছিলেন একজন কামিল পীর ও ইসলাম প্রচারক। কলাবাড়ীয়া ইউনিয়নের গরীবপুর নামক গ্রামটি এই গরীব উল্লাহ শাহের নামানুসারে হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, অতি সম্প্রতি কালিয়ার প্রভাবশালী হিন্দুরা গ্রামটির নাম বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তারা ঐ গ্রামের নাম বলে থাকে গৌরীপুর।

তারা চাঁদ ফকির

মনিরামপুর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের পাথর ঘাটায় অনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তারা চাঁদ ফকির জন্মগ্রহণ করেন। অবস্থানগত দিক থেকে নওয়া পাড়া পাজিয়া রোডে ১০/১২ মাইল ভেতরে গেলেই রাস্তার পাশে কুমার ঘাটা অবস্থিত। কুমার ঘাটার হাটখোলার ধারে ফকিরের ভিটায় রয়েছে এই মহাত্মার কবর। কবরটি কাঁচা কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ২০০ বছর গত হয়ে গেলেও কবরটি এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

তারা চাঁদ ফকির প্রভূত বিষয় সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলে গাতিদার হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তবে সব পরিচয়কে পিছে ফেলে, যে পরিচয়ে আজও তিনি বেঁচে আছেন তা হল– তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন একজন

www.pathagar.com

কামিল দরবেশ ও মহান ইসলাম প্রচারক।

ফকির বংশের অন্য আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি হলেন, আফতাব ফকির। আফতাব ফকির এ অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত আলেম ও দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক।

অপরদিকে ফকির বংশের কুখ্যাত সন্তান ছিলেন নেছার উদ্দিন ফকির। তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের ত্রাস নেছার ডাকাত। ডাকাতি করার কারণে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। অবশ্য ১২ বছর পর তিনি মুক্তি পান। তবে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যান। অর্থাৎ আর কোন দিন তিনি ডাকাতি পেশায় ফিরে যাননি। শোনা যায় নেছার ডাকাত ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণধিসম্পন্ন মানুষ।

তারা চাঁদ ফকিরের মাজারে ভক্তরা এখনো মাঝে মাধ্যে আনাগোনা করে।

মান্দার ফকির

কেশবপুর উপজেলার পাজিয়া ইউনিয়নের মান্দার ডাঙ্গা গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মান্দার ফকির জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সাধক ছিলেন। মান্দারডাঙ্গা গ্রামটির নামকরণ মান্দার ফকিরের নাম থেকেই এসেছে। এ গ্রামেই তাঁর মাজার রয়েছে।

মান্দার ফকিরের বংশধরেরা এখনো আছে এবং পীরের সিলসিলা বজায় রেখেছেন।

হযরত মওলানা মফিজুর রহমান

যশোর ঝিকরগাছা উপজেলার গাজীর দরগাহ স্থানটি একটি ঐতিহাসিক নাম। এ নামের সাথে জড়িয়ে রয়েছে গাজী-কালু-চম্পাবতীর নামের সৌরভ। তাঁদের পদচারণার স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে গাজীর দরগাহ। গাজীর দরগাহ্র পাশেই রয়েছে মুকুট রাজার রাজধানী ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণানগর। আজকের লাউজানিই পূর্বেকার ব্রাহ্মণানগর বলে জানা যায়। হযরত বড় খান গাজী অর্থাৎ গাজী কালু চম্পাবতীর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য গাজী প্রেমিকরা এখানে তাঁর নামে দরগাহ স্থাপন করে। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই এখানে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের আড্ডা শুরু হয় এবং তা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। পরবর্তীকালে বরিশাল জেলার ঝালকাটী থানার নওয়াপাড়া গ্রামের মওলানা মফিজুর রহমান এখানে এসে আস্তানা গাড়েন ও সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে উৎখাত করেন।

মওলানা মফিজুর রহমান বরিশালের নওয়াপাড়া গ্রামে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব তাহছীন উদ্দীন। মওলানা মফিজুর রহমান মরহুম হযরত মওলানা হাফেজ আব্দুর রব সাহেবের খলিফা ছিলেন।

মওলানা মফিজুর রহমান একজন উচুমানের আলেম ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি দেশ-বিদেশে ওয়াজ নছিহত করে বেড়াতেন। এই ওয়াজ নছিহত উপলক্ষে একদিন তিনি গাজীর দরগাহর নিকটস্থ ঝাউদিয়া গ্রামে আসেন এবং গাজীর দরগাহ সম্বন্ধে অবগত হন। তিনি জানতে পারেন গাজীর দরগায় প্রতি সপ্তাহে ২ দিন রোববার ও বৃহস্পতিবার নারী-পুরুষের মেলা বসে এবং বছরে ফাল্গুন-চৈত্র ২ মাস ব্যাপী মেলা বসে। তিনি আরো জানতে পারেন ভন্ড ফকিরদের দৌরাত্বের কথা, ইসলামের নামে নানা প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপের কথা। এরপর তিনি এলাকার লোকজনের সহযোগিতায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের দিকে এখানে একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং খুব বড় ধরনের ইছালে সওয়াবের ব্যবস্থা করেন। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত প্রকার কু প্রথা বিলুপ্ত হয়।

গাজীর দরগাহ মাদ্রাসাটি এখন একটি ফাজিল মাদ্রাসা এবং যশোরের একটি অন্যতম প্রধান মাদ্রাসা। এখানে একটি হেফজ খানাও আছে।

গত ১৯৯০ সালের ১৫ নভেম্বর এই মহান কর্মবীর হযরত মওলানা মফিজুর রহমান দেহত্যাগ করেন। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন।

গ্রন্থ পঞ্জী

১। ইসলামী বিশ্ব কোষ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন
২। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দেশ কাল সমাজ-মুহম্মদ আবূ তালিব
৩। বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান-মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী
৪। বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ-আ. ক. ম. জাকারিয়া
৫। যশোর পরিচিতি-আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত
৬। বাংলাদেশের সুফী সাধক- গোলাম সাকলায়েন
৭। বাংলাদেশে ইসলাম-আবদুল মান্নান তালিব
৮। যশোর জেলার ছড়া-নাসির হেলাল
৯। কালিয়া জেলার ইতিহাস-মোহসিন হুসাইন
১০। যশোর-খুলনার ইতিহাস-সতীশ চন্দ্র মিত্র
১১। যশোর জেলার কিংবদন্তী-হোসেন উদ্দীন হোসেন
১২। যশোরাদ্য দেশ-হোসেন উদ্দীন হোসেন

www.pathagar.com

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের ফলে বাংলার মুসলমানদের উপর নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী তাদের সর্বগ্রাসী জিহ্বা দিয়ে চেটে মুছে নেয় মুসলমানদের মান সম্ভ্রম। অথচ এ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরাই শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ, বিত্ত- বৈভব, জ্ঞান-বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই ছিল অনুসরণীয়। তাদের ৭০০ বছরের রাজত্বের স্মৃতি ছিল ঐতিহ্য মন্ডিত। রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো মুসলমানরাই অলংকৃত করে রেখেছিলো। কিন্তু নবাবের পতনের সাথে সাথে মুসলমানদের ভিত্তি যায় ধ্বসে। প্রতিবেশী হিন্দুরা এটাকে মহাসুযোগ ধরে নিয়ে ইংরেজদের সাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুসলমানদের উপর আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে।

ফলে মুসলমানদের জায়গা-জমি, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাত ছাড়া হয়। বিত্তবান মুসলমানরা পথের ভিখারীতে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (১৭৯৩ খৃঃ) ও লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির কারণে মুসলমানদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। জমিদারী, জায়গীরদারীসহ সকল কিছুই চলে যায় হিন্দুদের হাতে। এ ব্যপারে স্যার উইলিয়ম হান্টার তার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখেছেন, "১৭০ বছর পূর্বে বাংলার সম্ভ্রান্ত বংশীয় কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আজ তাদের পক্ষে ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ১৭৫৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে যে সুযোগ করে দেওয়া হল, সে পথ ধরেই একশ বছর পর অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে দিল্লীর মসনদ তাদের পদানত হয়। 'সিপাহী বিদ্রোহের' পরাজয় সমগ্র ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে ঠেলে দেয় এক চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। মূলতঃ এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল মুসলমানরা, তাই ইংরেজরা এবার মুসলমানদেরকেই প্রাণঘাতী শত্রু রূপে চিহ্নিত করলো। অপরদিকে হিন্দুরা তাদের হলো বন্ধু।

শুধু এখানেই শেষ নয়। ইংরেজ সরকারের ছত্র ছায়ায় খৃষ্টান মিশনারীরা মুসলমানদের অশিক্ষা ও দরিদ্রতার সুযোগে ধর্মান্তরের দৌরাত্ম চালাচ্ছিল চরম ভাবে।

"উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের সেই ঘোর দুর্দিনে বাংলার অখ্যাত পল্লীর এক সামান্য দর্জী মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ গর্জে উঠেছিলেন। বৃটিশ শাসকদের ছত্র ছায়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিতে এগিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, প্রকৃত মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তিকে ভয় করে না। বৃটিশ রাজশক্তির নিকট মাথানত না করে বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে সেদিন তিনি প্রচার করেছিলেন ইসলামের শাশ্বত বিপ্লবের বাণী;

www.pathagar.com

উজ্জীবিত করেছিলেন ধ্বংসের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া নির্যাতিত, নির্জীব মুসলিম সমাজকে। গদ্যে-পদ্যে অসংখ্য বই লিখে গ্রাম বাংলার গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য জনসমাবেশে দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন নবজীবনের আশার বাণী। বিশ শতকে বাংলা তথা উপমহাদেশ যে যুগান্তকারী ইসলামী রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করেছিল, তার পিতৃপুরুষ ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ এ কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে।"

বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ মোতাবেক ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর, সোমবার দিবাগত রাতে যশোর জেলার অন্তর্গত ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে এই মহান মনিষী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্সী ওয়ারেছ উদ্দীন যশোর থেকে চার মাইল পশ্চিমে ছাতিয়ানতলা গ্রামে বসবাস করতেন।

মরহুম মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (রঃ) ছয় মাস বয়স কালে পিতৃগৃহে আনীত হন। কিন্তু শৈশব কালেই তিনি পিতৃহারা হন। আর সে জন্যেই শিক্ষা গ্রহণের প্রচন্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা হয়ে ওঠেনি। কিশোর বয়সেই রোজগারের পথ বেছে নিতে হয় তাঁকে। প্রথমে তিনি যশোর জেলা পরিষদে একটা ছোট চাকরি পান কিন্তু স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণেই তিনি সে চাকরি ছেড়ে দেন এবং স্বাধীনভাবে দর্জির কাজ শুরু করেন। যতদূর জানা যায়, দর্জী কাজে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন ও সাফল্য লাভ করেন। যার কারণে জেলা প্রশাসক পর্যন্ত তাঁর খরিদ্দার ছিলেন। এমনকি সেই সূত্রে জেলা মেজিস্ট্রেট তাকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যান এবং দোকান করে দেন।

দার্জিলিং-এ কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি পুনরায় নিজ জন্মভূমি যশোরে ফিরে আসেন এবং যশোর দড়াটানাতে তাঁর পূর্বের দর্জীর দোকানেই কাজ শুরু করেন। কিন্তু এ সময় যশোর তথা সারা উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল ইসলাম ও তার নবী মুহম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়। তারা অশিক্ষিত এবং গরীব মুসলমানদেরকে নানা ছলাকলার মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করছিল। এমনকি খৃষ্টানরা এ সময় এত তৎপর হয়ে ওঠে যে, তারা হাটে, মাঠে, ঘাটে, শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে সভা-সমিতির মাধ্যমে তাদের ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রচারাভিযান চালাচ্ছিল।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ খৃষ্টান মিশনারীদের এ অপচেষ্টায় ব্যথিত হলেন। কাউকে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না দেখে নিজেই গর্জে উঠলেন তাঁর পূর্বসুরী সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, নওয়াব আব্দুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমূখ সংগ্রামী পুরুষদের মত। তিনি খৃষ্টানদের অনুকরণে নেমে পড়েন ইসলাম প্রচারের বন্ধুর পথে। বাংলা, বিহার, আসামের হাটে, মাঠে, গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরের সভা সমিতিতে খৃষ্টানদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন, তাদের প্রশ্নের জবাব দেন এবং ইসলামই যে মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে মানুষকে বুঝাতে থাকেন। ফলে টক্কর লাগে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক

www.pathagar.com

রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠক রত্নের (এইচ, জি, আর- Higher Grade Reader, এলাহাবাদ) সাথে।

জন জমিরুদ্দীন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'খৃষ্টীয় বান্ধব' নামে একটি মাসিকে 'আসল কোরআন কোথায়' শিরোনামে ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে জন সাহেব প্রমাণ করেন (?) আসল কুরআনের অস্তিত্ব কোথাও নেই। এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রবন্ধের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'সুধাকর' পত্রিকার ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধোকা ভঞ্জন' শিরোনামে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে। যা ধারাবাহিক ভাবে সুধাকরে (২০শে ও ২৭শে চৈত্র ১২৯৯ এবং ২রা বৈশাখ ১৩০০ সাল) প্রকাশিত হয়। এরপর জন জমিরুদ্দীন 'সুধাকর পত্রিকায়' একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন। উত্তরে মেহেরুল্লাহ 'আসল কোরআন সর্বত্র' এ শিরোনামে সুধাকরে অন্য একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন, যাতে মেহেরুল্লাহর পান্ডিত্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ পাওয়ার পর বিরোধী মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। জন জমিরুদ্দদীন নিজের অবস্থান সম্বন্ধে ভাবতে থাকেন, এক পর্যায়ে তিনি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ (রঃ)-এর হাতে বায়াত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুন্সী সাহেবের সহযোদ্ধা হিসেবে ইসলাম প্রচারে নেমে পড়েন। "এই সময়ে নিকোলাস পাদ্রী আঘোরনাথ বিশ্বাস, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার প্রমূখ খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকগণ মুন্সী মেহেরুল্লাহ (রঃ) সাথে তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"

তিনি যে শুধু খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধেই উঠে পড়ে লেগেছিলেন তা নয়, তাঁর নিজ জাতির ভেতর যে কুসংস্কার, অনাচার, কদাচার, কর্মহীনতা, আলস্যতা এসে বাসা বেঁধেছিল তার বিরুদ্ধেও তিনি বজ্র কঠোর ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে জনাব আসির উদ্দীন তাঁর একটি সভার বিবরণীতে বলেছেন, 'সভার প্রথম দিন দুই-তিন সহস্র ও দ্বিতীয় দিন তিন-চার সহস্রের উপর লোক সমবেত হইয়াছিল। তৎপর স্বনামধন্য বক্তা বাগ্মী কুলতিলক মুন্সী সাহেব মগরেবের নামাজ অন্তে দন্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্য কর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা মক্তব মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিল্প শিক্ষা, ধর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা সমিতির উপকারিতা বায়তুল মাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।"

এ সম্পর্কে শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর 'কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মেহেরুল্লাহর নানাদিকে উৎসাহ ছিল। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, উৎসাহ দিতেন কৃষি কাজ করার জন্য। তিনি বলতেন, মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে, কিন্তু তৈয়ারী করতে জানে না। পান খাইয়া অজস্র পয়সা নষ্ট করিতে জানে, কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করে। মুন্সী সাহেব মুসলমানগণের মিঠাইয়ের দোকান করিতে পানের বরজ তৈয়ার করিতে সর্বস্থানেই উৎসাহ দিতেন, তাঁহার চেষ্টা বহু স্থানেই ফলবতী হইয়াছিল।'

মুন্সী মেহেরুল্লাহ (রঃ)-এর শিক্ষার প্রতি ছিল অত্যন্ত দরদী মন। নিজে কম

www.pathagar.com

শিক্ষিত হয়েও তিনি শিক্ষা বিস্তারে আজীবন সাধণা চালিয়েছেন। তাঁর নিজ গ্রামের পাশে মনোহরপুর গ্রামে ১৩০৭ সালে সম্পূর্ণ প্রতিকুল পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করেন পীর মওলানা কারামত আলীর নামানুসারে 'মাদ্রাসায়ে কারামতিয়া'। এছাড়াও তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

মাতৃভাষার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। যারা মাতৃভাষাকে অবহেলা করতো তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, মাতৃভাষা বাংলা লেখা পড়ায় এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণাম কি সর্বনাশা তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল, মৎস, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাঁহারা যে কি সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

ব্যক্তিগত জীবনে মুন্সী সাহেব অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-আষাক, চাল-চলন কোন কিছুতেই তিনি আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। এ প্রসংগে তাঁর বন্ধু মুন্সী জমির উদ্দীন বলেন, "অপব্যয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। সামান্য পোষাক পরিধান করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন এবং সামান্য আহার করিতেন। দুঃখীর আর্তনাদ তিনি কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কখনও তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হয় নাই।"

তিনি জামায়াতে ইমামতী করা থেকেও দূরে থাকতে চেষ্টা করতেন। মূলতঃ অহংকারকে ভয় করার কারণেই তিনি ইমামতী থেকে দূরে থাকতেন। মুসলিম কওমের কল্যাণ কিভাবে হবে এটাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা। তাই বলে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। এ প্রসংগে হাবিবুর রহমান বলেছেন, "১৩০৮ সালের ২৮শে মাঘ তারিখে রংপুর শহরে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় হিন্দু মুসলমান সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মুন্সী সাহেব মরহুম ঐ সভায় গো হত্যা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হিন্দুরা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অন্তে স্থানীয় পন্ডিত মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বক্তার গলায় গলা মিলাইয়া তাহার শত শত প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

মেহেরুল্লাহ (রঃ)-এর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল খুবই প্রখর। অনেক সময় হিন্দু পন্ডিত ও খৃষ্টান পন্ডিত এবং তার্কিকগণ তাকে খাটো করার জন্য মেঠো ধরনের প্রশ্ন করতেন, তিনি এ প্রশ্নের উত্তরগুলো উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এমনভাবে দিতেন যে, প্রশ্ন কর্তারাই পড়তেন বিপদে। তা'ছাড়া বন্ধুদের রহস্যমূলক প্রশ্নের উত্তরও তিনি উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সুন্দর করে পেশ করতেন। তাঁর বন্ধু শেখ ফজলুল করীম সাহেব বর্ণিত একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি-তিনি বলেছেন, "কাকিনার সভায় ঘটনাক্রমে আমার নতুন বিলাতী জুতা জোড়া হারাইয়া যায়। আমি জনৈক বন্ধুর জুতা পায়ে দিয়া পথে আসিতে আসিতে মুন্সী সাহেবকে রহস্যচ্ছলে বলিলাম, যান আপনার বক্তৃতায় আজ কিছু হয় নাই। চুরি সম্বন্ধে আপনার কথা শুনিয়াও যখন চোরে আমার জুতা জোড়া

www.pathagar.com

লইয়া গেল, তখন কি করিয়া বুঝিব যে আপনার কথায় কাজ হইয়াছে?

মুন্সী সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেনঃ ভাই ওটি আমার দোষ নয়, আপনার কর্মের ফল। এই মাত্র আপনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আসিলেন আর আপনার নিজের পায়ে দামী বিলাতী জুতা। এই চোর উহা চুরি করিয়া আপনাকে এই উপদেশ দিয়া গেল যে, আগে নিজে বিলাসিতা ছাড়, তারপর অন্যকে ছাড়িতে উপদেশ দিও।"

সাহিত্যাঙ্গনে মেহেরুল্লাহর পদচারণা ছিল খুবই বলিষ্ঠ। যদিও তিনি সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। মূলতঃ তাঁর সাহিত্য ছিল সমাজের কুসংস্কার সমূলে উৎপাটন করা, খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার জবাব দেয়া, সর্বপ্রকার অন্যায়, অশ্লীলতা, বেহায়াপনাকে রোধ করা এবং শিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তিনি আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া কম করলেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সমকালীন সময়ে পাঠকনন্দিত হয়েছিল। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেছেন, "যদিও আমি ভাল বাংলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

সমকালীন সময়ে মুসলিম সাহিত্যিকদের সংখ্যাও ছিল খুব কম। যশোরের কবি গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার নিজ জেলায় মুসলমান লেখক তেমন কেহ ছিলেন, মনে পড়ে না। একজন অবশ্য ছিলেন তিনি ধর্ম প্রচারক হিসাবে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত বক্তাও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ সাহেবের নাম বাংলাদেশে মুসলমান সমাজে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।"

বর্তমানেও যেহেতু মেহেরুল্লাহ (রঃ)-এর লেখা সমানভাবে গৃহীত সেহেতু আমরা বলতে পারি তাঁর লেখা কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

তিনি নিজে লিখেই যে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন এমন নয়, তিনি সৃষ্টি করেছিলেন শক্তিশালী এক লেখক দল, যাঁরা পরবর্তীকালে স্ব স্ব নামেই খ্যাতি লাভ করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অগ্নিপুরুষ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শাহ মোহাম্মদ আব্দুল করীম প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

১৩১৪ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ট মোতাবেক ১৯০৭ সালের শুক্রবার মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইসলামী রেনেসাঁর এ পথিকৃত নিজ বাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা বাংলায় নেমে আসে শোকের ছায়া। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শোক প্রকাশ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধে। শোক প্রকাশ করতে গিয়ে 'ইসলাম প্রচারক' লিখেছিলঃ

"বঙ্গের সর্ব প্রধান বাগ্মী ও সমাজসেবক, মুসলমানদিগের উন্নতির পথ প্রদর্শক ও সমাজ সংস্কারক, মুসলমান কবি, গ্রন্থকার ও ধর্ম প্রচারক, সর্বজনপ্রিয় মুন্সী

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় মুসলমানের যে চূড়ান্ত ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার আর আশা নাই। আমাদের প্রাণের ভাই অকালে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, বাহুভগ্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমানগণ আর কাহার বক্তৃতা-সুধাপন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। কাহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে আত্মা চরিতার্থ করিবে। কাহার অমূল্য উপদেশমালা শ্রবণে সমাজ সেবায় গা ঢালিয়া দিবে। আমরা যে মহার্ঘ রত্ন হারাইয়াছি, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। মুন্‌শী সাহেবের অভাবে বঙ্গীয় মোসলেম আকাশ যেন গভীর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।"

সৈয়দ ইসমা'ল হোসেন সিরাজী তাঁর 'শোকোচ্ছাস' কবিতায় লিখেছিলেন–

যাঁর সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগনে মধুর লগনে পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিশ্বময় অন্ধকার।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ (রঃ) ছিলেন যুগের নকীব। তাঁর আগমন না ঘটলে হয়ত ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হত। সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা তাঁকে বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর প্রকৃত পথিকৃত হিসেবে নিঃসন্দেহে আখ্যায়িত করতে পারি। আমাদের উচিত এই মহান মনীষীর জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলন করা। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি এ দেশের মুসলিম জাগরণের অন্যতম অগ্রপথিক।

সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জীঃ

১। রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম–মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ
বা
(খৃষ্টান ধর্মের অসারতা)
২। মেহরুল এছলাম (এছলাম রবি)– ঐ
৩। বিধবা গঞ্জনা – ঐ
৪। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ
দেশ কাল সমাজ–মুহম্মদ আবূ তালিব
৫। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ–আবুল হাসনাত
৬। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ– মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী
৭। ছোটদের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ– জোবেদ আলী
৮। ছোটদের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ–দেওয়ান আব্দুল হামিদ
৯। ছোটদের সৈনিক মেহেরুল্লাহ– মুহাম্মদ জিলহজ আলী
১০। অগ্রপথিক (২ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ।। পৌষ ১৩১৪)– স/অধ্যাপক আব্দুল গফুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১১। দৈনিক সংগ্রাম
১২। হাদিয়ে কওম মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ (প্রবন্ধ) অগ্র পথিক–অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম

www.pathagar.com

যশোর জেলার প্রাচীন মসজিদ

ইসলাম যেমন আর দশটা ধর্মের মত কোন ধর্ম নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তেমনি ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের উপসানালয় বা ইবাদতগাহ্ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুসলমানদের ইবাদতগাহ্ মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার এবং একসাথে এত বিপুল মানুষের সমাগম পৃথিবীর অন্যকোন উপসানালয়ে কল্পনা করাও বিস্ময়ের ব্যাপার। মূলতঃ মুসলমানদের পুরা জীবনটাই মসজিদ কেন্দ্রিক। সর্ব মানবতার নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) এই মসজিদে বসেই ইসলামী রাষ্ট্রের সব কিছুই পরিচালনা করেছেন। এই জন্য মসজিদের সাথে অন্য ধর্মের উপসানালয়কে তুলনা করা অন্যায়।

মুসলমানদের কাছে পৃথিবীর প্রথম গৃহ ও মসজিদ হিসেবে যেটা স্বীকৃত সেটা হল বায়তুল্লাহ বা আল্লার ঘর কাবা। অবশ্য আল্লার রসূল (সঃ) এর হাতে প্রথম যে মসজিদ টি নির্মিত হয় সেটির নাম মসজিদুন্নববী। এই মসজিদটি ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদীনার 'কোবা' পল্লীতে নির্মাণ করা হয়। মক্কা থেকে মদীনায় প্রবেশ করে আল্লার রসূল প্রথমে এই স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং মসজিদটি নির্মাণ করেন।

'ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয় করাচী থেকে ৪০ মাইল অদূরে বামবোর নামক স্থানে।'[১] এরপর এ উপমহাদেশে মুসলমানদের বিস্তৃতির সাথে সাথে মসজিদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। 'ভারত উপমহাদেশে মসজিদ স্থাপত্যের প্রকৃত বিকাশ ঘটেছে দ্বাদশ শতাব্দীতে দাসবংশ প্রতিষ্ঠার পর। কুতুবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে কুয়াত-উল-ইসলাম এবং আজমীরে আড়াই-দি-কা-ঝোপড়া মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদ স্থাপত্যের সূচনা করেন।'[২] এ সমন্ধে কড রিংটন বলেন,'দিল্লীতে কুতুব-উল- ইসলাম ভারতে ইসলামী স্থাপত্যকলার সূচনা করে।'

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পূর্বেই বাংলাদেশে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছালেও কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এমন ইতিহাস আমাদের কাছে অনাবিস্কৃত ছিলো। তবে বখতিয়ার খিলজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এবং সেই সাথে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। যদিও কালের করাল গ্রাসে তার সবগুলির অস্তিত্ব আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হুগলী জেলার ত্রিবেনী মুসলিম শাসনের আওতায় আসে। পরবর্তী কালে সাতগাঁও এবং ছোট পান্ডুয়া মুসলিম অধিকারে আসে। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে

---

১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান-বাংলাদেশের মসজিদ, পৃঃ ২৩
২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

জাফর খান গাজী ত্রিবেনী দখল করেন এবং সর্ব প্রথমে বাংলাদেশে মসজিদ স্থাপত্যের সূচনা করেন। তিনি ত্রিবেনীতে যে মসজিদ স্থাপন করেন তা 'জাফর খান গাজীর মসজিদ' নামে পরিচিত।'[১] এরপর ছোট পাণ্ডুয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশালাকার (২৩১ফুটx৪২ ফুট) এক মসজিদ। যাতে রয়েছে ৬৩টি ছোট আকারের গম্বুজ।

কিন্তু "সম্প্রতি রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।'[২] 'কারবালায় নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের মাত্র আট বছরে ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিকের শাসনামলের এই মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। 'মজদের আড়া' নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশ ঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬´ x ৬´ x১ $\frac{১}{৪}$ আকৃতির বিশেষ ধরণের ইটগুলিতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালেমা তাইয়্যেবাসহ হিজরী ৬৯ সন লেখা আছে।'[৩]

ফকর উদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় গৌড়ের অধিপতি ছিলেন আলাউদ্দীন আলী শাহ। সুলতান আলাউদ্দীন শাহকে হত্যা করে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ সিংহাসন দখল করেন এবং ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী নামে স্বাধীন রাজবংশ কায়েম করেন। বাংলায় এ রাজবংশ দুইশত বছর তাদের রাজত্ব কায়েম রাখতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা তাদের করতলগত ছিল।

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ হযরত পাণ্ডুয়ায় একটি সুরম্য মসজিদ তৈরী করেন। তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ ভারত উপমহাদেশের অপূর্ব সৃষ্টি পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের নির্মাতা ছিলেন। তিনি দিনাজপুর জেলার দেবী কোট মোল্লা আতার দরগাহে ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সিকান্দার শাহেব মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আমলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। তিনি অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এমনকি তিনি মক্কা ও মদীনাতে মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ করেন।

---

১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান-বাংলাদেশের মসজিদ, পৃঃ ৩১

২. ১৯৮৬ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখের দৈনিক বাংলায় 'হিজরী ৬৯ সনের মসজিদ আবিষ্কার' শিরোনামে এ সংক্রান্ত প্রথম খবর প্রকাশিত হয়। এপর দৈনিক সংগ্রাম ও ইনকিলাব সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-বাংলা ও বাংগালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা, পৃঃ-১০৮।

www.pathagar.com

এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের ছন্দ পতন ঘটে। তাদের স্থানে রাজা গণেশের বংশ সমাসীন হয়। অবশ্য গণেশ পুত্র যদু ইসলাম গ্রহণ করে জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন। জালাল উদ্দীন তার রাজত্ব কালে অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।

১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে আবার ইলিয়াস শাহী বংশের হাতে বাংলার শাসনভার চলে আসে। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের এক পৌত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ক্ষমতা পূনঃদখলের নায়ক ছিলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে প্রচুর ইমারত নির্মাণ করেন। তার মধ্যে মসজিদ গুলিই উল্লেখযোগ্য। হুগলীর সাতগাঁ, ময়মনসিংহের ঘাগরা, ঢাকার বিনত বিবির মসজিদ তাঁরই তৈরী। তাঁর আমলেই হযরত উলুঘ খান জাহান আলী যশোর খুলনা অঞ্চলে আসেন এবং যশোর রাজ্যের খলিফাতাবাদ-এর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনামলে তিনি অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেন। এক বাগেরহাট অঞ্চলেই ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ করেন। যার অনেক গুলিই এখনো স্বমহিমায় দীপ্যমান। তাঁর সমন্ধে বলতে গিয়ে আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, 'সামান্য একজন শাসন কর্তা যে-সমস্ত কীর্তি রেখে গেছেন, তা একজন সম্রাটের পক্ষেও গর্বের বস্তু। সম্রাট শাহজাহানের কীর্তির সঙ্গে তাঁর কীর্তির তুলনা দিতে চাইনা। কিন্তু সামান্য একজন স্থানীয় শাসন কর্তা হয়ে তিনি যা করে গেছেন, তা সম্রাট শাহজাহানের কীর্তির সঙ্গে তুলনার যোগ্য।'[১]

যতদূর জানা যায় এই উলুঘ খান জাহান আলীই (রঃ) যশোর খুলনা অঞ্চলে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। অবশ্য তার পূর্বে এ অঞ্চলে হযরত বড় খান গাজী (রঃ) ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়। তবে তাঁর নির্মাণকৃত কোন মসজিদের কথা এখনো জানা যায়নি। হয়ত তাঁর তৈরী মসজিদ কালের গহবরে বিলীন হয়ে গেছে। যাই হোক-হযরত খান জাহান আলী (রঃ) কে আমরা এ অঞ্চলের প্রথম মসজিদ নির্মাতা হিসেবে মনে করবো। যতদূর জানা যায় খান জাহান আলী রাজা গণেশের পুত্র জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের সময়ই (১৪১৮-৩২খৃঃ) যশোর অঞ্চলে আসেন এবং দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন কর্তা নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহর সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪০ বছর ধরে এ অঞ্চলের শাসন কার্য পরিচালনা ও ইসলাম প্রচার করেন।

হযরত উলুঘ খান জাহান আলী বাগের হাট পৌঁছানোর আগে যশোরের বারবাজারে প্রথম আস্তানা গাড়েন এবং এ অঞ্চলে বেশ কিছু কাল ইসলাম প্রচার করেন।সেই সূত্রে বলা যায় বাগেরহাট অঞ্চলের মসজিদ নির্মাণের বেশ আগেই বারবাজারের মসজিদ ও অন্যান্য কৃতি নির্মিত হয়। এখন নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, যশোর-খুলনা তথা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম মসজিদ বারবাজারের গোড়া মসজিদ

---

১. আ, কা, মো, যাকারিয়া-বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ।

www.pathagar.com

সহ অন্যান্য মসজিদ। এরপর বাগের হাট পৌঁছাতে গিয়ে হযরত খান জাহান আলী পথিমধ্যে যে মসজিদ গুলি নির্মাণ করেন সে গুলিও সমসাময়িক সময়ে নির্মিত হয় বলে অনুমান করা হয়। এ ছাড়া যশোর অঞ্চলের অন্যান্য মসজিদ গুলো খান জাহান আলীর মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক ও ইসলাম প্রচারক দ্বারাই নির্মিত হয়।

গোড়া মসজিদ

ইসলামী স্থাপত্যের এক অনুপম ও ঐতিহাসিক নিদর্শন বুকে ধারন করে বারবাজারের গোড়া মসজিদটি দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকা–যশোর মহা সড়ক থেকে পশ্চিম দিকে রেল লাইন পার হয়ে গরুহাট ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হলেই কাচা রাস্তার বাম হাতে যে মসজিদটি পড়ে, তার নামই গোড়া মসজিদ। মসজিদ থেকে দক্ষিণ পূর্ব কোণে সামান্য দূরেই গোড়া পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে সান বাঁধানো ঘাট ছিল। আজও তার কিছু নিদর্শন দেখা যায়। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি বর্গাকার। প্রত্যেক বাহু প্রায় ৩০ ফুট লম্বা এবং ভেতরের দিকে ২০ ফুটলম্বা। ৫ ফুট প্রশস্ত দেয়াল। অষ্ট কোণাকৃতির ৪টি মিনার ৪ কোনে আছে। উত্তর ও দক্ষিণে ১টি করে ও পূর্ব দেয়ালে ৩টি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। পশ্চিম দেওয়ালে ৩টি মেহরাব। পোড়ামাটির ফলকে লতা পাতা ফল ইত্যাদির অলংকরণে মেহরাবগুলি খচিত। 'মসজিদের অভ্যন্তরে চার দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে ও দেয়াল ঘেঁষে ৪টি পাথরের স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের একমাত্র গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে উপুড় করা পেয়ালার আকৃতিতে নির্মিত গম্বুজটি ছিল দেখতে অত্যন্ত মনোরম।' গম্বুজের কেন্দ্র স্থলে দেড় দুই ফুটের মত ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। গত ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৫০ জন কর্মচারী প্রায় তিন মাস পরিশ্রমের পর ঐ ছিদ্র সারাতে সক্ষম হয়।

মসজিদের বাইরের দেয়ালেও পোড়ামাটির চমৎকার অলংকরণ ছিল। পরবর্তীতে এগুলি ধবংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মেরামত করা হয়েছে।

জানা যায় মসজিদের চারদিকে পাচিল ছিল। মসজিদটির সামনের দিক ছাড়া বাকি তিন দিক এক পর্যায়ে মাটির ঢিবির নীচে চাপা পড়ে, পরবর্তীতে মাটি সরিয়ে ফেলা হয়। এখন এখানে নিয়মিত নামাজ পড়া হয়।

হযরত উলুঘ খান–ই–জাহান কতৃক নির্মিত বহু সংখ্যক মসজিদের এটি একটি। অবশ্য বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ গ্রন্থের লেখক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া মসজিদটি সমন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'গোরাই মসজিদের গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশল দেখে মনে হয় না যে এটি খান–ই জাহান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। বাগেরহাট অঞ্চলে তাঁর সময়ে নির্মিত মসজিদ গুলির স্থাপত্য কৌশলের সঙ্গে গোরাই মসজিদের স্থাপত্য কৌশলের খুব একটা মিল নেই। এটির দেয়াল মাত্র ৫ ফুট প্রশস্ত। খান–ই জাহানের কোন মসজিদের দেয়াল ৭/৮ ফুটের কম প্রশস্ত নয়। খান–ই

www.pathagar.com

জাহানের মসজিদ গুলির কোণে যে সমস্ত মিনার (turret) দেখা যায়, সেগুলি সবই গোলাকার। আর গোরাই মসজিদের মিনার গুলি অষ্ট কোণাকৃতির। গম্বুজের আকার ও ঠিক খান-ই জাহানী স্টাইলের নয়। এতে মনে হয়, এ মসজিদটি খান-ই জাহান কর্তৃক নির্মিত হয়নি। এটি খুব সম্ভব হোসেন শাহ্ কিংবা তাঁর পুত্র নসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[১]

সওদাগরের মসজিদ

ঐতিহ্যবাহী বারবাজারের সওদাগরের দীঘির পশ্চিম পাড়ে এ মসজিদটির অবস্থান ছিল। আজও দেড় দুই বিঘা জমি জুড়ে ইট বিছানো একটি টিবি রয়েছে। জঙ্গলাকীর্ণ এই টিবিটির উচ্চতা ১০/১১ ফুট। এই সওদাগর দীঘির আশে পাশে আরো কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন রয়েছে। এই দীঘিটির জলাশয় প্রায় ৩৬ বিঘা জমি জুড়ে।

জোড় বাংলার মসজিদ

গোড়া মসজিদ থেকে কিছুদুর পশ্চিম দিকে এগিয়েই রাস্তার ডান পার্শ্বে মাঝারী ধরনের একটি পুরাতন পুকুর দেখা যায়। এই পুকুরটির পশ্চিম পাড়ে সামান্য উচু দুটো টিবি চোখে পড়ে। টিবি দুটো ইটে পরিপূর্ণ। আয়াতনে এক একটা এক এক বিঘা জমি জুড়ে আছে। এই টিবি দুটোই জোড় বাংলা মসজিদ নামে পরিচিত। সাধারণত একই জায়গায় পাশাপাশি দুটি মসজিদের অবস্থান আমরা দেখিনা। এ জন্য অনেকেই মনে করেন, এর একটি মসজিদ অপরটি হুজরা খানা। মসজিদের পাশে হুজরা খানা এখনো তৈরী করা হয়। বিধায় এ যুক্তিই বেশী গ্রহণ যোগ্য। টিবি দুটো খনন করলেই প্রকৃত রহস্য বের হয়ে পড়বে।

গলাকাটির মসজিদ

গলাকাটির দীঘির দক্ষিণ পাড়ে এ মসজিদের অবস্থান একটি টিবি আকারে। অবস্থানগত দিক থেকে গোড়া মসজিদ থেকে উত্তর পশ্চিম কোনে ২০০ গজ মত এবং রাস্তা থেকে ১০০ গজের মত উত্তরে অবস্থিত। গলা কাটির দীঘিটি একটি মাঝারী ধরনের জলাশয়। এর জলাকার ৫ বিঘার মতন।

যে টিবিটিকে স্থানীয় জনগণ গলাকাটির মসজিদ বলে থাকে। তার প্রত্যেক বাহু ২৫ ফুট লম্বা এবং উচ্চতা ৮ ফুট। টিবিটির সম্পূর্ণই প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। এখানে বেশ কিছু বড় বড় পাথর এখনও দেখা যায়। টিবির চুড়ায় দুটি কাল পাথর মুখ বের করে আছে। পাথর দুটি দেখতে গোলাকার ধরনের। ব্যাস ১ ফুটমত হবে। একটি থেকে

১. আ, কা, মো, যাকারিয়া-বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, পৃঃ-৩১৯-২০।

www.pathagar.com

অপরটির দূরত্ব ৮ফুট। পাথরের উপরি ভাগে ১$\frac{১}{২}$'' X ৩'' গভীর ছিদ্র আছে। অনেকের ধারণা এই পাথরের উপর আরো পাথর যুক্ত ছিল এবং স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহৃত ছিল। হয়তবা এই স্তম্ভের উপর ছিল মসজিদের ছাদ।

গলাকাটি নামের কারণে অনেকে এটাকে কালি মন্দির মনে করেন। তাদের ধারণা এ মন্দিরে হয়ত বলি দেওয়া হত এবং সেখান থেকেই দীঘির নাম হয়েছে গলাকাটির দীঘি। কিন্তু অন্যরা মনে করেন–সম্ভবতঃ এ দীঘিতে কোন মানুষকে গলাকেটে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিলো, সেখান থেকে এ নাম করণ হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক শতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে এটিকে মসজিদ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

চেরাগদানি মসজিদ

বারবাজার শহর থেকে ১ মাইল পশ্চিমে চেরাগদানী গ্রাম। চেরাগদানী গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় বেশ বড়সড় একটি দীঘি। উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই দীঘিটির নাম চেরাগদানী দীঘি। চেরাগদানী দীঘির দক্ষিণ পাড়ে চেরাগদানী মসজিদ অবস্থিত।

'বর্গাকারে নির্মিত মসজিদের প্রত্যেক বাহু ভিতরের দিকে ছিলো প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ। দেয়াল গুলি ছিলো প্রায় ৪ $\frac{১}{২}$ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ভগ্নাবশেষ মাটির উপর প্রায় ৩/৪ ফুট উচু অবস্থায় এখনো টিকে আছে। পূর্ব দেয়ালে অতি সামান্য অংশ ছাড়া বাকী সম্পূর্ণ দেয়াল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশের পথ ছিল। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ছিলো তিনটি মেহরাব। গম্বুজ খুব সম্ভবত একটিই ছিলো। বর্তমানে মসজিদের অভ্যন্তরে সাময়িক জুম্মাঘর নির্মিত হয়েছে। সেখানে রীতি মত নামাজ হয়।'[১]

সাত গাছিয়া মসজিদ

এটি লোহার শলা দীঘির পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। বিরাট আকারের ঢিবি থেকে ১৯৮৩ সালে স্থানীয় জনগণ খননের মাধ্যমে আবিষ্কার করেছে। ঢিবির সামান্য অংশই খনন করা সম্ভব হয়েছে। এই সামান্য অংশ থেকেই ১৬ থাম বিশিষ্ট একটি চমৎকার মসজিদের অংশ বের হয়েছে। মেঝে এখনো মোটামুটি ভাল আছে। এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ। দিনের বেলায়ও কেমন ভয় ভয় করে।

ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র বারবাজারের ঐতিহাসিক নিদর্শন, বিশেষ করে পুকুর এবং ঢিবি গুলোকে হিন্দু ও বৌদ্ধ কৃত্তি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যেমন

১. যশোর পরিচিতি– ৫ম সংখ্যা।

www.pathagar.com

লোহারশলা পুকুর সমন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেনে, 'বারবাজারের ৩/৪ মাইল বিস্তৃত ইষ্টক স্তুপে পরিপূর্ণ। পশ্চিম দিকে কতকগুলি ১০/১২ হইতে ১৫/১৬ ফুট উচ্চ প্রকান্ড ভগ্ন স্তুপ রহিয়াছে। উহার কোনটি অশোকের স্তুপ হওয়া অসম্ভব নহে। লোহাশলা নামে একটি পুকুর আছে, উহার সন্নিকটে কোন লৌহ স্তম্ভ থাকিতেও পারে। হয়ত স্তম্ভের চতুঃপার্শ্বে খনন করিয়া তাহাকে এই পুস্করীনিতে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছিলো। কোথাও উচ্চ ঢিবি, কোথাও অট্টালিকার ভগ্ন চিহ্ন, প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এবং প্রস্তর স্তাম্ভাদি ও সর্বত্র বিস্তৃত ইষ্টক খন্ড বারবাজারকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানের মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে।'[১]

বারবাজার মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সতীশ বাবুর ধারণা ঠিক হয়নি, অশোকের স্তুপের বদলে ঢিবি থেকে বের হয়েছে মসজিদ। এ পর্যন্ত এখানে কোন মন্দির আবিষ্কার হয়নি। ভগ্ন স্তুপ থেকে এ পর্যন্ত মসজিদই আবিস্কার হয়েছে বা মসজিদের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এলাকার মানুষের স্থির বিশ্বাস প্রত্যেকটি দীঘি ও বড় পুকুরে শান বাঁধানো ঘাট ছিল এবং কোন না কোন পাড়ে ছিল মসজিদ। যে ঢিবিগুলো এখনো কালের স্বাক্ষী হয়ে টিকে আছে। এ গুলি সরকারী ব্যবস্থাপনায় খনন করলে অনেক মসজিদের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

গোড়া মসজিদ সহ অন্যান্য স্থানে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে বা এখানে ওখানে অব্যবহারিত অবস্থায় পড়ে আছে। সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন, 'বারবাজারে স্থানে স্থানে কতকগুলি পাথর পড়িয়া আছে, উহা বৌদ্ধ আমলের প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। উপরোক্ত গোড়ার পুকুরের পশ্চিম দিকে যে অভগ্ন মসজিদ এখন ও দন্ডায়মান আছে। তাহার প্রাচীর গাত্রে চারি খানি প্রস্তর স্তম্ভ গাঁথুনির ভেতর প্রবেশ করানো রহিয়াছে। এই মসজিদের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে একটি প্রস্তর স্তম্ভ মাটিতে পোতা রহিয়াছে।

৩´´-৮´´ মাত্র বাহিরে আছে, অধিকাংশই মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত বলিয়া বোধ হয়। এই স্থান হইতে আরও পশ্চিম দিক যাইতে পথের কাছে এক খানি ১´ – ৯´´ x ১´ – ৯´´ পরিমিত সুন্দর কালো পাথরের পাদপীঠ পড়িয়া রহিয়াছে। চেরাগদানি পুকুরের পশ্চিম পাড়ে মসজিদের উপর এক খানি এবং গলাকাটি দীঘির দক্ষিণ পাড়ে মসজিদের উপর একখানি পাথর আছে। আরও কত জঙ্গলের মধ্যে আছে বা দূরবর্ত্তী স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। দেখিলেই বোধ হয়, এই হিন্দু বৌদ্ধ আমলের মঠ-মন্দিরের পাথরগুলি মুসলমানগণ সকল স্থানে কাজে লাগাইতে পারেননাই।'[২]

কিন্তু মিত্র মহাশয়ের সাথে এ ব্যাপারে আমরা এক মত হতে পারছিনা। কারণ হযরত উলুঘ খান জাহান আলী বাঘের হাট এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, ষাট গম্বুজ মসজিদ সহ যে মসজিদ গুলি তৈরী করেছেন সে গুলিতেও প্রচুর পাথরের স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন বারবাজারের পাথরগুলি যদি হিন্দু বৌদ্ধ আমলের মঠ

১. সতীশ চন্দ্র মিত্র-যশোর খুলনার ইতিহাস।
২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

মন্দিরের হয়ে থাকে, তাহলে বাগের হাটের মসজিদে ব্যবহৃত পাথর গুলি কোথা থেকে আসলো?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ পাথর গুলি হযরত উলুঘ খান জাহান আলী পানি পথে এনে তাঁর প্রয়োজন মিটিয়েছেন। বারবাজারের মসজিদ গুলি হযরত উলুঘ খান জাহান আলী (রঃ) এর তৈরী।

শেখ পুরা মসজিদ

কেশবপুর উপজেলার শেখপুরা মসজিদটি সাড়ে ৩শ' বছরের পুরানো ইসলামী স্থাপত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির স্থাপত্য কৌশল অত্যন্ত মনোরম। কারুকার্য খচিত ও ইসলামী রীতি অনুসৃত মসজিদটি পূরাকীর্তির এক অনুপম নিদর্শন। এতে ব্যাবহৃত ইটগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির। আরবের একজন ইসলাম প্রচারক সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ্ (রঃ) ১৬৩৭ সালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাক ভারত উপমহাদেশে আসেন। জানা যায় এক পর্যায়ে তিনি কেশবপুর উপজেলার শেখপুরায় এসে আস্তানা গাড়েন। তিনিই এ ঐতিহাসিক মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা যায়। মসজিদটি সম্পর্কে যশোরের তরুণ সাংবাদিক হারুনুর রশিদ ১২ পৌষ ১৩৯৬ সংখ্যা দৈনিক সংগ্রামে লিখেছেন–

'মসজিদটির স্থাপত্য কৌশল অত্যন্ত কারুকার্যের স্বাক্ষর বহন করে। ইসলামী রীতি অনুসৃত কারুকার্য পূরাকীর্তির এক অপূর্ব নিদর্শন। গম্বুজ দিয়ে ঢাকা এই মসজিদটির আলাদা কোন ছাদ নেই। ক্ষুদ্রাকৃতির ইট দিয়ে গাঁথা দেওয়াল গুলো অত্যন্ত শোভামন্ডিত। কিন্তু ইসলামী স্থাপত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটি অযত্ন, অবহেলায় আজ ধ্বংসের পথে। মসজিদ কমিটির সভাপতি জানান, এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগ এবং বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা আশ্বাস দিলেও আজও কেউ বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

লোনা লেগে ইট, চুন, সুড়কী ক্ষয় হতে হতে মসজিদটি এখন স্বকীয়তা হারিয়ে বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।'

শৈলকূপা মসজিদ

বৃহত্তর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমান ঝিনাইদহ জেলা) শৈলকূপা উপজেলার কুমার নদীর তীরে এ মসজিদের অবস্থান। জায়গাটির নাম দরগা পাড়া। উত্তর–দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদটির দেয়াল গুলির প্রশস্ততা প্রায় ৫$\frac{১}{২}$ ফুট। ভেতরের আয়াতন ৩১$\frac{১}{২}$ x ২১ ফুট মত। ৪টি মিনার বা টারেট চার কোণে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গোলাকার এবং বলয় আকারের ব্যান্ড দিয়ে এগুলি অলংকৃত করা হয়েছে। এটি সুলতানী আমলের স্থাপত্য কলার এক অপূর্ব নিদর্শন।

মসজিদে মোট ৫টি প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের সামনের দিকে অর্থাৎ পূর্ব

www.pathagar.com

দিকে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ১ টি করে ২টি প্রবেশ পথ দেখা যায়।

সামনের তিনটি দরজার মাঝখানেরটির দুপাশে দুটি সরু মিনার আছে। মসজিদের ভেতরের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মেহরাব আছে। মাঝেরটি আকারে বড়। মসজিদের ভেতরে ৫ ফুট উচু দুটি খাম্বা বা থাম রয়েছে। ৬ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি খুব বেশী বড় নয়।

মসজিদটিতে কোন শিলা লিপি নেই। তবে মসজিদের নির্মাণ কৌশল ও স্থানীয় জন শ্রুতি থেকে নিঃসন্দেহে ধারনা করা যায় যে, মসজিদটি সুলতানী আমলে তৈরী। স্থানীয় জনশ্রুতিতে আরো জানা যায় মসজিদটি নির্মাণ করার জন্য সুলতান নশরত শাহ, শাহ মোহম্মদ আরিফ বা আরব (রঃ) কে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছিলেন।

মসজিদটি সম্পর্কে খান সাহেব আবদুল ওয়ালি এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় লিখেছিলেন ———

As to the origin of the Masjid (Called in Imperial Farmaus Masjid-i-jamia or Cathedral mosque), it is stated that King Nasir shah, son of Hussain Shah of Bengal, while travelling from Gaur on his way to Dacca came to Mauja Shailakupa, With Nasir shah were Hajrat Maulana Muhammad Arab, a reuowned Darvish and Murshid (Spiritual guide) of the King ; Hakim Khan, a pathan, Saiyid shah Abdul Qadir-i-Baghdadi, and a fakir. The Maulana on, seeing the village was very much delighted and said, Èl like this place. I will inhabit here.' The above mentioned three persons who were the disciples of the Maulana wished also to remain with their Murshid at Shailakupa. Nasir Shah consented to this, and left his Wazir shah Ali in the service of the pir. The King grauted a few bighas of lakhiraj land and was pleased to call the Mauza Nasirpur after his own name.[1]-

মীর্জানগর মসজিদ

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সফশি খান যশোরের ফৌজদার নিযুক্ত হন. মোঘল ফৌজদারদের আবাস স্থল ছিল কেশব পুর থেকে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ত্রিমোহিনীর নিকট মীর্জা নগরে। ফৌজদার সফশি খান মীর্জানগরে গড়ে তোলেন অট্টালিকার পর অট্টালিকা। আজও মীর্জা নগরের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ সফশি খানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সফশি খান ছিলেন তৎকালীন আমলের বাংলার সুবেদার (১৬৩৯–৬০ খৃ) শাহ শুজার শ্যালক পুত্র।

1. Journal of the Asiatic Society of Bengal 1901, Pp, 15-28. Khan saheb abdul Wali.

www.pathagar.com

সফশি খান আবাস গৃহের ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অট্টালিকার সাথে তৈরী করেন একটি সুরম্য মসজিদ। মসজিদের গম্বুজ গুলি এখনো টিকে আছে। মসজিদটি ছিল উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। ভিতরের আয়তন ছিল ৫০x১৪ফুট ।৪ফূট প্রশস্ত ছিল দেয়াল গুলি। ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির মোট ৫টি দরজা ছিল। ৩টি দরজা পূর্ব দেয়ালে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে আরো ২টি দরজা ছিল। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মেহরাব ছিল। মাটি থেকে গম্বুজের উচ্চতা ছিল ২২ফূট। অজু করার জন্য মসজিদের সামনে একটি চৌবাচ্চা ছিল। এখানে কয়েকটি কবর ছিল। প্রাচীর বেষ্টিত এ মসজিদের দক্ষিণ দিকে এক একটি কবর স্থানও ছিল। বর্তমানে এসবের কোন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

মীর্জনগর অঞ্চলে খান-ই- জাহানের খননকৃত অনেক দীঘি দেখা যায়।

শুভরাঢ়া মসজিদ

অভয় নগর উপজেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কয়েক মাইল ভেতরে ধূলগ্রাম অবস্থিত। এই ধূলগ্রাম থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে ভৈরব নদীর তীরে শুভরাঢ়া মসজিদের অবস্থান। বর্তমানে মসজিদটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। এর বাহিরের আয়তন ২৮´-৬´´ x ২৮´-৬´´ এবং ভেতরের আয়তন ১৬´-১০´´ x ১৬´-১০´´ অর্থাৎ মসজিদটি বর্গাকারে নির্মিত ছিল। দেয়ালগুলির প্রশস্ততা ৫$\frac{১}{২}$ ফুট ।মোট ৩টি দরজা পূর্ব ,উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে। দরজা গুলি পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে তৈরী। এ মসজিদটিতে ভিতরের পশ্চিম দেয়ালে একটি মাত্র মেহরাব। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির কার্ণিশ বাঁকা করে তৈরী। গম্বুজটি উন্টান পেয়ালাকারে নির্মিত। যা খান জাহান আলীর স্থাপত্য শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গঠন পদ্ধতিও তাই বলে।

এখানে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় হযরত উলুঘ খান জাহান আলী বারবাজার থেকে বাগেরহাট যাওয়ার পথে মুড়লি কসবা হয়ে পয়োগ্রাম কসবা গিয়েছিলেন। যখন তিনি পয়োগ্রাম কসবা পৌছেন তার পূর্বে শুভরাঢ়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দেন এবং এ মসজিদটি তৈরী করেন।

কায়েমকোলা মসজিদ

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম কায়েমকোলা। যশোর শহর থেকে কাশীপুর সীমান্তে যে রাস্তাটি গেছে সে রাস্তা ধরে ৫ মাইল গেলেই কায়েমকোলা গ্রাম। অপরদিকে ঝিকরগাছা শহর থেকে যে রাস্তাটি চৌগাছা উপজেলা শহরে গেছে সেটি ধরেও ৫মাইল গেলে কায়েমকোলা গ্রাম। এক সময় এ গ্রামের পাশ দিয়েই খরস্রোতা মুক্তেশ্বরী নদী প্রবাহিত ছিল। আজ নদীটি মৃত। এ গ্রামের পাশের গ্রামের নাম মাগুরা। ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত পত্রিকা 'অমৃতবাজার' এর সম্পাদক সাংবাদিক-সাহিত্যিক শিশির কুমার ঘোষের জন্ম স্থান এ মাগুরা গ্রামে।

www.pathagar.com

এখনো তাঁদের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

কায়েমকোলা গ্রামটিতে প্রায় ১৫হাজার লোকের বাস। বর্তমানে এখানে একটি হাইস্কুল,একটি প্রাইমারী স্কুল, কয়েকটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও একটি বিরাট গ্রাম্য–বাজার আছে।

তবে গ্রামটি প্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ ছিল, তার প্রমাণ আলোচ্য মসজিদটি। মসজিদটি অবস্থানগত দিক থেকে যশোর কাশীপুরও ঝিকরগাছা– চৌগাছা রাস্তার সংযোগ স্থলের পাশেই অবস্থিত। ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির আয়াতন (৩৩$\frac{১}{২}$ X১৩) হাত । মিনার বিহীন মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ২$\frac{৩}{৪}$ হাত । অবশ্য দেয়ালের অনেক স্থানে লোনা লেগে ক্ষয়ে গেছে। যদি দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা না হয়, তা' হলে যে কোন মুহূর্তে এ ঐতিহাসিক মসজিদটি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। মসজিদটিতে সামনের দিকে তিনটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। ভেতরের পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে একটি মেহরাব।

মসজিদটি কবে কে তৈরী করেছিলেন তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। তবে ধারণা করা হয় সুলতানী আমলেই মসজিদটি তৈরী হয়ে থাকবে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, ধ্বংসের হাত থেকে এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি বাঁচাতে হলে, বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্বাবধানে নিয়ে নেয়া জরুরী দরকার।

সিংহদা আওলিয়া জামে মসজিদ বা খানায়ে খোদা মসজিদ

বৃহত্তর যশোর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন কালীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সিংহদা মৌজায় অবস্থিত। এর সি, এস দাগ নং–১০৩৪। অবস্থান গত দিক দিয়ে যশোর–ঢাকা মহাসড়কের নিমতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। সামান্য দূরেই অবস্থিত গাজী কালু চম্পাবতী ও হযরত উলুঘ খান জাহান আলীর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বারবাজার নগরী। মসজিদটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে চিত্রা নদী। স্থানীয় জনগনের কাছে মসজিদটি 'খানায়ে খোদা মসজিদ' নামে পরিচিত। খোদায় কৃত মসজিদটির উপর টিনের চাল দিয়ে বর্তমানে স্থানীয় লোকজন নামাজ আদায় করে থাকেন।

মসজিদটি কবে কে তৈরী করেন তার কোন প্রমাণ মেলে না। তবে গঠনশৈলির দিক দিয়ে মসজিদটি পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। যতদুর জানা যায় মসজিদটি কোন প্রখ্যাত আওলিয়ার দ্বারা নির্মিত। আর সে জন্যই মসজিদটির নাম হয়েছে আওলিয়া জামে মসজিদ। অবশ্য এ ধারণাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, হযরত খান জাহান আলীর কোন যোগ্য শিষ্যই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। কারণ সামান্য দূরেই ঐতিহাসিক বারবাজার নগরী অবস্থিত। যেখান থেকে হযরত খান জাহান আলী এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

মূল মসজিদের উত্তর দক্ষিণে একটি করে দুটি ও পূর্ব দিকে তিনটি মোট পাঁচটি

www.pathagar.com

দরজা আছে। মসজিদের বারান্দার উত্তর দক্ষিণে একটি করে দুটি ও পূর্ব দিকে তিনটি, এখানে মোট পাঁচটি দরজা রয়েছে। বুরুজগুলো ব্যতিরেকে চার কোণার অষ্ট কোণাকার মসজিদটির বহির্ভাগের পরিমাপ ১১ মিটার পূর্ব পশ্চিমে ৭.৬০ মিটার x ৭.৬০ মিটার উত্তর দক্ষিণে। ৬.৩৫ মিটার বার্গাকার মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগ। ৬.২৫ মিটার x উত্তর দক্ষিণে ১.৭৫ মিটার পূর্ব পশ্চিমে বারান্দাটির অভ্যন্তর ভাগ। মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগের কিবলা দেওয়ালে দুটি অর্ধ বৃত্তাকার মিহরাব আছে। এ সম্বন্ধে জনৈক খন্দকার আলমগীর দৈনিক সংগ্রামের কোন এক সংখ্যায় লিখেছেন– "মসজিদের অভ্যন্তরে পোড়া মাটির ফুল ও লতা পাতার নকশাযুক্ত অলংকরণ আছে। মধ্যবর্তী মিহরাবের উত্তরদিকে মিহরাবের পরিবর্তে খাড়া একটি বদ্ধ প্যানেল দেখা যায়। মসজিদটির প্রার্থনা কক্ষের উপরে বড় একটি অর্ধবৃত্তাকার গুম্বজ ছিল বলে অনুমান করা যায়। বারবাজারের গোড়ার মসজিদ ও সুলতানী আমলের অন্যান্য মসজিদের সহিত এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অর্ধ বৃত্তাকার মিহরাব গুলোর দু'দিকে একটি করে লম্বমান অন্তঃপ্রবিষ্ট প্লাষ্টার আছে। দক্ষিণ দিকের মিহরাবটির উপরি ভাগ বহুখাঁজ বিশিষ্ট। দক্ষিণ দিকের মিহরাবটি জ্যামিতিক নকশা যুক্তএকটি আয়াতাকার ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ। মধ্যবর্তী মিহরাবটি ফুল ও লতা পাতার নকশা যুক্ত আয়াতকার ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের দেওয়াল গাত্রে প্রতিদিকে দুটি ... মোট ছয়টি লম্বমান অন্তঃপ্রবিষ্ট প্লাষ্টার আছে। অভ্যন্তর ভাগের কিবলা দেওয়াল ২.৩০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত মূল অবস্থায় দন্ডায়মান। মসজিদের পূর্ব দক্ষিণের প্রবেশ পথের উপরে একটি কৌণিক খিলান অদ্যাবধি অক্ষত আছে।"

জনসাধারণ কতৃক মসজিদটি উদ্ধারের সময় খনন কাজ চালাতে গিয়ে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মসজিদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এখনো বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ কতৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি।

———— ০ ————

www.pathagar.com

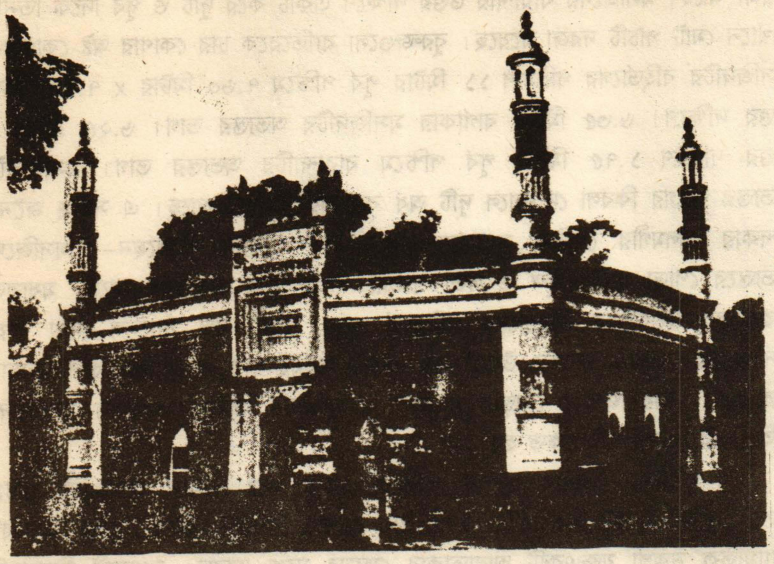

শৈলকুপা মসজিদ, যশোর

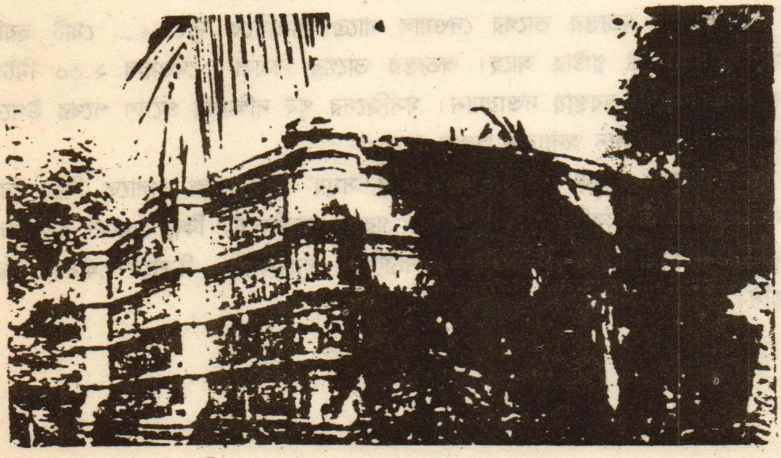

বারবাজার গোড়া মসজিদ, যশোর

www.pathagar.com

যশোরের মুসলিম মনীষী

যশোরের মুসলিম মনীষীদের তালিকা বিশাল এবং বিস্তৃত। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে গেলেও প্রয়োজন বড় ধরনের একটি গ্রন্থের। কিন্তু আমাদের সে সুযোগ না থাকায় শুধুমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দু'কথা বলার চেষ্টা করব, যাদের কথা না বললেই নয়। এ গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন ও রাখছেন তঁদের নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। আলোচিত ব্যক্তিত্বরা উল্লেখিত কোন না কোন অংগণেরই হবেন। তবে যশোর যেহেতু কবি সাহিত্যিকদের পূণ্যভূমি সে জন্য তাঁদের পাল্লাটাই হবে ভারী।

লালন শাহ (১৭৭২—১৮৯০)

বিশ্ববিখ্যাত মরমী সাধক দার্শনিক কবি লালন শাহ–এর পরিচিতি প্রতিদিন বিস্তৃত হচ্ছে। একজন অশিক্ষিত অজ পাড়াগেঁয়ে মানুষ কিভাবে নিজের যোগ্যতা গুণে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন তার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষী তিনি। 'দার্শনিক কবি লালন শাহ একশো বছর পূর্বে এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু শতবর্ষ পূর্ণ হল। আজো তাঁর কীর্তি, তাঁর অবদান অম্লান। বরং তাঁর যশ–খ্যাতি বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। জীবনকালেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর দর্শনে অভিভূত হয়ে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অসামান্য কবি ব্যক্তিত্ব বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভ্রাতা জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে বোটে ১২৯৬ সালের ২৩ শে বৈশাখ তারিখে তাঁর একটি স্কেচ অংকন করেছিলেন। সমকালীন অন্যান্য সাহিত্য সাধকগণও লালনকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন।'

'যশোর জিলাবাসীদের গৌরব এই যে, সাধক কবি লালন এই জিলারই সুযোগ্য সন্তান ছিলেন।'

বাংলা ১১৭৯ সালের ১লা কার্তিক মুতাবিক ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর ঝিনাইদহ (বর্তমান জেলা) মহকুমার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিষপুর গ্রামে লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দরিবুল্লাহ দেওয়ান, মাতার নাম আমিনা খাতুন এবং দাদার নাম গোলাম কাদির দেওয়ান। লালনরা ছিলেন তিন ভাই, অপর দু'জনের নাম আলম ও কলম। লালন ছিলেনসবার ছোট।

www.pathagar.com

লালন শাহের প্রধান শিষ্য দুদ্দু শাহ'র লেখা থেকে তাঁর জন্ম পরিচয় ও মৃত্যু তারিখ স্পষ্ট জানা যায়। দুদ্দু শাহ লিখেছেন–

"এগারো' শো উনআশি কার্তিকের পহেলা
হরিষপুর গ্রামে সাঁইর আগমন হৈলা।
যশোর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয়
উক্ত মহকুমাধিন হরিষপুর হয়।
দরিবুল্লাহ দেওয়ান তাঁর আব্বাজীর নাম।
আমেনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।।
গোলাম কাদের হন দাদাজী তাহার।
বংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার।।
তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–
বারশত 'সাতানব্বই' বাংলা সনেতে
পহেলা কার্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে।
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল।"

–মৃত্যু তারিখ দাঁড়াচ্ছে বাংলা ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক মুতাবিক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দিবাগত রাতে।

লালন শাহের মৃত্যুর মাত্র ১০ বছর পর অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন শৈলকূপার সাবরেজিস্টার জনাব আবদুল ওয়ালী লালন শাহের জন্ম স্থান সমন্ধে 'On some Curious tenets and practices of certain class of Fakirs in Bengal' প্রবন্ধেলিখেছেন–

Another renowned and most melodious versifier whose dhuas are the rage of the lower classes and sung by boatmen and others, was far famed Lalan shah, he was a disciple of Seraj shah, and both were born at the village Harishpur, subdivision Jhenaidah, District Jessore--- where he died some ten years ago. His disciples are many and his songs are numerous.

'Journal of the Anthropological Socity of Bombay' (Bombay, 1900, Vol. 5. No. 4 Page. 217)

লালনের ওস্তাদ বা পীর ছিলেন সিরাজ শাহ। তিনি ঐ হরিষপুরেরই বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা মুসলিম বেহারা সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই লালান গান পছন্দ করতেন। এমন কি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে তিনি দিনের পর দিন গান শুনে বেড়াতেন। ঐ সময় হরিষপুর অঞ্চলের বিখ্যাত বিখ্যাত বয়াতিদের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হত বলে জানা যায়।

'লালন শাহ দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তাঁর নিজস্ব সাধন রীতি ও অধ্যাত্ম সঙ্গীত দ্বারা সাধারণ মানুষের চিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। তাঁর ভক্ত শিষ্য ছিল অগণিত। মধুর ভাষা ও সহজ রূপকের মাধ্যমে গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ ছিল লালন গীতির বৈশিষ্ট্য। জনশ্রুতি আছে যে, বিশ্ব কবি রনীন্দ্রনাথের সাথে লালন শাহের সাক্ষাৎ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মরমী সঙ্গীতের ওপর লালন শাহের অতীন্দ্রীয় রসের প্রভাব পড়েছিল।[১]

লালন শাহের বিখ্যাত গান–

'খাঁচার ভিতর অচীন পাখী কেম্‌নে আসে যায়
ধরতে পারলে মন–বেড়ি দিতেম পাখীর পায়।'

এ গানটি কবি রনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল বলে জানা যায়।

অন্যদিকে জাত পাত নিয়ে লালনের বিখ্যাত গান–

সব লোক কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে।।
কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।।

অন্য একটি গান–

"জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা।
সত্য পথে কেউ নয় রাজী, সব দেখি তা–না–নানা।।
যখন তুমি ভবে এলে,
তখন তুমি কি জাত ছিলে,
কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা কেন বল না।

আল্লাহ রসূলের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে লালন শাহ গেয়ে উঠেছেন–

মুখে পড়রে সদায় লা–ইলাহা–ইল্লাল্লাহ্।।
আইনভেজিলেনরাছুল–উল্ল।।
নামের সহিত রূপ,
ধিয়ানে রাখিয়া জপ,
বে নিশানায় যদি ডাক,

চিনবি কি রূপ কে আল্লা। ইত্যাদি গান লালন শাহকে চির অমর করে রেখেছে। কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন ছেউড়িয়াতে লালন শাহের মাযার রয়েছে।

পাগলা কানাই [১৮০৯–১৮৮৯]

যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার লেবুতলা গ্রামে বাংলা ১২১৬ সাল মুতাবিক ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পাগলা কানাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম কানাই শেখ। এ বাউল

www.pathagar.com

কবির পিতার নাম কুড়ান শেখ। খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে থাকতেন বলে লোকে তাঁকে পাগলা কানাই নামে ডাকতো। পরবর্তীতে তিনি এ নামে পরিচিত হন।

দরিদ্র কৃষক কুড়ান শেখ পুত্রকে লেখা পড়া শেখানোর জন্য মক্তবে দেন, কানাই সেখানে কিছু লেখা পড়াও করেন। দুষ্ট প্রকৃতির হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখা পড়া আর হয়েওঠেনি।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন–

লেখা পড়া শিখবো বলে
পড়তে গেলাম মক্তবে
পাগলা ছৌড়ার হবে না কিছু
ঠাট্টা করে কয় সবে
ছৌড়া চলে ফেরে তাড়ুম তুড়ুম
মারে সবায় গাড়ুম গুড়ুম
বাপ এক গরীব চাষা
ছাওয়াল তার সর্বনাশা
সে আবার পড়তে আসে কেতাব কোরান ফেকা।
পাগলা কানাই কয় ভাইরে পড়া হল না শেখা।

কবি প্রতিভার দিক দিয়ে লালন শাহের পরেই পাগলা কানাই'র স্থান। অশিক্ষিত পাগলা কানাইয়ের সৃষ্টিও অসম্ভব প্রতিভাধর। যেমন–

সালাম সালাম সলাম রাখি দেশের পায়
পয়লা সালাম করি আমি খোদার দরগায়
তারপর সালাম করি নবীজিরে
যিনি শুয়্যা আছেন মদীনায়।

কবি জীবদ্দশায় সবার কাছে গৃহীত হন। তিনি যশোর, খুলনা, ২৪ পরগণা, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন। তিনি ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার শ্রোতার আসরেও গান গেয়েছেন। এক সময় তিনি পাবনাতে বেশ কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেন।

পাগলা কানাইয়ের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুরেলা। তাঁর গানের সাহিত্যিক মানও কোন অংশে কম নয়। যেমন–

গেলো দিন
শুন মুসলমান মোমিন
পড় রব্বিল আলামিন
দিন গেলে কি পাবি ওরে দিন
দ্বীনের মধ্যে প্রধান হল মোহাম্মদের দ্বীন
সেই দ্বীনের দ্বীন করলে একিন
সুখে রবে চির দিন
নাইকো জ্বালা ও মন ভোলা

www.pathagar.com

পাবিরে পার হাসরের দিন।

'বিষয় বস্তুর দিক থেকে পাগলা কানাই রচিত গানগুলোকে দেহতত্ত্ব, জারি, বাউল, ধুয়া, মারফতী, মুর্শিদী প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়।[২]

বাউলরা সাধারণত কোন ধর্মমতের তেমন পাবন্দ হয় না। তবে পাগলা কানাই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, তিনি শরীয়ত মেনে চলতেন বলে জানা যায়। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। পাগলা কানাইয়ের মৃত্যুর পর সেই সময়কার কয়েকজন প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক তাঁর কবর জেয়ারত করেন। এঁদের মধ্যে হাফেজ মৌলভী মোঃ রায়হান উদ্দিন সাহেব ও মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ অন্যতম।

পাগলা কানাই ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৮ শে আষাঢ় (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

মুন্সী জহিরুদ্দীন [১৮১১–১৯৩১]

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মুন্সী জহিরুদ্দীন যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার খাজুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে খাজুরাতে ইন্তেকাল করেন।

'তিনি হাজী তিতুমীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বীর সৈনিক ছিলেন। তিতুমীরের আন্দোলন ব্যর্থ হলে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২২ শে নভেম্বর কলকাতার পত্নীতলা মসজিদে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এবং মুসলমান জাতির জাগরণের জন্য তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের সাথে সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রচারাভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।' মুন্সী জহিরুদ্দীন একজন উচ্চমানের বাগ্মী ছিলেন। লেখা লেখিতেও তাঁর হাত ছিল। 'রত্নখনি' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন, যার চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে স্বীয় পুত্র জনাব লুৎফর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

দুদ্দু শাহ [১২০৩–১৩১৪]

'দুদ্দু শাহ ছিলেন মরমী সাধক। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবি প্রতিভা। বাংলার লোকসাহিত্যে বাউল কবি লালনের পরেই তাঁর স্থান। গোপন তত্ত্বকথার সংকেত তাঁর গানের বাণী ইঙ্গিতময়। বিষয়, ভাব ও প্রতীক ধর্মিতায় তাঁর রচনা চিরায়ত লোক ঐতিহ্যের অন্তর্গত।' যতদূর জানা যায় দুদ্দু শাহ'ই ছিলেন বাউল কবিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত ও অসম্ভব প্রতিভাধর।

দুদ্দু শাহ'র জন্ম সাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে নির্ভরযোগ্য মতটি হল–১২০৩ বঙ্গাব্দে যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিণাকুন্ডু থানার বেলতলা হরিষপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঝড়ু মণ্ডল। কাবিল মণ্ডল ছিলেন পিতামহ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দুদ্দু শাহ বা দুদু মন্ডল ওরফে দুধ মল্লিক বিশ্বাস ছিলেন সবার ছোট। অন্য ভাইদের নাম মধু মন্ডল, পিরু মন্ডল, গুরু মন্ডল (গরাই মন্ডল) ও ফজু মন্ডল (ফজর আলী মন্ডল)।

www.pathagar.com

দুদ্দু শাহ স্বীয় গ্রামের শ্রীনাথ বিশ্বাসের পাঠশালায় লেখা পড়া শুরু করেন। পরে স্থানীয় আলেমদের নিকট আরবী, ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কোরআনে হাফেজ ছিলেন। দুদ্দুশাহ ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন বলে শাহ লতীফ আফী আনহু উল্লেখ করেছেন।

ছাত্র জীবন শেষ করে তিনি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। এক সময় কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়াস্থ লালন শাহের আখড়ায় গেলে তাঁরা তর্কে লিপ্ত হন। তর্কে দুদ্দুশাহ পরাজিত হয়ে লালন শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই লিখেছেন–

'বাহাছ করিতে এসে বয়াত হইনু,
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু।'

'দুদ্দু শাহ একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি অসংখ্য ভাব গানের রচয়িতা। তিনি কয়েক খানি কাব্যও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'লালন চরিত' ও 'নূরে মোহাম্মদী' নামক দু'খানি পুঁথি পাওয়া গেছে।'[৩]

লালন শাহ দুদ্দুশাহকে পুত্রের মতই স্নেহ করতেন। লালন শাহের মৃত্যুতে দুদ্দু শাহ পাগল প্রায় হয়ে লিখেছেন–

সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল।
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল।।
মো অধমে বাবা ব'লে কে আর ডাকিবে।
আমার এই দীন মুখে চুম্বন করিবে।।
অমন মধুর বাণী কে আর শোনাবে।
আর কি ছেউড়িয়া ধামে করুণা বর্ষিবে?
চাঁদের বাজার কে গো মিলাইবে আর।
হিন্দু, মুসলমান সবে করে হাহাকার।।
দুদ্দু শাহ'র রচনাশৈলী অসম্ভব উন্নতমানের ছিল–
আমার দয়াল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয়া।
তাঁর আত্মকথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।।
তাঁর মহা আত্মকথা আমি কি জানিব।
যার কথা সে যদি না কয় কিসে প্রকাশিব।।
আলমডাঙ্গা গ্রামে শুকুর সা'র আশ্রমে।
আরজি করিনু আমি অতিব নির্জ্জনে।।
দয়াল দরদি সাঁই করুণা করিয়া,
কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া।।
এত শুনি দয়াল সাঁই মোর পানে চায়,
মৃদু হাসি এই দাসে যাহা কিছু কয়
বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া
সাঁইজির ছিল মানা নাই প্রকাশিবা।।

www.pathagar.com

'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দুদ্দুশাহ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন–"দুদ্দুর গানগুলি লালনের গানের তত্ত্ব দর্শন এবং ভাবধারারই প্রতিধ্বনি বহন করে এবং তিনি অধিকতর বাস্তব সচেতন, যুগ সচেতন ও গান সচেতন।"

দুদ্দুশাহ দীর্ঘজীবি ছিলেন। ১১১ বছর বয়সে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে নিজ গ্রাম বেলতলা–হরিষপুরের বাস্ত ভিটায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

পাঞ্জু শাহ [১২৫৮–১৩২১]

১২৫৮ বঙ্গাব্দে যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকূপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসংগে ডঃ এস, এম লুৎফর রহমান লিখেছেন–'দুদ্দুর বাউলমতে দীক্ষা গ্রহণের পর হরিষপুর গ্রামে ফকির পাঞ্জু শাহ্ বা পাঞ্জু শাহের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর জন্মভূমি যশোর জেলার শৈলকূপা গ্রাম। কিন্তু অতি শৈশবে পিতার সঙ্গে তিনি হরিষপুর হিজরৎ করেন। কালক্রমে তিনি ফকিরী সাধনায় আত্মনিয়োগ করে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। খোন্দকার রিয়াজুল হক এই বংশের–ই সন্তান।'[৪]

বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে পাঞ্জুশাহ নিজেই লিখেছেন–

পাঠান কুলেতে জন্ম আমার।
হপ্তম কুরছি নাম লিখি পর পর।।
নেয়াজেশ খাঁর ব্যাটা দুদ্দু নাম তার।
এলেছ খাঁ তাঁর বেটা আফজাল আর।।
আাফজল খাঁর বেটা ছোবহান খোন্দকার
তিনা হতে খোন্দকারী দাদাজী আমার।।
খাদেম আলী খোন্দকার মেরা বাপজান।
তার বেটা হীন পাঞ্জু অতি হতজ্ঞান।।
হীন পাঞ্জু খোন্দকার আল্লার গোলাম।
সাত পুরুষের নাম হইল তামাম।।

বাল্যকালে পাঞ্জু শাহ গ্রাম্য মক্তবে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পরে স্বীয় গ্রামের মহর আলী বিশ্বাসের কাছে বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর দীক্ষা গুরু ছিলেন ঐ হরিষপুর গ্রামের হেরাজতুল্লাহ খোন্দকার, যিনি হিরু শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। গুরু সম্বন্ধে পাঞ্জুশাহ লিখেছেন–

গুরুজীর নাম লিখি করিয়া ছালাম।
হয়ে আছে হীন পাঞ্জু যাহার গোলাম।।
জানিবে যে খোন্দকার হেরাজতুল্লায়।
আমার গুরুজী তিনি বড় দয়াময়।।
মোকাম তিনার যে হরিষপুর গ্রাম।
অধীনের তথা বাসা জানিবে তামাম।।

ভক্তি গদ গদ হয়ে তিনি আরো লিখেছেন–

হেরাজতুল্লাহ খোন্দকার তেনার কদম সার

www.pathagar.com

করিলে পাইবে পরওয়ার।
তিনি যে আল্লার ওলী হিরু চাঁদ গানে বলি
তা বিনে না দেখি কিনার।।

"পাঞ্জু শাহের গান বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ফকির সম্প্রদায় শ্রদ্ধার সাথে তাঁর সঙ্গীত গাইতেন। পাঞ্জুশাহ অসংখ্য মরমী গান রচনা করেছেন। ১৯০৭ সালে তিনি ছহি 'ইক্কি ছাদেকী গওহোর' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। তাঁর গানগুলো বাউলের সুর, কীর্তনের ভাব, গজলের তান এবং ক্লাসিকের লয় সমন্বয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।"[৫]

পাঞ্জু শাহ ছিলেন সুফী চিশতীয়া তরীকাপন্থী এবং নিজামীয়া গোত্রভুক্ত ফকির। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখেছেন–

চিশতী খান্দানে আমি মুরীদ হয়েছি।
নেজামীয়া গোরো জেনে ফকির হয়েছি।

তার সম্বন্ধে ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন–

"আমরা লালন ফকিরের কবিত্ব ও আধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্পর্কে যত কৌতূহলী পাঞ্জুশাহ সম্পর্কে তত কৌতূহলী নই। পাঞ্জুশাহ যে বাউল আধ্যাত্ম মার্গের একজন অগ্রচারী সাধক এবং স্বভাব কবি ছিলেন, তা আজ প্রচারের দরকার।"

এই মহান মরমী সাহিত্য সাধক ৬৩ বছর বয়সে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৮ শে শ্রাবণ ইন্তেকাল করেন।

হযরত মওলানা হাতেম আহমদ (১২৭৩ ...)

নড়াইল মহকুমার কালিয়া থানার জানরিল ডাংগা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে হাতেম আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ সেরবান উল্লাহ। শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ারদী তাঁর পূর্ব পুরুষ।

ধর্মপরায়ণ পিতার কাছেই হাতেম আহমদের বাল্য শিক্ষার শুরু। এরপর বাল্যকালেই তিনি কলকাতা গমন করেন এবং সেখানকার এক মক্তবে পড়াশুনা শুর করেন। পরে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ, এম (ফাজিল) পাশ করেন এবং দেওবন্দ গমন করেন। সেখান থেকে হাদীস, তফসীর, ফেকাহ ইত্যাদি বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফেরার আগে মাত্র ৪ মাসে কোরআন হেফজ করেন। তাঁর সম্মানিত ওস্তাদদের মধ্যে ছিলেন–শাইখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান, মওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মওলানা ইয়াসিন সাহেব (মুফতী মোহাম্মদ শফি সাহেবের আব্বা)। তিনি কিছুকাল মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)–এর সাহচার্য লাভ করেন।

তিনি তিনবার হজ্বব্রত পালন করেন। হজ্ব হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী হয় এ জন্য হাতেম আহমদ সাহেবের কাছে হজ্বের অনেক বিষয় শরীয়ত পরিপন্থী মনে হওয়ায় তিনি বিশুদ্ধ আরবীতে জনসমক্ষে এক ভাষনের মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তৎকালীন বাদশাহ ইবনে সউদের কানে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাঁকে তাঁর দরবারে ডাকান এবং সব কিছু

www.pathagar.com

শুনেন। সব কিছু শুনে বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বীয় জুব্বা, ১২টি স্বর্ণ মুদ্রা ও হাম্বলী মাযহাবের মশহুর গ্রন্থ 'শররুম বেলালী' (১২ খন্ড) উপহার দেন।

তাঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কর্ম কান্ডের কথা এলাকায় প্রচলিত আছে। তিনি সত্যিই একজন করিৎকর্মা পুরুষ ছিলেন। এলাকায় বহু মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর অবদান। তা ছাড়া ধর্মীয় জলসায় বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি যশোর খুলনা, ফরিদপুর অঞ্চলে ব্যাপক আলোড়ন তোলেন এবং ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যপাদে ইন্তেকাল করেন।

পীরে কামেল মওলানা আবেদ আলী (১২৭৭–১৩৬৩)

১২৭৭ বঙ্গাব্দে সদর মহকুমার কোতয়ালী থানার এনায়েত পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আবেদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু আহমদ আবেদ আলী। তাঁর পিতার নাম শাহ আরজান আলী। মরহুম মওলানার দাদা শাহ আসমত উল্লাহ ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকূপা থেকে এনায়েতপুর আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন।

শাহ আসমত উল্লাহর পূর্ব পুরুষ– সৈয়দ শাহ বখ্শী ও তাঁর ভাই সৈয়দ শাহ হামজা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর ইরাক থেকে দিল্লী আসেন। সে সময় দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট জাহাংগীর। পরবর্তীতে সম্রাট জাহাংগীর এই ইসলাম প্রচারক ভ্রাতৃদ্বয়কে যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠান। তাঁরা যশোর অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়। তাঁদের স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ এখনো শৈলকূপা এলাকায় তাঁদের তৈরী গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ও মাজার রয়েছে।

স্থানীয় স্কুলে আবেদ আলী'র বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি স্কুল বৃত্তি পাশ করার পর ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রথম দিকে তাঁর পিতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে ফুরফুরা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি হযরত সুফী গণিমতউল্লাহ ও দাদাপীর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রঃ)–কে শিক্ষক হিসাবে পান। পরে তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে জামাতে উলা পাশ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর মরহুম দাদা হুজুর কেবলার সাথে উভয় বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন ও ওয়াজ নসীহত করে ইসলাম প্রচারের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি একজন আনলবর্ষী বক্তা ছিলেন।

মওলানা আবেদ আলী আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর 'মিহির সুধাকর' নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন, যা প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর সুদীর্ঘ ৯০ বছর জীবনে তিনি অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মধ্যে হুগলী জেলার নবাবপুর মসজিদ, হাওড়া জেলার শাঁকরাইলের মসজিদ, যশোর জেলার ঘোপ, সাজিয়ালী ও এনায়েতপুর গ্রামের মসজিদ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যশোরের তীরের হাট সিদ্দিকীয়া দাখেলী মাদ্রাসার নাম করা যেতে পারে।

মওলানা আবেদ আলী ১৯৬৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

সূফী সাধক মোহাম্মদ ইউসুফ (১২৮৯–১৩৫২)

১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফালগুন মাসে মোহাম্মদ ইউসুফ যশোর জেলার মনিরামপুর থানার কাশীপুর গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম তরিবুল্লাহ খাঁন। বাল্যকালেই ইউসুফ পিতৃহারা হন এবং পিতৃব্য বাদল খাঁনের নিকট লালিত পালিত হন।

মোহাম্মদ ইউসুফ গ্রাম্য বিদ্যালয়েই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এরপর তিনি ফুরফুরা শরীফে গমন করেন এবং মরহুম দাদা হুজুর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রঃ)–এর নিকট পুত্র স্নেহ লালিত পালিত হন। জানা যায় মোহাম্মদ ইউসুফ যখন ফুরফুরার দরবার শরীফে উপস্থিত হন, ঠিক এর ২/১ দিন পূর্বে দাদা হুজুরের ইউসুফ নামের এক পুত্র ইন্তেকাল করেন। তাই সমবয়সী ইউসুফকে পেয়ে তিনি পুত্র ইউসুফকে হারানোর ব্যথা কিছুটা হলেও উপশম পান।

মোহাম্মদ ইউসুফ ফুরফুরা শরীফেও লেখাপড়া অব্যাহত রাখেন। এভাবে এখানে প্রায় ১৫/১৬ বছর অবস্থান করার পর তিনি দেশে ফেরেন। এরপূর্বেই তিনি মরহুম দাদা হুজুরের খেলাফত প্রাপ্ত হন।

দেশে ফিরে তিনি ইসলাম প্রচারে নেমে পড়েন। সাথে সাথে মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপন করেন ও করতে উৎসাহিত এবং সাহায্য করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন নিজ পীর ও লালন পালনকারী মরহুম আবু বকর সিদ্দিক (রঃ)–এর নামে 'কাশীপুর সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা।

আল্লার এ মহান সাধক ও ইসলাম প্রচারক ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন রোজ বুধবার ফুরফুরা শরীফে ইন্তেকাল করেন। ফুরফুরার হুজুরের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯–১৯৩৬)

"হোমিওপ্যাথী ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ছিলেন মানবতাবাদী চিন্তাশীল প্রবন্ধকার। মনুষ্যত্ব বিকাশের রূপসাধনা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এমনকি নারী জাতির নির্যাতন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল 'নারী শক্তি' নামক পত্রিকা প্রকাশ ও 'নারীতীর্থ' নামক মহিলাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে। 'জীবন' গ্রন্থমালা লিখে তিনি মানুষের জীবনকে মহৎ, উন্নত, উচ্চ, ধর্মভাবাপন্ন সত্য ও সার্থক সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর এর কারণ ছিল, জাতীয় চরিত্রের আদর্শ সম্পর্কে একটি ধ্যানীমান। জাতীয় চরিত্রের আদর্শরূপ কল্পনা করতে গিয়ে লুৎফর রহমান ছিলেন মানব দরদী, ধর্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ ও উচ্চ ভাবাপন্ন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক।"

ডাঃ লুৎফর রহমান ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মাগুরা মহকুমার পার নান্দুয়ালী গ্রামে মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল একই মহকুমার শ্রীপুর থানার হাজীপুর গ্রামে। ডাক্তার সাহেবের পিতার নাম ছিল ময়েন উদ্দীন আহমদ।

www.pathagar.com

গ্রাম্য মক্তবে তাঁর লেখা পড়া শুরু হয়। এরপর স্থানীয় হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি কলকাতার হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে এফ, এ পাশ করেন। এ সময় পিতা-মাতার অমতে বিয়ে করার কারণে তিনি বাড়ী থেকে ত্যাজ্য হন। এ কারণে তাঁর লেখা পড়া আর অগ্রসর হতে পারেনি।

'ডাক্তার লুৎফর রহমান ছিলেন মানবতাবাদী লেখক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মুষ্টিমেয় বাংগালী মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মৌলিক ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও নিজস্ব গদ্য রচনার স্টাইল তাঁকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের গদ্য রচয়িতাদের মধ্যে বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষের জন্য আপরিসীম মমতা ও বেদনাবোধ লুৎফর রহমানের রচনার মূল সুর।'

তাঁর 'বৃহৎ ডন কুইকজোটের অনুবাদ' সম্ভবতঃ প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এরপর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ৪০ টি কবিতা নিয়ে 'প্রকাশ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ।

এরপর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সরলা' উপন্যাস, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'পথ হারা' উপন্যাস, একই বছরে 'রায়হান' নামে অপর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'প্রীতি উপহার' (১৯২৭), 'বাসর উপহার' (১৯৩৬) ও 'প্রতিশোধ' নামে আরো তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল-'মানব জীবন' (১৯২৬), 'উন্নত জীবন' (২য় প্রকাশ ১৯১৯) 'মহৎ জীবন' (১৯২৬), 'সত্য জীবন' (১৯৪০) ও 'উচ্চ জীবন (১৯৬২)

কিশোর কিশোরীদের জন্য তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হল-'ছেলেদের মহাত্ম্য কথা' (১৯২৮), 'ছেলেদের কারবালা' (১৯৩১), 'রাণী হেলেন' (১৯৩৫) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি মাসিক 'নারী শক্তি' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন।

ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন (১৮৯১-১৯৬২)

যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত শালিখা থানার ঘোষগাতি গ্রামে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শেখ হবিবর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

চাকুরী জীবনে তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। শিক্ষায় 'এল-টি' উপাধি প্রাপ্ত শেখ হবিবর রহমান দীর্ঘদিন শিক্ষকতা ও স্কুল পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। চাকুরীর শেষ দিকে তিনি খুলনা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হল-ইসলাম ও অন্যান্য ড্রামা (১৯০৭), 'আবেহায়াত' কাব্য (১৯১৫), 'পারিজাত' কাব্য (১৯১৬), হাসির গল্প (১৯১৭), 'নিয়ামত' গল্প (১৯১৭), 'বাঁশরী' কাব্য (১৯১৭), পরীর কাহিনী (১৯১৮), 'কোহিনুর' কাব্য (১৯১৯), 'গুলশান', 'চেতনা' ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ। শেখ সাদীর 'গুলিস্তা' ও 'বুস্তার' অনুবাদও করেন। এ ছাড়া আলমগীর (১৯১৯), মালাবারে ইসলাম প্রচার (১৯১৮), দুররুল মুখতার (১৯২৪), সুন্দর বনের ভ্রমণ কাহিনী (১৯২৬), আমার সাহিত্যিক জীবন (১৯২৭), কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ (১৯৩৪) ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

www.pathagar.com

শিশুদের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম দরদ। হাস্যরসিক মন নিয়ে তাই তিনি তাদের জন্য রচনা করেছেন –পরীর কাহিনী (১৯২৫), ভারত সম্রাট বাবর (১৯১৯), সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কালাম (১৯২৫), ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (৩য় সং ১৯৫৬), ছেলেদের হযরত মূসা (১৯১৪), ছোটদের গল্প (১৯৫৬), জেনপরী, পরীজাদী গুলবাহার, মোল্লা বাকাউল্লা, সংক্ষেপে বিষাদ সিন্ধু, গুলিস্তাঁর গল্প (১৯৫২), 'সাহিত্য পারিজাত' পাঠ্য বই (১ম ও ২য় ভাগ) ইত্যাদি।

এই ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক খুলনা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ৭ই মে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৯৩–১৯৬৪)

কবি গোলাম হোসেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মাগুরা (বর্তমান জেলা) মহকুমার মোহাম্মদপুর থানার জোকাগ্রামে মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আবদুর রহমান। তাঁদের গ্রামের নাম 'বালীয়াডাঙ্গা'।

গোলাম হোসেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এফ, এ পাশ করেন। পিতার ইন্তেকালের কারণে বি, এ পরীক্ষা আর দেয়া হয়নি। তবে সুদীর্ঘ ২২ বছর পর বিনোদপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯০৪ সাল থেকে তাঁর লেখা লেখির শুরু। তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গ বীরাঙ্গনা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশ পায়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১১৮। এর পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান' (গদ্য), ১৯১২ খৃষ্টাব্দে 'দিল্লী–আগ্রা ভ্রমণ' (গদ্য ও পদ্য) ও ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কাব্যযুথিকা (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া 'নীতি প্রবন্ধ মুকুল' নামে ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর একখানা পাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেন। তিনি 'পয়গামে মোহাম্মদী' নামে একটি উর্দূ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জনাব মুহাম্মদ আবূ তালিব সাহেব লিখেছেন–

'পদ্য ও গদ্য উভয় বিষয়েই তাঁর অসাধরণ দক্ষতা ছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মুসলিম কবি সমাজের অগ্রণী। বলাবাহুল্য ইতিপূর্বে বাঙালী মুসলিম কবি সমাজের মধ্যে কেউই আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। কবি গোলাম মোস্তফাই সম্ভবতঃ আমাদের কবি সমাজের মধ্যে প্রথম বি, এ, বি, টি ছিলেন, কিন্তু তিনি বয়সের হিসেবে কবি গোলাম হোসেনের বিশ বৎসরের অনুজ ছিলেন। উল্লেখ্য, কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম বৎসরেই তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ–এ (বর্তমানের উচ্চ মাধ্যমিক) পাশ করেন এবং পরে (১৮ বৎসর পর) গোলাম মোস্তফার সঙ্গে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে বি, এ পাশ করেন (১৯১৮)। পিতৃ বিয়োগ জনিত দুর্দশার জন্য তিনি যথা সময়ে বি–এ ডিগ্রী অর্জনে সক্ষম হননি। তথাপি বলা হয়েছে, সেকালের কবি সমাজে তিনিই প্রথম আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম কবি।'[৬]

এই মহান মুসলিম সাহিত্য সাধক ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তাঁর নিজ গ্রাম বালীয়াডাঙ্গায় সমাধিস্থ করা হয়।

www.pathagar.com

আবুল হুসেন (১৮৯৭–১৯৩৮)

'বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলকে (এস, এম, হল) কেন্দ্র করে, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি প্রগতিশীল তরুণ মুসলিম সাহিত্য সমাজ গড়ে ওঠে। সৈয়দ আবুল হুসেন সাহেব ছিলেন তার অন্যতম প্রধান স্থপতি। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাহ্য শরীয়ত পন্থী মোল্লা মৌলবীদের আওতা থেকে মুক্ত করে এক নবীন মুসলিম সমাজ গড়ে তোলা। তাঁদের ভাষায় এই সমাজের মর্মকথা (Motto) হল–বুদ্ধির মুক্তি (Emancipation of the Intellect)। সাহিত্য সমাজের মুখপত্রের (শিখা) মূল সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আবুল হুসেন।[৭]

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন পুরোধা জনাব আবুল হুসেন ৬ই জানুয়ারী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার পানিসারা গ্রামে মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল একই থানার কাউরিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা হাজী মোহাম্মদ মূসা ও পিতামহ মৌলভী মোহাম্মদ হাশিম উভয়েই ধর্মভীরু ও জ্ঞানসাধক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। জানা যায় তাঁর পিতা হাজী মোহাম্মদ মূসা 'নামাজ শিক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। 'সত্যনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারী পিতামহকেই আবুল হুসেন ব্যক্তি জীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[৮]

যশোর জিলা স্কুল থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আবুল হুসেন কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৬ ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আই, এ ও বি, এ পাশ করেন এবং বৃত্তি পান। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অর্থনীতি শাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম হয়ে এম–এ পাশ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে আবুল হুসেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে সহকারী শিক্ষকরূপে কাজ শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগদেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে বের হয় মাসিক 'তরুণ পত্র'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আল মামুন' ক্লাব। ১৯২১–২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতা করার ভেতরই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষকতা ছেড়ে ঢাকাতে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এম, এল ডিগ্রী লাভ করেন। এর পরবর্তী বছর কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। জানা যায় 'Tagor law lecturer' পদের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The History of Development of Muslim Law in British India' বিষয়ে পনেরটি বক্তৃতার সারসংক্ষেপ দাখিল করেন। কিন্তু এসময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তা আর সম্ভব হয়নি।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হচ্ছে 'বাংলার নদী সমস্যা', 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা', 'বাংলার বল্‌শী', 'সুদ রিবা ও রেওয়াজ', 'শতকরা পঁয়তাল্লিশের জের', 'নিষেধের বিড়ম্বনা', 'আদেশের নিগ্রহ', Helots of Bengal, Religion of Helots of Bengal, Development of Muslim law in British India প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন

www.pathagar.com

বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী মার্মা ডিউক পিক থলের 'মুসলিম কালচার' গ্রন্থটি। সম্পাদনা করেছেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মুখ পত্র 'শিখা'র।

এ ছাড়াও তিনি বেশ ক'টি গল্প লিখেছেন, যাতে মুসলিম সমাজের নানামুখী সমস্যা ফুটে উঠেছে। গল্প গুলি হল, রুদ্ধ ব্যথা, স্নেহের টান, নেশার ফের, মিনি, গোঁয়ার গাদু, প্রীতির-কুঁড়ি ইত্যাদি। অন্যদিকে তিনি রচনা করেছেন 'মিলন মঙ্গল' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক।

কাল ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম বাংলার এই মহান সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ ও সমাজ সংস্কারক ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ইন্তেকাল করেন। মামার বাড়ী পানি সারা গ্রামে পিতার সমাধির পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭–১৯৬৪)

মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ধারা সৃষ্টির একান্ত কামনা গোলাম মোস্তফাকে সব সময় তাড়িত করেছে। কবি নিজেই বলেছেন 'আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হয়েও আমার মনে জেগেছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্খা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাকিদে নয়–সহজ ভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ন।'

সার্টিফিকেট অনুযায়ী কবি গোলাম মোস্তফা ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকূপা থানার কুমার নদীর তীরবর্তী মনোহর পুর গ্রামে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর প্রকৃত জন্ম তারিখ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। 'তাঁর পিতামহ গোলাম সরওয়ার নীল বিদ্রোহের সময় জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং পিতা কাজী গোলাম রব্বানী প্রসিদ্ধ ছিলেন গ্রাম্য কবি হিসাবে।[৯]

গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। এরপর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শৈলকূপা হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, দৌলতপুর কলেজ থেকে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আই, এ এবং কলকাতা রিপণ কলেজ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করেন।

চাকুরী জীবনের শুরুতেই তিনি সহকারী শিক্ষক হিসাবে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুর সরকারী হাই স্কুলে যোগদান করেন। শিক্ষকতাকালে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি, টি পাশ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন। ফরিদপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ৩০ বছর শিক্ষকতা করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

'তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো ও আজীবন সদস্য, টেক্সট বুক বোর্ড, করাচীর বুলবুল একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি (১৯৪৯), পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডি এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৬১ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানী লেখকবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।[১০]

www.pathagar.com

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্কুলের ছাত্র থাকাকালে কবি গোলাম মোস্তফার কবিতা 'আদ্রিয়ানোপাল উদ্ধার' সাপ্তাহিক মোহাম্মাদীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই শুরু, এরপর তিনি একটানা ৫০ বছর লেখালেখির জগতে বিচরণ করেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থগুলি– রক্তরাগ (১৯২২), হাস্নাহেনা (১৯২৭), খোশরোজ (১৯২৯), সাহারা (১৯৩৬), কাব্য কাহিনী (১৯৩৮) এবং অনুবাদ গ্রন্থ–মুসাদ্দাসই–হালী (১৯৪১), তারানা–ই–পাকিস্তান (১৯৪৮), বনি আদম (১ম খণ্ড, ১৯৫৮), অনুবাদ কাব্য আল–কুরআন (১৯৫৭), কালামে ইকবাল (১৯৫৭) ও শিকওয়াও জবাব–ই শিকওয়া (১৯৬০) এবং কবিতা–সংকলন বুলবুলিস্তান (১৯৪৯)।

গদ্য রচনা–ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলাম ও জেহাদ, মরুদুলাল,আমার চিন্তাধারা ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাঙাবুক ও রূপের নেশা নামে দু'টি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন। তাঁর সব থেকে আলোড়িত ও পঠিত গ্রন্থ 'বিশ্বনবী'। 'ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবনী পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তা শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে না, ভক্তের আবেগ ও গবেষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমন্বয়ে প্রকাশ ভঙ্গির স্পষ্টতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা দিয়ে যা তিনি সৃষ্টি করলেন, তা বাংলা ভাষায় বিরল।'[১১]

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য যশোর সাহিত্য সংঘ তাঁকে 'কাব্য সুধাকর' উপাধি প্রদান করে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পান, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে পান সিতারা–ই–ইমতিয়াজ খেতাব, প্রেসিডেন্ট পদক ও আরো পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে এই মহান মনীষী ইন্তেকাল করেন।

মওলানা আবদুল আওয়াল (১৮৯৮–১৯৪৬)

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মওলানা আবদুল আওয়াল মাগুরা মহকুমার বেরুইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা কওসার উদ্দীন। তিনিও অত্র এলাকার মশহুর আলেম ছিলেন।

স্থানীয় মক্তবে আবদুল আওয়াল বাল্য শিক্ষা আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা আয়াত্তে আনেন। এরপর তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় উচ্চ ''শিক্ষার জন্য ভর্তি হন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে এফ এম (মাদ্রাসা ফাইনাল) পাশ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। মাদ্রাসাটি এখনো টিকে আছে এবং বর্তমানে এটি মঞ্জুরী প্রাপ্ত ফাজিল মাদ্রাসা।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পুলুম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর পানি ঘাটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মরহুম আবদুল আওয়াল সাহেব তথাকথিত কোন মোল্ল্যা ছিলেন না। তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য

www.pathagar.com

নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এ সময়ে তিনি নাটা বাড়িয়ার খাল খনন সহ অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্রজিৎপুর থেকে বেরুইল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ মাইল একটি রাস্তা তৈরী করেন, যা এখনো মৌলভীর রাস্তা নামে খ্যাত। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাড়াও জেলা বোর্ডের মেম্বর, জেলা ফুড কমিটির মেম্বর, স্কুল বোর্ডের সদস্য ও জজের জুরী হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসাবে যুক্ত বাংলার (এম, এল, এ) আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

সমাজ সেবার পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ইসলামের একজন অনুগত সৈনিক। তিনি সুন্দর করে ৩০ পারা কোরআন হাতে লিখেছিলেন, যা এখনো বেরুইল মাদ্রাসায় রক্ষিত আছে।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাত্র ৪৮ বয়সে এই মহান ইসলাম প্রচারক ও সমাজ সেবক ইন্তেকাল করেন।

ওয়াহেদ অলী আনসারী (১৯০৭–১৯৯১)

ওয়াহেদ আলী আনসারী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে চৌগাছা থানার (পূর্বে ঝিকরগাছা থানার অন্তর্ভূক্ত ছিল) জগন্নাথ পুর গ্রামে মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস পার্শ্ববর্তী গরীবপুর গ্রামে। বাহার আলী মুন্সী ছিলেন তাঁর পিতা। ফতেপুর এম, ই স্কুলে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কোটচাঁদপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

কর্মজীবনে ওয়াহেদ আলী আনসারী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুদ্রণ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ গ্রামে 'আনসার প্রেস' নামে ছাপা খানা স্থাপন করে এ ব্যবসার যাত্রা শুরু করেন। পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ছাপা খানা যশোর স্থানান্তর করেন। এর আগে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে 'মাসিক আনসার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি সাপ্তাহিক 'যশোর গেজেট' প্রকাশ করেন।

তিনি বেশ কিছু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন– নাস্তা, শেখ ফরিদ, গল্পে পাকিস্তান, আমার কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, ভিক্ষাবৃত্তি, সুখী পরিবার, জয় বাংলার এপিঠ ওপিঠ, পূর্ব পাকিস্তান বিভক্ত হবে না কেন প্রভৃতি। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন ফারসী কবি হাফিজের 'দীউয়ানে হাফিজ' কাব্যের কিছু অংশের কাব্যনুবাদ এবং 'কাব্য কোরাণ' নামে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর অপর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কয়েদীর বালাখানা, ইসলাম ও অন্য ধর্ম এবং সাংবাদিক জীবনের টুকিটাকি তাঁর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।

যশোরের মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা তাঁকে চিরদিন স্মরণীয় করে রাখবে। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও সচেতন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। মুসলিম একাডেমী, যশোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তাঁরই অবদান বলা যায়।

ওয়াহেদ আলী আনসারী ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

নূরুল মোমেন (১৯০৮—]

খ্যাতিমান নাট্যকার নূরুল মোমেন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার বুড়োইচ নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম জীবনের প্রথমেই তিনি ওকালতি শুরু করেন। মাঝে কিছুদিন সরকারী চাকুরী করেন, পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তাঁর উচ্চ প্রশংসিত নাটক 'নেমেসিস' (১৯৪৮) ও 'রূপান্তর' (১৯৫৯)। এ ছাড়া তাঁর অন্য নাট্য গ্রন্থ–নয়া খান্দান (১৯৬২), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০), আলো ছায়া (১৯৬২) ও যদি এমন হতো (১৯৬০)।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি– আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), শতকরা আশি (১৯৬৯), বহুরূপী (প্রবন্ধ সংকলন), 'নর সুন্দর' (প্রবন্ধ সংকলন)।

তাঁর নাটক রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচার হবার ফলে নাট্যকার হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জনক রেছেন।

কবি কাদের নওয়াজ (১৯০৯—১৯৮৩)

'কবি হিসেবে কাদের নওয়াজ সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। কবিতা রচনায় তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রমের তুলনা বর্তমানে দুর্লভ। একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ ও বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে কবি কাদের নওয়াজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।[১২]

পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালেবপুর গ্রামে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মামার বাড়ীতে কবি কাদের নওয়াজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে।

শিক্ষা জীবনের শুরুতেই তিনি বর্ধমান জেলার মাথরুন হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিককে তাঁর শিক্ষক হিসাবে পান। বি, এ, বি, টি পাশ করে তিনি শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তিনি ইংরেজীতে এম, এ পাশ করেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং প্রধান শিক্ষক হিসাবে দিনাজপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে যশোর জেলার শ্রীপুর থানার মুজদিয়া গ্রামে স্থায়ী ভাবে ডেরা বাঁধেন।

মাথরুন স্কুলের ছাত্র থাকা কালেই তিনি লেখা লেখি শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে শাহাদত আলী আনসারী লিখেছেন, 'ইংরেজী, সংস্কৃতি ও ফারসী ভাষায় তাঁর গভীর দখল ছিল। ক্লাসিক রীতির কাব্য রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। কিশোর পাঠ্য কবিতায় তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'মরাল' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেন। তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থ 'নীল কৌমুদী' দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যগ্রন্থদ্বয় সুধীজনের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। কিশোরদের জন্য লেখা তার গল্প গ্রন্থ 'দাদুর বৈঠক' কলকাতা থেকে প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস 'উতলা সন্ধ্যা' ও দু'টি পাখি দু'টি তীরে'। তাঁর ছোট গল্প–দস্যু লাল মোহন (ডিটেকটিভ) ও মরুচন্দ্রিকা।[১৩]

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা একটি কবিতার কিয়দাংশ–

আমার তরণী ভিড়বে না আর
জীবন নদীর কূলে
সব ব্যথা যাও ভুলে।
দূর হতে আজ বেশ দেখা যায়
ওই যে পুল–সেরাত
তহ্‌রা–সাকীর আবখুরা হ'তে
ঝরেই আবে হায়াত
সম্বল মালা শুধু কবিতার হার
'আমলনামা' যে নাই নাই কিছু আর–
ডুবে যায় রবি চাঁদ ওঠে যেন
ঝল্‌মল্ তারি পাশে–
দুই চোখে যেন নার্গিস ফুল হাসে।

এই কবিতায় স্পষ্টতই কবি 'আমলনামা' হিসাবে তাঁর কবিতাকে আল্লার দরবারে পেশ করার কথা বলেছেন।

৩রা জানুয়ারী ১৯৮৩ সালের সকাল ১০–১৫ মিনিটের সময় কবি কাদের নওয়াজ যশোর সদর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

কবি শামসুদ্দীন আহমদ (১৯১০–১৯৮৫)

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শামসুদ্দীন আহমদ ঝিনাইদহ মহকুমার কোটচাঁদপুর থানা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম তাজউদ্দীন আহমদ। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইসলাম প্রচারক সরদার চাঁদ খাঁর নামানুসারেই এ শহরের নামকরণ হয় চাঁদপুর। পরে ইংরেজ আমলে কোর্ট স্থাপিত হলে 'কোট চাঁদপুর' নাম হয়।

গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া শুরু করেন এবং স্থানীয় হাইস্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রেলবাজার হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং হুগলী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পড়া শোনা আর হয়ে ওঠেনি।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ডাক বিভাগের চাকুরীতে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ দিন একই বিভাগে চাকুরীর পর ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল হিসাবে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

'বাংলার মুসলিম নারী' তাঁর প্রথম প্রবন্ধ। এটি 'সাপ্তাহিক সওগাতে' ছাপা হয়। আর 'সাপ্তাহিক দিপালী'তে তাঁর প্রথম কবিতা 'আলো রেখা' ছাপা হয়। কবি শামসুদ্দীন আহমদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি–কবিতা (১৩৫০), খুজি আমি (১৩৭৪), পিয়ারী মোহন রোড (১৩৭৬),

www.pathagar.com

আকাশের রঙ (১৩৭৬), শামসুদ্দীনের কবিতা (১৩৮৩), কয়েকটি গান (১৩৮৩), গানের কথা (১৩৮৩), তবু জেগে রই প্রভৃতি।

ছোটদের জন্য লেখা কাব্যগ্রন্থ মুকুলের স্বপ্ন (১৩৫২), খেলাঘর (১৩৭৬), মায়া মুকুর (১৩৮১) ও গোয়েন্দা কাহিনী 'ছেলে ধরা' (১৩৮১)।

তার গল্পের বই–কথার কথা (১৩৮৫) ও দাঁড় কাক (১৩৮৮)। এ ছাড়া বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে তাঁর কবিতা স্থান পেয়েছে। 'কোট চাঁদপুর সাহিত্য' নামে তিনি একটি ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তিনি রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন গীতিকার ছিলেন।

ভারতের কাবেরী সাহিত্য গোষ্ঠী তাঁকে 'গীতশ্রী' উপাধি প্রদান করে, যশোর সুহৃদ সাহিত্য গোষ্ঠী ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁকে 'ফররুখ স্বর্ণ পদক'–এ ভূষিত করে। এর আগে যশোর সারথী সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ তাঁকে 'মাইকেল স্বর্ণ পদক' প্রদান করে। পর বছর ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে যশোর সাহিত্য পরিষদ তাঁকে স্বর্ণ পদক প্রদান করে। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা সম্মাননায় ভূষিত হন।

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে কবি শামসুদ্দীন আহমদ ইন্তেকাল করেন।

বাঙ্গাল আবু সাঈদ (১৯১৫–)

নড়াইল মহকুমার কালিয়া থানার পেরুলীস্থান গ্রামে বাঙ্গাল আবু সাঈদ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম জীবনে তিনি গাজীর হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

বাঙ্গাল আবু সাঈদের কাব্য গ্রন্থের নাম– নতুন গান, চরিত্রহীন না চরিত্রবাণ (১৯৫৯), নতুন পথ (১৯৫৯), অভাগিনী (২য় প্রকাশ, ১৯৬৮), শেফালীর প্রেম (১৯৬৪), শোভারানীর প্রেম (১৯৬৫), অগ্নি বলাকা (১৯৬৫), প্রমোদ বালা (১৯৬৫), পদ্মার বুকে (১৯৬৫), সহপাঠিনীর প্রেম (১৯৬৫), মিসট্রেসের মেয়ে (১৯৬৫), নরনারী (১৯৬৫), মধুমতী কন্যা (১৯৬৫), ব্যতিক্রম (১৯৬৫), টেডি বাঈ (১৯৬৭), অগ্নি শপথ (১৯৬৮) ইত্যাদি। তাঁর প্রকাশিত নাটক 'ভুলের মাশুল' (১৯৬৭)। যুবক ফরিদ (১৯৬০) এবং কিশোর ফরিদ ও বালক ফরিদ (১৯৬৪) তাঁর প্রকাশিত ভক্তি মূলক গ্রন্থ।

সৈয়দ লাল মোহাম্মদ (১৯১৫–১৯৮১)

১লা মার্চ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ লাল মোহাম্মদ ঝিকরগাছা থানার মিছরী দেয়াড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত। মূলতঃ অমৃত বাজার বলতে এ স্থানটিকেই বুঝায়। যে স্থানটির নামেই শিশির কুমার ঘোষ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নিজ গ্রাম মাগুরা থেকে 'পাক্ষিক অমৃত প্রবাহিনী' নামক পত্রিকাটি বের করেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পত্রিকাটি 'সাপ্তাহিক অমৃত বাজার' নামে বের হতে থাকে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়।

শৈশবে পিতা মাতাকে হারিয়ে লাল মোহাম্মদ আত্মীয় স্বজনের কাছে লালিত পালিত হন। ঝিকরগাছাতে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হলেও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলা স্কুল থেকে

www.pathagar.com

ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মানসে ভর্তি হলেও দারিদ্রতার কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি যশোর সদর মুন্সেফ আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরী গ্রহণ করেন। এরপর কিছু দিনের জন্য যশোরের সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন ও Socred Heart স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিভাগ পূর্ব সময়ে তিনি দৈনিক অমৃত বাজার, দৈনিক আজাদ ও কাজী নজরুল ইসলামের 'নব যুগ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে কিছু দিন দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতায় থাকা কালে সৈয়দ লাল মোহাম্মদ কাজী নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একান্ত সাহচর্য লাভ করেন।

তিনি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যশোর স্মীথ রোড থেকে 'মাসিক আলোক' এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'মাসিক ইশারা' নামক পত্রিকা দু'টি নিজ সম্পাদনায় বের করেন।

তাঁর সমন্ধে মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী লিখেছেন, 'সৈয়দ লাল মোহাম্মদের বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ সর্বজন প্রশংসিত। তিনি ভাল বক্তাও ছিলেন। ইংরেজ কবি সেক্সপীয়ার, মিল্টন, শেলী ও কীটসের বহু কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থাকারে তিনি কোন রচনা প্রকাশ করতে পারেননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবাণ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক দুস্প্রাপ্য পুস্তক-পুস্তিকা এবং পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলেন। নজরুল ইসলামের অনেক অপ্রকাশিত কবিতা তাঁর কাছে আছে বলে তিনি দাবী করতেন। যশোর থেকে প্রকাশিত 'নির্যাস' পত্রিকায় নজরুল ইসলামের একটি অপ্রকাশিত কবিতা তিনি প্রকাশ করেন।[১৪] তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ-'ওমরফারুক'।

৩০ শে জুলাই ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে যশোর পুরাতন কসবাস্থ নিজ বাড়ীতে সৈয়দ লাল মোহাম্মদ ইন্তেকাল করেন।

কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

'আদর্শানুরুক্তি, মানবতাবোধ ও প্রকাশের অনবদ্য ভঙ্গি মিলে তাঁর কবিতাকে ক্লাসিকাল বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং পাকিস্তান আমলের শ্রেষ্ঠ জতীয়তাবাদী কবি হিসাবে তিনি বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে 'প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[১৫] স্বীয় আদর্শের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। নানাভাবে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয়ে তাঁকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে।

১০ই জুন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার মাঝআইল গ্রামে বিখ্যাত সৈয়দ বংশে কবি ফররুখ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। ফররুখের পুরা নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ। অবশ্য রমজান মাসে জন্ম গ্রহণের কারণে তাঁর দাদী নাম রাখেন রমজান। তাঁর পিতা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী পুলিশের কর্মকর্তা ছিলেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার কারণে সৈয়দ হাতেম আলী কর্মচ্যুত হন।

ফররুখের শিক্ষা জীবন দাদীর কাছ থেকে শুরু হয়। তিনি দাদীর কাছ থেকে 'কাসাসুল আম্বিয়া' ও 'তাজকেরাতুল আম্বিয়া'র কাহিনী গুলো আত্মস্থ করেন। গ্রাম্য পাঠশালয় কিছু

www.pathagar.com

দিন পড়া শুনার পর কলকাতার তালতলা লেনস্থ মডেল এম, ই স্কুলে ভর্তি হন। এরপর বালিগঞ্জ হাই স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। এই বালিগঞ্জ হাই স্কুলেই কবি গোলাম মোস্তফাকে তাঁর শিক্ষক হিসাবে পান। এরপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। জেলা স্কুলের ছাত্র থাকাকালে তিনি সাহিত্যিক আবুল ফজল ও আবুল হাশেমকে তাঁর শিক্ষক হিসাবে পান। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আই, এ পাশ করেন। পরে তিনি যথাক্রমে দর্শন ও ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কলেজ দু'টি ছিল স্কটিশ চার্চ কলেজ ও সিটি কলেজ। কিন্তু অনার্স পাশ করা আর হয়ে ওঠেনি। অনার্স পড়া কালে তিনি–বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী প্রমূখের সহযোগিতা পান। সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন অস্কার পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার পরলোকগত সত্যজিত রায়, ফতেহ লোহানী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমূখ।

কলকাতা থাকতে কর্মজীবনের প্রথমে ফররুখ আহমদ অনেকগুলি চাকুরী করেন। তবে সবগুলি চাকুরীই ছিল স্বল্প স্থায়ী। আই, জি, প্রিজন অফিসে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে, সিভিল সাপ্লাইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে, মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদক হিসাবে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এবং জলপাইগুড়ির একটি ফার্মে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকুরী করেন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বেতারে চাকুরী গ্রহণ করেন। 'ফররুখ আমৃত্যু ঢাকা বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর চাকুরী কখনো যায়নি, কিন্তু দু'বার বিপন্ন হয়েছিলো– ১৯৫৩ সালে একবার ১৯৭১–এর ডিসেম্বরে আরেকবার।[১৬]

ফররুখ আহমদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হলো– সাত সাগরের মাঝি (কাব্য, ১৯৪৪), সিরাজম মুনীরা (কাব্য, ১৯৫২), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৫), হাতেম তাঈ (১৯৬৬), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৫), সম্প্রতি বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা তাঁর ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য (১৯৯১) এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে আবদুল মান্নান সৈয়দ–এর সম্পাদনায় ফররুখ আহমদের নির্বাচিত কবিতা (১৯৯২) প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কবি পরপর দু'টো পুরস্কার পান। পুরস্কার দু'টো হলো যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার ও বাংলা একাডেমী পুরস্কার। ঐ ১৯৬০ সনেই তিনি বাংলা একাডেমী 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে হাতেমতায়ী গ্রন্থটির জন্য পান আদমজী পুরস্কার। ঐ ১৯৬৬ সনেই ইউনেস্কো পুরস্কার পান 'পাখীর বাসা' গ্রন্থটির জন্য।

মৃত্যুর পরে কবি আরো তিনটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন –১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে একুশে পদক, ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা পুরস্কার এবং ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।

বাংলা সাহিত্যের এই অসম্ভব প্রতিভাধর কবি তৎকালীন মুজিব সরকারের রোষানলে পড়েন এবং অর্ধাহারে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর নিরবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। 'জাতির একটি অংশ কবির প্রতি অবিচার করেছিল, কিন্তু দেশের প্রতিটি বিবেক সম্পন্ন মানুষ সেদিন কবির প্রতি অবিচারের বিপক্ষে ধিক্কার উচ্চারণ করেছিল। এখানেই কবি ফররুখ আহমদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা বোধের স্বীকৃতি।[১৭]

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসান [১৯২২–]

এদেশের শিল্প–সাহিত্যের ক্ষেত্রে সব্যসাচী হিসাবে কাউকে চিহ্নিত করলে সৈয়দ আলী আহসান নামটিই প্রথম উচ্চার্য। তিনি একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, সমালোচক, গবেষক, শিল্পতত্ত্বজ্ঞ, অনুবাদক, দার্শনিক, নাট্যকার, ইতিহাসবিদ এবং ধর্মীয় পন্ডিতও বটে।

সৈয়দ আলী আহসান যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) আলোকদিয়া গ্রামে ১৯২২ সালের ২৬শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম সৈয়দ আলী হামেদ এবং আম্মার নাম সৈয়দা কামরুন্নেগার খাতুন। তাঁর পূর্বপুরুষ শাহ আলী বাগদাদী বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন।

লেখাপড়ার হাতে–খড়ি বাড়িতেই। তারপর ধামরাই ও আর্মানিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন। উচ্চ–মাধ্যমিক ও স্নাতক ঢাকা কলেজ থেকে। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম· এ· পাশ করেন।

১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন এম· এ· পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে সৈয়দ আলী আহসান ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কয়েক মাস শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫ সালে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। একই বছরে অল–ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট হিসাবে চাকরী গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন (১৯৪৯–৫৪)। সৈয়দ আলী আহসান ১৯৫৪ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এপদে কর্মরত থাকেন। ঐ ১৯৬০ সালেই তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। এই সাথে তিনি কলা অনুষদেরও ডীন ছিলেন। তিনি এ পদে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। সৈয়দ আলী আহসান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'–এর শব্দ সৈনিক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আহসান ১৯৭২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন (১৯৭২–৭৫)। অতঃপর তিনি পুনরায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর পদে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর সৈয়দ আলী আহসান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগদান করেন (১৯৭৫–৭৭)। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্টের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা (১৯৭৭–৭৮) হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮–৮৩ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং একই বছরে জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৯০–এর ডিসেম্বরে স্বেচ্ছায় চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি স্কুল জীবন থেকেই লেখা শুরু করেন। অনেক আকাঁশ (১৯৬০), একক সন্ধ্যার বসন্ত (১৯৬২), সহসা সচকিত (১৯৬৮), উচ্চারণ (১৯৬৮), আমার প্রতিদিনের শব্দ

www.pathagar.com

(১৯৭৩) তাঁর কবিতা গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতবৃত্ত (আধুনিকযুগ) [মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে] (১৯৫৬), কবিতার কথা (১৯৫৭), কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮), আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০), রবীন্দ্রনাথ; কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৬৩), মধুসূদন; কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ (১৯৭১) তার প্রবন্ধ সাহিত্য। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে পদ্মাবতী (১৯৬৮), মধূমালতী (১৯৭১) প্রভৃতি এবং অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রেমের কবিতা (১৯৬০), ইডিপাস (১৯৬৮), আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'কাব্য সমগ্র' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪-এ। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৫টি।

সৈয়দ আলী আহসান ১৯৫৮ সালে লন্ডনে ২৮তম আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৭ সালে টোকিওতে ২৯ তম আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে এবং ১৯৫৯ সালে ফ্রাঙ্কফোর্টে ৩০তম আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৬০ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে যোগ দেন। একই বছর ব্রাজিলে ৩১ তম আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে পাকিস্তান পক্ষের নেতৃত্ব দেন। ১৯৬১ সালে আমেরিকা সরকারের আমন্ত্রণ ক্রমে আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে ম্যানিলায় এশিয়ার লেখক সম্মেলনে তেহরানে ইউনেস্কো সেক্রেটারিয়েটের উপদেষ্টা হিসাবে ১৯৭৩ সালে কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে নাগপুরে বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে যোগ দেন এবং বুলগেরিয়া সরকারের আমন্ত্রণক্রমে বুলগেরিয়া ভ্রমণ করেন। একই বছরে মস্কোতে জাতিসংঘ সমিতির ২৫ তম সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে বৃটিশ কাউন্সিলের সম্মানিত অতিথি হিসাবে ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ছাড়াও আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী এবং ফরাসী সরকারের আমন্ত্রণে সে সব দেশ ভ্রমণ করেন।

১৯৬৮ সালে কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান, ১৯৬৯ সালে মৌলিক গবেষণার জন্য দাউদ পুরস্কার পেয়েও তা প্রত্যাখান করেন। ১৯৮৩ সালে একুশে পদক, ১৯৮৫ সালে নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতা পুরস্কার পান, ১৯৮৭ সালে দেশের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন, ১৯৮৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেন।

খন্দকার আবুল খায়ের (১৯২২ ...)

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন খন্দকার আবুল খায়ের মাগুরা মহকুমার পাট খালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ন'হাটা জুনিয়র মাদ্রাসা থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি জুনিয়র মাদ্রসা পাশ করেন। এরপর কলকাতার 'আকড়া দারুল উলুম কুদসিয়া মাদ্রাসা' থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এফ, এম, পাশ করেন। শিক্ষকতা জীবনে পুনরায় ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বহিরাগত ছাত্র হিসাবে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আই, এ পাশ করেন।

www.pathagar.com

কর্ম জীবনে তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেলেন। তবে সমাজসেবা মূলক কাজ, বই লেখা ও দ্বীনি দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। এরপর তিনি বড় বড় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং করছেন। তিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত 'ইসলাম প্রচার সমিতির' সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি কোরআন প্রচার সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি পাকিস্তানের শেষ দিকে মাগুরা থেকে উপনির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম, পি, এ নির্বাচিত হন।

তিনি এ পর্যন্ত ইসলামের ওপর মোট ৮২টি পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেছেন। তার মধ্যে ইতিমধ্যে ৬২ খানা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থের পাঠক সংখ্যাও ব্যাপক। কোন কোন বইয়ের বেশ কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই– পাকিস্তান হাসিলের উদ্দেশ্য (১৯৪৮)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী–ইসলাম ও কম্যুনিজমের আকীদা বিশ্বাস (১৯৫২), বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান, কলেমা তৈয়েবার বিপ্লবী দাওয়াত, সওয়াল ও জওয়াব (১–৯ খন্ড প্রকাশিত হয়েছে), দারসে কুরআন সিরিজ (এ পর্যন্ত ৩৭ খানা প্রকাশিত হয়েছে)। ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ওপর ১৩ খানা বই প্রকাশিত হয়েছে এবং ইসলামী রাজনীতির ওপর ৫ খানা বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৮৮ সাল থেকে শব্দে শব্দে অর্থসহ কোরআনের তফসীর লিখছেন, যার মধ্যে রয়েছে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪...)

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মাগুরা মহকুমার আলোকদিয়া গ্রামের বিখ্যাত সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সৈয়দ আলী আহসান–এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আলী হামেদ।

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ঢাকার নবাবগঞ্জের আজলা গ্রামের মামার বাড়ীতে। তিনি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার আর্মানীটোলা সরকারী হাইস্কুল থেকে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে আই, এ পাশ করেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি, এ অনার্স পাস করেন এবং গোল্ড মেডেল লাভ করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম, এ পাশ করেন এবং ঐ বছরই লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ঐ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে বি, এ অনার্স করার উদ্দেশ্যে বিলাত গমন করেন এবং সাফল্যের সাথে ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। তিনি সিনিয়র লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান ও রিডার হিসাবে কাজে যোগদান করেন। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা কালে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আলী আশরাফ 'নফীল্ড ফাউন্ডেশন' স্কলারশীপ নিয়ে পুনরায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

গমন করেন। তিনি সেখান থেকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং এক বছর সেখানে অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে সৌদি আরবের কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

ছাত্র জীবন থেকে সৈয়দ আলী আশরাফ লেখালেখির সাথে জড়িত। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'চৈত্র যখন' প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া রয়েছে 'কাব্য পরিচয়' (১৯৬৫), নজরুল প্রেমের এক অধ্যায় (১৯৬৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (১৯৬২), সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা (১৯৯১), রুবায়াৎ ই জহীনী (১৯৯১) ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও পন্ডিত আলী আশরাফ একজন দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তিত্ব। এ বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ইসলামী চরিত্রের এক অনুপম নিদর্শন।

অধ্যক্ষ মহম্মদ আবদুল হাই (১৯২৪—১৯৯২)

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহম্মদ আবদুল হাই যশোর খড়কীর বিখ্যাত পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খড়কীর পীর মরহুম আবুল খায়েরের তিনি দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং পরে এম, এম, কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন। এরপর ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পাশ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোর এম, এম, কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকার তাকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এম, এম, কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁরই প্রচেষ্টায় এম, এম, কলেজে বাংলা, অর্থনীতি ও ভূগোল বিভাগে সম্মান শ্রেণী চালু হয়। নানা চক্রান্তের শিক্ষার হয়ে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার কাররুদ্ধ হন এবং ১৪ মাস কারাগারে কাটান। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিলে পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতার হন এবং যশোর সেনানিবাসে নেয়া হয় কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

দেশ স্বাধীনের পর তাঁর বন্ধু মরহুম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান সাহেব ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে দৌলতপুর বি, এল, কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্তি দেন। দৌলতপুর কলেজে তিনিই বিভিন্ন বিষয়ে সম্মান চালু করেন। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি যশোর এম, এম, কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু এ পদে বহাল ছিলেন।

অধ্যক্ষ মহম্মদ আবদুল হাই ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (১৯২৫—১৯৮৫)

১লা জুলাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সদর মহকুমার মনিরামপুর থানার পাতন গ্রামে মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এনায়েতুল্লাহ মোড়ল। যশোর রাজঘাট হাই স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক, নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৫

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দে আই, এস, সি পাশ করেন। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে বি, এ, এবং ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ পাশ করেন।

কর্ম জীবনে তিনি আমৃত্যু শিক্ষকতার সাথে জড়িত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মনিরামপুর থানার মিয়া মফিজুদ্দীন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সাথেও জড়িত ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিলো প্রাণপ্রিয় মাতৃ ভূমিতে আল্লার রাজ প্রতিষ্ঠার। তিনি এক সময় যশোর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রচুর সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ করেছেন।

তাঁর এক মাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'সংস্কারক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)'। অপ্রকাশিত গ্রন্থ– সত্যের সন্ধানে আল কোরআন, ষড়যন্ত্রের ঘুর্নিবর্তে ইসলাম, ইসলামী দৃষ্টিতে বাস্তবমুখী অর্থনীতি, মতবাদ, গাদ্দার, ইমাম গাজ্জালী, (রঃ–এর জীবনী), তেপান্তর, ইলাহা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম (নাটক), ইহুদী ষড়যন্ত্র, দুঃখে যাদের জীবন গড়া প্রভৃতি।

তিনি ১৯৮৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

বেগম আয়েশা সরদার (১৯২৭–১৯৮৮)

দেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও সফল নেত্রী বেগম আয়েশা সরদার বাঘারপাড়া থানার খানপুর গ্রামে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী দলিল উদ্দীন আহমেদ। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যশোর শহর সংলগ্ন আরব পুর গ্রামের সোবরত আলী সরদারের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। জনাব সোবরত আলী সরদার যশোর শহরের একজন বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ছিলেন। বিবাহিতা জীবনে ঘরকন্যার সাথে সাথে তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যান এবং বি, এ পাশ করেন।

বেগম আয়েশা সরদার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যশোর নারী শিল্প আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি করোনেশন মেডেল এবং ঐ একই বছরে তিনি সাহিত্য ভূষণ খেতাব লাভ করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্যা হন এবং পর বছর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে এম, পি, এ নির্বাচিত হন। পাক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তমঘা–ই–খেদমত খেতাব লাভ করেন। ঐ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রমিক ফেডারেশনের খুলনা জোনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে 'শতদল' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বেগম সরদার যশোর সাংবাদিক সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে দু'দুবার চীন সফর করেন। এ ছাড়াও বেসরকারী ভাবে তিনি ১৮টি দেশ ভ্রমণ করেন।

বেগম সরদার ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে জুরাইন নিউট্রিশন প্রজেক্টের প্রশাসনিক অফিসার পদে কিছুদিন চাকুরী করেন এবং ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রজেক্টের তিনি পরিচালক পদে উন্নীত হন।

তিনি অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যশোর মহিলা কলেজ, কেশবপুর বালিকা বিদ্যালয়, এস, এস, ঘোপ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেবা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়, যশোর নিউটাউন বালিকা বিদ্যালয়, হৃদো প্রাইমারী ও জুনিয়র হাইস্কুল, নারিকেল বাড়িয়া বালিকা বিদ্যালয় এবং এনায়েতপুর মাদ্রাসা প্রভৃতি।

www.pathagar.com

এত কিছুর পরেও যে জিনিসটা বিস্ময়কর তা হল তিনি আপদমস্তক ছিলেন একজন সাহিত্যিক। 'মাসিক শতদল' এর সম্পাদনা ছাড়াও তিনি অনেক গল্প ও কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর ১৬টি গল্পের সংকলন ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটাই তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এরপর ১৩৬১ বঙ্গাব্দে কাব্যগ্রন্থ 'মায়া মুকুল' প্রকশিত হয়।

বেগম আয়েশা সরদার ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন।

ডঃ হাসান জামান (১৯২৮—১৯৮১)

১লা জানুয়ারী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ডঃ হাসান জামান ঝিনাইদহ মহকুমার কাঁচেরকোল গ্রামে মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণনাম আবুল হাসান মুহাম্মদ নুরুজ্জামান। তিনি 'ছিলেন শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক ও লেখক। তাঁহার পৈত্রিক বাড়ী ছিল যশোর জিলার মাগুরা মহকুমার তারা উজিয়াল গ্রামে। যশোর শহরের পুরাতন কসবায় তাঁহার একটি পেত্রিক বাড়ী আছে এবং সেখানে তাঁহার পিতার কবর আছে। তাঁহার পিতা ছিলেন রেজিষ্টার অব এ্যাসুরেন্সেস (Registrar of Assurances)।[১৮]

হাসান জামানের 'পিতামহ মুন্শী গয়রাতুল্লাহ একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি যশোর পৌর কমিটির একমাত্র মুসলিম সদস্য ছিলেন (১৮৬৪ খৃঃ)। তাঁহার একমাত্র পুত্র মুন্শী আবদুর রহীম একাধিকবার হজ্ব করেন এবং প্রায় ২০ বৎসর মধ্যপ্রাচ্যে কাটান। মুন্শী আবদুর রহীমের কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ মূসা হাসান জামানের পিতা। মুহাম্মদ মূসার আট পুত্র ও তিন কন্যা ছিল।[১৯]

হাসান জামান প্রথমে নড়াইল হাই স্কুলে, পরে যশোর জেলা স্কুল এবং আরো পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন। তিনি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম গ্রেডে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পাশ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম গ্রেডের বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে আই, এ পাশ করেন এবং কলেজের সেরা ছাত্র হিসাবে এ্যান্ডারসন গোল্ড মেডেল লাভ করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের বি, এ (সম্মান) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। পরে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি, এ (সম্মান) ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বছর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিল্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে দ্বীতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রকফেলার ফাউন্ডেশনের ফেলো হিসাবে (১৯৬১-'৬৪) 'Rise of the Muslim Middle class as Political Factor in India and Pakistan (1858-1947)' শিরোনামের গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনার কারণে তিনি পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে জনাব জামান ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২১ শে জানুয়ারীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং ১০ই অক্টোবর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে 'রিডার' পদে উন্নীত হন। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ডেপুটেশনে পাকিস্তান কাউন্সিলের ঢাকাস্থ অফিসে

www.pathagar.com

ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১লা জানুয়ারী ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১২ই মে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার (Bureau of National Reconstruction) পরিচালক পদে যোগদান করেন। 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৭২ সালের ১২ ই মে তাঁহাকে ভিন্ন মতাদর্শের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই সময়ে তাঁহাকে নিদারুণ অর্থ কষ্ট ও মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়।' ১ তিনি ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে সৌদী আরব গমন করেন এবং জেদ্দার আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। পরের বছর ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট মনোনীত হন। মাঝে মাঝে তিনি গবেষণাকর্ম উপলক্ষ্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট কেমব্রিজ থেকে জেদ্দা ফেরার পথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে লন্ডনে পরলোকগমন করেন এবং ২৯ শে আগষ্ট তাকে পবিত্র মক্কা নগরীতে দাফন করা হয়।

'একজন মননশীল গবেষক, লেখক ও সুবক্তা হিসাবে সুধীমহলে তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। দেশী-বিদেশী পত্রিকায়ও তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।' ১ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ গুলি হল- Human Impact of Technological Changh in East Pakistan (1951). Political Scince and Islam (1952), Fourteen points on Islamic Constitution (1953), The secular state and Islam (1954), Islamic Economics (1959), Bengali as a vehicle of Abstract Thought (1959), Baris of The Idcology of Pakistan (1961), Pakistan an Anthology (Compilation, 1964), Arab Discovery of America (ed. 1970), The menace of Farakka (1970), Produce or perish (ed. 1971) FmÄ The concept of minority (1981).

তাঁর বাংলা গ্রন্থ গুলি- ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৬১), পরবর্তী সংস্করণ- কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম (১৯৭০), ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ (অনুবাদ, ১৯৬০), সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য (১৯৬৭), ইসলামী অর্থনীতি (১৯৭০), ইসলামী শিক্ষা অগ্রগতির পথে (১৯৭১), আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৯৮০) এবং তাঁর সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থ দু'টি হল-শতাব্দী পরিক্রমা (১৯৭১) ও অমর একুশে (১৯৭১)।

এ ছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনার সাথেও জড়িত ছিলেন। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্মেলন পঠিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ- Religion and political reedom (International conference on cultural Freedorm. Karacli, 1956). Political Science and Islam (Islamic Culture Conference, Dhaka, 1952) The Writer and freedom (Cultural freedom symposium, Dhaka, 1957), The Basis of Islamic philosopay (Pakistan Philosophical congrass,Dhaka, 1987), The Muslim Movements before 1957 (Symposium on freedom struggle, Dhaka, 1957),

www.pathagar.com

Trends of our Literature and Culture (Cultural Symposium, Dhaka, 1955).

ডঃ হাসান জামান তমদ্দুন মজলিসের সদস্য হিসাবে বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ইসলামী একাডেমী ও বাংলা একাডেমীর তিনি সদস্য ছিলেন। 'সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ' নামে তিনি একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, নিরহংকার একনিষ্ঠ কর্মী এবং একজন আদর্শ মুসলিম। যাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিল বাঙালী মুসলমানদেরকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন করা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮ ...)

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ঝিনাইদহ মহকুমার দুর্গাপুর গ্রামে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফজলুর রহমান সিদ্দিকী।

নিজ গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে জিল্লুর রহমানের শিক্ষা জীবন শুরু। তিনি ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলা স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে আই, এ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বি, এ অনার্স এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এম, এ পাশ করেন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজের লেকচারার হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করেন। পরে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসাবে যোগদেন এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রীডার ও ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রফেসর হন। তিনি ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাঝে তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ কাব্য গ্রন্থ–হৃদয়ে জনপদে (১৯৭৫), চাঁদ ডুবে গেল (১৯৮৪), সমালোচনা গ্রন্থ–শব্দের সীমানা (১৯৭৬), আমার দেশ আমার ভাষা (১৯৮২)। অনুবাদ মিল্টনের অ্যারি ও প্যাজিটিকা (১৯৭১), সামসন অ্যাগনিসটিজ (১৯৭৩), সেক্সপীয়রের সনেট (১৯৭৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ–ফররুখ আহমদের হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬) এবং মুহূর্তের কবিতা (১৯৭৮)। ইংরেজী গ্রন্থ Literature of Bangladesh and other essays (১৯৮২)।

প্রবন্ধের জন্য তিনি ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে আলাওল পুরস্কার। এবং কবিতার জন্য তিনি ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' লাভ করেন।

জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর লেখার মধ্যে তাঁর অনুসন্ধিতসু হৃদয়ের গভীর পরিচয় সুস্পষ্ট।

www.pathagar.com

শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন (১৯২৯–১৯৭১)

মাগুরা মহকুমার শালিখা থানার শুরুশনা গ্রামে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ সিরাজুদ্দীন হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী মোজাহারুল হক জিরাজুদ্দীনের শৈশবকালেই ইন্তেকাল করেন। পিতার অবর্তমানে চাচা মৌলভী ইসহাক এম, এ, বি, টি সাহেবের তত্বাবধানে তাঁর লেখা পড়া শুরু হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মুর্শিদাবাদের নবাব ইনষ্টিটিউশনে। অবশ্য পরে তিনি যশোর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং যশোর এম, এম, কলেজ থেকে আই, এ পাশ করেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাশ করেন।

ছাত্রজীবন থেকে তিনি তাঁর চাচা মৌলভী ইসহাক সাহেব সম্পাদিত 'সৈনিক' পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। এরপর বি, এ, পড়ার সময় 'আজাদ' পত্রিকার প্রুফ রিডার হিসাবে কাজ শুরু করেন। বি, এ, পাশ করার পর ঐ পত্রিকায় সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক এর বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং আরো পরে কার্যনির্বাহী সম্পাদক হন। সাংবাদিক ইউনিয়নের জন্মলগ্ন থেকে সহ সভাপতি এবং পরবর্তী দুইবার সভাপতি ও পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী–ইতিহাস কথা কও, ছোট থেকে বড়, মহিয়ষী নারী। অনুদিত গ্রন্থ–পারমানবিক শক্তির রহস্য, আমার জীবন দর্শন, জার্মান রূপ কথা, অগ্নিপরীক্ষা, মানব জীবন ইত্যাদি।

ইংরেজী গ্রন্থ – A look in to the mirror.

তিনি ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন।

মুহাম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী (১৩২৭ ....)

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটে মামার বাড়ীতে শাহাদত আলী আনসারীর জন্ম। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল ঐ একই জেলার হাসনাবাদ থানায়। পরবর্তীতে তিনি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যশোরে স্থায়ীভাবে চলে আসেন।

শাহাদত আলী আনসারীর শিক্ষা জীবন ছিল ছেড়া ছেড়া এবং সংগ্রাম মুখর। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা জীবনের শুরু হলেও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই, এ এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয় থেকে বি, এ পাশ করেন। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ পাশ করেন। আবার ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ পাশ করেন। উল্লেখ্য তিনি সব পরীক্ষায় বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।

কর্ম জীবনে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেই শিক্ষকতা শুরু করেন। মাঝে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুদিন সরকারী চাকরী করেন। পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মবিলা সিনিয়র মাদ্রাসার ইংরেজীর

www.pathagar.com

শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বসুন্দিয়া হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। বি, এ পাশ করার পর ঐ বসুন্দিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন। তারপর ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে যশোর সম্মিলনি ইসষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সাতক্ষীরার পাটকেল ঘাটা হাঃ রঃ মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মাগুরার আড়পাড়া মহাবিদ্যলয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মাঝে তিনি যশোর সিটি কলেজ ও মহিলা কলেজেও খন্ড কালীন শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপনা করেছেন। অবশ্য ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে এখনও তিনি যশোর হোমিও প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের সন্ধাকালীন বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি একজন সফল হোমিও প্যাথিক ডাক্তার।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ– শ্রীমতির রণভঙ্গ (রম্য রচনা, মুক্তধারা, ১৯৭৭), স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও পরিবার পরিকল্পনা (বাংলাদেশ হোমিও প্যাথি বোর্ডের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী লিখিত, ১ম সংস্করণ ১৯৮০, এর পর বেশ কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছে।) মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান (১৯৮৭), বিশ্ব শান্তি ও ইসলাম (১৯৮৯)।

বর্তমানে তিনি তাঁর যশোর শহরস্থ বারান্দীপাড়া কদম তলার নিজ বাড়ীতে সপরিবারে বসবাস করছেন।

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শরীফ হোসেন (১৯৩৪ ...)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী মোহাম্মদ শরীফ হোসেন ১লা জানুয়ারী ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যশোর শহর সংলগ্ন খড়কী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শফিউদ্দীন আহমদ।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এম, এম, কলেজ থেকে আই, এ এবং ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করেন। এরপর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম, এ পাশ করেন।

পেশা হিসাবে তিনি অধ্যাপনাকে বেছে নেন এবং দীর্ঘদিন দৌলতপুর সরকারী বি, এল, কলেজে কর্মরত ছিলেন। তিনি যশোর এম, এম, কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।

তাঁর গ্রন্থাবলী,– যশোর পৌরসভার প্রথম পঞ্চাশ বছর, যশোর পাবলিক লাইব্রেরী, জনগণের জন্য লাইব্রেরী, রবীন্দ্রনাথের বড় খবর প্রসঙ্গে ইত্যাদি।

সমাজ সেবায় তাঁর নেশা। যশোরের অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁর হাতে গড়া, অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে এবং হচ্ছে। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি সমাজ সেবায় বিরল দৃষ্টান্ত রাখার জন্য যশোরের সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হয়েছেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ওসমান গণি (১৯৩৫–১৯৯১)

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর সদর মহকুমার চৌগাছা থানার কয়ারপাড়া গ্রামে ওসমান গণি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আবদুল করিম।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিক, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আই, এ, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ এবং পর বছর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে এল, এল, বি পাশ করেন।

ওসমান গণি আজাদ, ইত্তেফাক, মাসিক অগ্রদূত ইত্যাদি পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউটের এর উপ–পরিচালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং মৃত্যুর আগপর্যন্ত এ দায়িত্বেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জীবন সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাঙ্কারস এসোসিয়েশন ও ইসলামিক ইকোনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুরোরও তিনি সদস্য ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ– কত মানুষ কত মন, মুসলিম আইন, ফকির মজনু শাহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটকাকারে টেলিভিশনে প্রচারিত), Muktcarship Maual (ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত), হাজী শরীয়াতুল্লাহ (ঐতিহাসিক নাটক), মোহাম্মদ বিন কাশিম (ঐতিহাসিক নাটক), ফারাজী মুন্সীর জাম্বিল (রম্য রচনা) ও হপ্ত নামা (রম্য রচনা)।

অনূদিত গ্রন্থ–দি পীন্যাল কোড, পল্লী বাংলার ইতিহাস, বাংলার কৃষক, দি ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোর্ড, শহর থেকে দূরে, মন চলে যায়, লা–মিজার‍্যাবল, তোমার চিঠির জবাবে। অন্তরঙ্গ আলোকে আমেরিকার সৃজনশীল সাহিত্য ও মহাশুন্যের রহস্য সন্ধানে।

তিনি একাধারে সংগ্রাম, ইনকিলাব, মিল্লাত, আজাদ, নিউনেশন ইত্যাদি পত্রিকায় উপ–সম্পাদকীয় লিখতেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কলম ছিল অসধারণ তীক্ষ্ণ।

তিনি মনেপ্রাণে কামনা করতেন একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের। তিনি তাঁর সমস্ত লেখালেখিতে তারই প্রমাণ রেখে গেছেন। মোহাম্মদ ওসমান গণি গত ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামন (১৯৩৬ ..)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট যশোর শহর সংলগ্ন খড়কী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ শাহাদত আলী।

তিনি ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে আই, এস, সি এবং ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে বাংলায় অনার্স পাশ করেন। এরপর ঐ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পাশ করেন এবং অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং বর্তমানে এখানেই কর্মরত

www.pathagar.com

আছেন। তিনি ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী– দুর্লভ দিন (১৯৬১), শঙ্কিত আলোক (১৯৬৮), বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮), প্রতনু প্রত্যাশা (১৯৭৩), এমিলি ডিকিনসনের কবিতা (১৯৭৫), ভাল বাসার হাতে (১৯৭৬), অশান্ত অশোক (১৯৭৬), ইচ্ছে মতী (১৯৭৬), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্য সংগ্রহ (১৯৭৬), ভূমিহীন কৃষিজীবি ইচ্ছে তার (১৯৮৪), তৃতীয় তরঙ্গে (১৯৮৪), সঙ্গী বিহঙ্গী (১৯৮৪) ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ। অনির্বান (১৯৬৮), নির্বাচিত গান (১৯৮৪) গানের বই। এছাড়াও গীতি নাট্য, নাটক ও নাট্যানুবাদও তাঁর রয়েছে।

তাঁর গবেষনা মূলক গ্রন্থ– আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ঃ ১৮৫৭–১৯২০ (১৯৭০), আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র (১৯৬২), আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৯৬৫), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৭০), বাংলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব (১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ–যশোরের লোক কাহিনী (১৯৬৫), ঢাকার লোক কাহিনী (১৯৬৫), প্যারীচাঁদ রচনাবলী (১৯৬৮), মধুসূদন নাট্যগ্রন্থাবলী (১৯৬৯), মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী (১৯৭০), নজরুল সমীক্ষণ (১৯৭২), আমাদের লেখক প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী (১৯৭৪), মোফাজ্জল হায়দর রচনাবলী (১ম খন্ড ১৯৭৮, ২য় খন্ড ১৯৮২, ৩য় খন্ড ১৯৮৪) ইত্যাদি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। যেমন ইংরেজী, জার্মান, ফারসী, উর্দু, হিন্দি, রুমান ইত্যাদি ভাষায়। বিদেশী অনেক সংকলন গ্রন্থেও তাঁর কবিতা স্থান পেয়েছে।

কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্টারন্যাশনাল হজ হু ইন পোয়েট্রি, লন্ডন থেকে 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পান। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে সহিত্যকর্মের জন্য ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ১৯৭২ ও ৭৩–এর শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে 'জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ইতালির ইউনিভার্সিটি ডেলে আর্টি তাঁকে 'ডিপ্লোমা ডি মেরিটো' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতের বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ তাঁকে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে 'সাহিত্য উন্নয়ন রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করে এবং সম্মানসূচক সংসদ ন্যাশন্যাল প্রফেসর পদ প্রদান করেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য যশোর সুহৃদ সাহিত্য গোষ্ঠী তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করেছে এবং ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে যশোর সাহিত্য পরিষদ তাঁর 'ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার' কাব্য গ্রন্থের জন্য তাকে তাঁর নাম খচিত রৌপ্য ফলক ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করে।

'তাঁর গবেষণা ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী সুধী মহলের প্রশংসা লাভ করেছে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিমেয় নিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে।'[২০]

www.pathagar.com

ডঃ বদিউজ্জামান (১৯৪০ ...)

ঝিনাইদহ মহকুমার মহেশপুর থানার কাকলে দাঁড়ি গ্রামে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বদিউজ্জামানের জন্ম। তঁর পিতার নাম মহিউদ্দীন আহমদ।

গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষাজীবনের শুরু পরে কোটচাঁদ পুর হাইস্কুল থেকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে যশোর এম, এম, কলেজ থেকে আই, এ পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অনার্স সহ বি, এ পাশ করেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী কালে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সহিত্যে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর বিষয় ছিল 'ইসমাইল হোসেন শিরাজীঃ জীবন ও সাহিত্য'।

বাংলা একাডেমীর সহকারী গবেষণাধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর কর্মজীবনের শুরু, পরে তিনি গবেষণা বিভাগের পরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী– সিলেট গীতিকা (১ম খন্ড, ১৯৬৮), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক গ্রন্থ (১৯৬৯), মোমেনশাহী গীতিকা (১ম খন্ড, ১৯৭১), রংপুর গীতিকা (১ম খন্ড, ১৯৭৭), একুশের স্মৃতি–চারণ (১৯৮০), ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্যইত্যাদি।

বর্তমানে তিনি সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে কর্মরত আছেন।

ডঃ খোন্দকার রিয়াজুল হক (১৯৪০ ...)

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে খোন্দকার রিয়াজুল হক ঝিনাইদহ মহকুমার হরিণাকুণ্ড থানার হরিষপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তঁর পিতার নাম খোন্দকার লুৎফর রহমান।

জোড়াদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু হয় এবং জোড়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি আই, এ পাশ করেন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়া কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন এবং ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পাশ করেন।

খোন্দকার রিয়াজুল হক বি, এ পাশ করার পর পরই জোড়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি হরিণাকুন্ডুর লালনশাহ কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। পর বছর ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি বাংলা একাডেমীর লোক সাহিত্য বিভাগে অফিসার হিসাবে যোগাদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে সহকারী পরিচালক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে 'মরমী কবি পাঞ্জুশাহ' শীর্ষক গবেষনা কর্মের জন্য তিনি পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ লালন শাহের পুণ্যভূমি ঃ হরিশপুর (১৯৭২), লালন সাহিত্য ও দর্শন (১৯৭৬), ঝিনাইদহ জেলার মরমী কবি, মরমী কবি পাঞ্জুশাহ ইত্যাদি।

খোন্দকার রিয়াজুল হক তাঁর গবেষণা কর্ম অব্যাহত রেখেছেন, আশা করা যায় তাঁর কাছ থেকে আরো নতুন নতুন বিষয় আমরা জানতে পারবো।

www.pathagar.com

ডঃ এস এম লুৎফর রহমান (১৯৪১...)

মাগুরা মহকুমার শালিখা থানার খাটার গ্রামে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর এস এম লুৎফর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম মোহাম্মদ ইসরাইল সরদার।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কুলম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি, এ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এম, এ পাশ করেন। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে 'বাউল সাধনা ও লালন শাহ' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের জন্য তিনি পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি বুনাগাতী আমজাদ আলী হাই স্কুল ও কুলম হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে কিছু দিনের জন্য তিনি রাজশাহী বেতার কেন্দ্রেও কাজ করেন। এর পর মহতাব উদ্দীন কলেজে (ঝিনাইদহ), বাগের হাট পি, সি, কলেজে, দৌলতপুর বি, এল, কলেজ ও যশোর এম, এম, কলেজেও অধ্যাপনা করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ২৭শে অক্টোবর ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে যোগদান করেন এবং সেখানেই কর্মরত আছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অগ্নি বাংলা (কাব্য, ১৯৭২), দুদ্দুশাহ (১৯৮৯) ইত্যাদি।

'নৃতত্ব, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর লিখিত প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ধারনী' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

ডঃ সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৪৪ ...)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে নভেম্বর সৈয়দ আকরম হোসেন যশোর শহরের বারান্দী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম সৈয়দ আবুল কাশেম।

যশোর সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন থেকে তিনি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যশোর এম, এম, কলেজ থেকে আই, এ এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করেন। পরে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ চেতনা লোক ও শিল্পরূপ' শীর্ষক গবেষণা কর্মের জন্য ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

এম, এ পাশ করার পর পরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের লেকচারের পদে যোগদান করেন এবং বর্তমানে সেখানে তিনি এসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে কর্মরত আছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী– রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ দেশকাল ও শিল্পরূপ (১৯৬৯) ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ (১৯৮১)। সম্পাদিত গ্রন্থাবলী–চক্রবাকঃ কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৬৯), সোনার তরীঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৯), শেষের কবিতাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৯), মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ তিন সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্যে কর্ম, ১৯৭২) ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

পাদটিকা

১· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–পৃঃ ১০
২· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–পৃঃ১৬
৩· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্য যশোরের অবদান–পৃঃ ৩৮
৪· এস, এম লুৎফর রহমান–দুদ্দু শাহ–৩০ পৃঃ
৫· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–পৃঃ ৪৪
৬· মুহম্মদ আবূ তালিব–কিংবদন্তীর যশোর–পৃঃ ৫৮
৭· মুহাম্মদ আবূ তালিব–কিংবদন্তীর যশোর–৬১ পৃঃ
৮· খোন্দকার সিরাজুল হক–মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম–পৃঃ ৩৯৩
৯· সাঈদ–উর রহমান–পূর্ব বাংলার রাজনীতি–সংস্কৃতি ও কবিতা–পৃঃ ১৩৩
১০· সাঈদ–উর রহমান–পূর্ব বাংলার রাজনীতি–সংস্কৃতি ও কবিতা–১৩৩
১১· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–১০০ পৃঃ
১২· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্য যশোরের অবদান–১২৭ পৃঃ
১৩· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–পৃঃ ১২৭
১৪· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–পৃঃ ১৪১
১৫· সাঈদ–উর রহমান–পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা–পৃঃ১৫৯
১৬· আবদুল মান্নান সৈয়দ–ফররুখ আহমদ–পৃঃ ১৪
১৭· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–পৃঃ ১৫১
১৮· ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ–সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট– পৃ– ১৩০
১৯· ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ–সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকেষ পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৩১
২০· মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী–বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান–পৃঃ ২১১
২১· মুহম্মদ ইসলাম গণি–যশোর জেলার মুসলিম মনীষী (পাণ্ডুলিপি)

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষায় যশোর

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মুটামুটি দু'টি ধারায় বিভক্ত একটি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারা হিসাবে বর্তমানে স্বীকৃত। প্রচলিত অন্য ধারার সাথে তাল মিলিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব চরিত্র নিয়ে তা প্রবাহিত। ইতিমধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা এ প্রবন্ধে যশোরের মুসলিম মনীষীগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আর্থিক কোরবাণী দিয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালাবার চেষ্টা করেছেন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, সে প্রতিষ্ঠান গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এতে মাদ্রাসা ছাড়াও কিছু কিছু স্কুল কলেজকেও স্থান দেয়া হবে।

ইসলামী শিক্ষা কবে থেকে কিভাবে শুরু হয়েছে সে ইতিহাস অবশ্যই ইসলামের আগমন ও ইসলাম প্রচারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐশী বিধান ইসলামের অনুপম শিক্ষায় আরবদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য ঘরের বার হতে অনুপ্রাণিত করে এবং তারা দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত উপমহাদেশের মাটিতে বিজেতা হিসাবে যে মুসলিম বীর পা রাখেন, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলেন তরুণ সেনাপতি মুহম্মদ ইবনে কাসিম। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাব জয় করেন। 'মুসলমানরা যেখানেই গেছেন সেখানেই স্থাপন করেছেন মসজিদ এবং অচিরে প্রতি মসজিদে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ইসলাম ও শিক্ষা ছিলো প্রায় অবিচ্ছেদ্য মুসলিমদের ন্যায়বিচার সততা, সাম্য, দয়া ও সহানুভূতি ইত্যাদি সদগুণ দেখে বিজিত জাতির অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো। তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেবার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা মসজিদেই করা হতো। ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হতো বা তার সঙ্গেই মাদ্রাসা ভবন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য আবাসিক গৃহ নির্মাণ করা হতো।'[১]

ভারত উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে কবে কোথায় মাদ্রাসা শিক্ষা শুরু তার কোন দলিল আপাতত আমাদের সামনে নেই। তারীখ-ই-ফিরিশতায় উল্লেখ করা হয়েছে, এ উপমহাদেশের প্রথম মাদ্রাসা মুলতানে নির্মিত হয়েছিল। নাসিরুদ্দীন কাবাচা সম্ভবত কতুবুদ্দীন কাশানীর (জঃ ৫৭৮ হিঃ) জন্য মাদ্রাসা ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন।[২]

আর বাংলাদেশে সরকারী ভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন হয় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয়ের পর। 'তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র

১· মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ-পৃঃ ১৮

২· মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ-পৃঃ ২০

www.pathagar.com

থেকে প্রমাণিত হয় যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই এ দেশে ইসলাম এসেছিলো। খৃষ্টীয় নবম শতকেই বাংলাদেশের কোনো কোন স্থানে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিতহয়েছিল।[৩] বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথমত পীর দরবেশদের ভূমিকায় ছিল মুখ্য। খৃষ্টীয় নবম ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে যে সমস্ত সুফী দরবেশ বঙ্গভূমিতে এসে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, চিল্লাখানা ইত্যাদি স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা হলেন চট্টগ্রামে হযরত বায়জীদ বুস্তামী (মৃ· ৮৭২ খৃঃ), ঢাকা ও বগুড়ায় হযরত সুলতান মাহমুদ আল বলখী (রঃ), ময়মনসিংহে শায়খ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (রঃ), ঢাকার শায়খ বাবা আদম শহীদ (রঃ), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকান (রঃ), পাবনায় মাখদুম শাহ দাওনী (রঃ)প্রমূখ।

আবুল হাসনাত নদ্‌বী ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, উৎকর্ণ লিপি, শিলালিপি, বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ইত্যাদি সূত্র থেকে ভারতের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এ তালিকাটি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি যে কেন্দ্র গুলোর নাম উল্লেখ করেছেন তা হল মুলতান ও উচা, আজমীর ও দিল্লী, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার, দাক্ষিণাত্য, মালব, কাশ্মীর, গুজরাত, সুরাত এবং বঙ্গদেশ।

'ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার বঙ্গদেশ জয় করে রাজধানী নদীয়া পর্যন্ত দখল করেন। তিনি রংপুরে নয়া রাজধানী স্থাপন করে সেখানে কিছু মসজিদ মাদ্রাসা এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাংলার সুবাদার পদে আসীন হয়েই লক্ষণাবতীতে একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা এবং একটি মুসাফিরখানা স্থাপন করেন। উমরপুর নামে একটি গ্রামে এখনো দর্‌সা বাড়ি (বা শিক্ষা ভবন) নামে একটি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। একটি শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে তা থেকে য়ুসুফ শাহী আমলে তা নির্মিত হয়েছিলো বলে জানা যায়। অস্থিপুরে একটি মাদ্রাসা ছিলো যার ধ্বংসাবশেষ এখনো টিলার মাদ্রাসা নামে পরিচিত। গৌড়ে সাগরদীঘির উত্তর তীরে একটি চতুস্কোণ ভবনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে এটা একটি মাদ্রাসা ছিলো। মনে হয় এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুসায়ন শাহ। মাদ্রাসাটির একটি বিরাট সুন্দর ও প্রশস্ত ভবন ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্থানে স্থানে মর্মর ও লাল প্রস্তরের নিদর্শন পাওয়া যায়। রিয়াযুস – সালাতীন–এর লেখক গুলাম হুসায়নের ঘোড়াশহীদ মহল্লায় অবস্থিত গৃহের কাছে একটি মাদ্রাসার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যার ফলক লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ৯০৭ হিজরীতে হুসায়ন শাহ নির্মাণ করেছিলেন[৪] এমনি ভাবে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটে।

কবে কিভাবে যশোরে ইসলামী শিক্ষা শুরু হয় তার দিন তারিখ সঠিক করে বলা আপাতত সম্ভব নয়। তবে এতটুকু অন্তত বলা যায় যে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ারের বাংলাদেশের রাজধানী নদীয়া বিজয়ের পর পার্শ্ববর্তী যশোর অঞ্চলে ইসলাম

৩· মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ–পৃঃ ২০

৪· মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ–পৃঃ ২৬–২৭

www.pathagar.com

প্রচারের বাতাস লাগতে দেরী হয়নি। ঠিক এ সময়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে যিনি চির স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি হলেন হযরত বড়খান গাজী (রঃ)। যিনি গাজী কালু চম্পাবতী এ তিনটি নামের সাথে জড়িত হয়ে আছেন। তিনি ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়কে পরাজিত ও হত্যা করেন। পরে রাজকন্যা চম্পাকে বিবাহ করে বারবাজারে আস্তানা গাড়েন। এ সময় 'গাজীর প্রচেষ্টায় বারোবাজারে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বারোবাজারে। এখান থেকেই তাঁরা ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন তদানিন্তন দক্ষিণ বাংলায়। তাঁদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজও নীরব নিথর হয় আছে বারোবাজার।[৫] আমাদের ধারণা এবং যতদূর সম্ভব এটাই সঠিক যে হযরত বড়খান গাজীর এ মসজিদ কে কেন্দ্র করেই যশোর অঞ্চলে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষার যাত্রা শুরু। কারণ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, 'উপমহাদেশে আগত মুসলিমগণ অন্যান্য মুসলিম দেশের মতোই মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।[৬] এরপর হযরত খান জাহান আলী (রঃ)–এর সময়ে বারবাজার তথা সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে ইসলাম ছিল সম্পূর্ণ রূপে রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে। ফলে এ অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ মক্তব গড়ে ওঠে, প্রসার ঘটে ইসলামী শিক্ষার। খান জাহান আলী (রঃ)–এর নির্মিত মসজিদ গুলো এখনো কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদ গুলোর সাথে যে মক্তব পরিচালিত হত তার প্রমাণ বারবাজারের জোড় বাংলা মসজিদ। এখানে পাশাপাশি দু'টি ভবনের অস্তিত্ব দেখা যায়। দু'টি মসজিদ ত পাশাপাশি হয় না। আসলে এর একটি মসজিদ, অপরটি মক্তব। এমনি ভাবে বিভিন্ন সময়ে আগত ও স্থানীয় ইসলাম প্রচারক এবং মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের সহযোগিতায় ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা মক্তব শিক্ষা অব্যাহত থাকে। কলকাতা মাদ্রাসা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হুগলী মাদ্রাসা এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে যশোরে কোন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার খবর জানা যায় না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের প্রচেষ্টায় যশোর জেলায় যে উচ্চ ইংরেজী (এইচ, ই) বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি হল, বর্তমানের ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। যদিও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা যায় নি। তবে এতটুকু জানা গেছে যে, 'ভুটিয়াগাতী নিবাসী বিদ্যোৎসাহী জমিদার মৌলভী মোঃ আবদুল কাদের মিয়া প্রথম বিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণ জমি দান করেন। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি সরকারী করণ করা হয়।

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজ সংস্কারক ও ইসলাম প্রচারক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ যশোর মনোহরপুর গ্রামে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'মাদ্রাসায়ে কারামতিয়া' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আপতত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় এটিই যশোরের প্রথম স্বীকৃত মাদ্রাসা। বর্তমানে এটিই 'মুন্সী মেহেরুল্লাহ একাডেমী'। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি

৫· যশোরাদ্য দেশ– হোসেন উদ্দীন হোসেন

৬· মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ–পৃঃ ২৯

www.pathagar.com

মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে যশোর শিক্ষা বোর্ড কতৃক স্বীকৃতি লাভ করে। এর পর ঝিনাইদহে মরহুম ওয়াজির আলী সরদার এলাকার মুসলমান সমাজকে ইসলামী চিন্তা চেতনায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য নিজস্ব জমিতে নিজ ব্যয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটি নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসাটিকে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটিই বর্তমানে 'ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী উচ্চবিদ্যালয়।'

এরপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মনিরামপুর থানার রাজগঞ্জে মোঃ তবিবুর রহমান (তৎকালীন সদর মহকুমা হাকিম), মোঃ ইউছুফ আলী (তৎকালীন রাজগঞ্জ রেজিষ্ট্রি অফিসের সাবরেজিষ্টার) ও মোঃ আসমতুল্যা গাজী এলাকার জন্য 'রাজগঞ্জ মধ্য ইংরেজী' (এম, ই) স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্কুলটি রামগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী (এইচ, ই) স্কুলে উন্নীত হয়।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে মরহুম শাহসুফী পয়মল শাহ ঝিকরগাছা থানার রঘুনাথপুর গ্রামে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় একটি জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কালে রঘুনাথপুর গ্রামের ফেরাজতুল্যা মোড়ল ৫ বিঘা জমি দান করেন। মাদ্রাসাটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

মাগুরার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় মুসলিম জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শহরের কেন্দ্র স্থলে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসাটি কলকাতা মাদ্রাসা বোর্ড থেকে 'মাগুরা হাই মাদ্রাসা' হিসাবে অনুমোদন লাভ করে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে এটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয় এবং 'মাগুরা একাডেমী' নাম ধারণ করে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ঝিকরগাছার মরহুম হাজী বদরুদ্দীন এ এলাকার মানুষকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য একটি জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এটি হাই মাদ্রাসায় উন্নীত হয় এবং আরো পরে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এটি বদরুদ্দীন মুসলিম হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়।

নড়াইলের প্রখ্যাত আইনজীবী, সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ মরহুম মোজহার উদ্দিন চৌধুরী ও মরহুম মুন্সি ওয়ালিউর রহমানের প্রচেষ্টায় এলাকার মুসলিম মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নড়াইল টাউন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টিকে সরকারী করণ করা হয়।

বাঘারপাড়া থানার কয়াল খালী গ্রামের মরহুম আফতাব উদ্দীন ও মরহুম মৌঃ ওমেদ আলী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রায়পুর গ্রামে একটি প্রাথমিক মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে

www.pathagar.com

মক্তবটি উচ্চ প্রাথমিক (ইউ, পি) বিদ্যালয়ে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে মধ্য ইংরেজী (এম, ই), ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে নিম্ন মাধ্যমিক এবং ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রামের মৌলভী মোঃ ইসমাইল হোসেন এলাকার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টির প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন এস এম আতিয়ার রহমান। বর্তমানে বিদ্যালয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

মাগুরা মহকুমার কোতয়ালী থানার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, তৎকালীন আইন পরিষদের সদস্য মরহুম মৌলভী আবদুল আউয়াল ১৯৩৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বেরইল দারুল হুদা জুনিয়র মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি ১-১-১৯৩৮ ইং সনে জুনিয়র মাদ্রাসা হিসাবে, ১-১-১৯৪৭ সনে আলিম হিসাবে ডি· পি· আই· প্রেসিডেন্সী বিভাগ কলকাতা কতৃক মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়। রেজিস্ট্রার পূর্ব পাকিস্তান ঢাকা কতৃক ১-১-১৯৫০ দাখিল হিসাবে রূপান্তরিত এবং ১-১-১৯৮৭ সনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কতৃক ফাজিল হিসাবে মঞ্জুরী পায়।

গাজী কালু চম্পাবতী ও হযরত খান জাহান আলী (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত বারবাজারের মরহুম আবদুর রহমান, মরহুম কাশেম আলী বিশ্বাস, মরহুম নিয়ামত আলী মৃধা প্রমূখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এলাকার মুসলমানদের ভেতর শিক্ষার আলো প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

মনিরামপুর থানার লাউড়ী গ্রামের মরহুম মৌলভী নূর মোহাম্মদ গ্রাম বাসীর সহযোগিতায় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে লাউড়ী রামনগর মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসাটি মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। এরপর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আলিম, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ফাজিল এবং ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে কামিল হিসাবে মুঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। মাদ্রাসাটি যশোরের একটি অন্যতম প্রধান মাদ্রাসা।

বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও শিক্ষাবিদ মরহুম অধ্যক্ষ মৌঃ মোঃ মোখলেসুর রহমান মাগুরা শহরে ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের দিকে প্রতিষ্ঠা করেন মাগুরা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। জনাব মোখলেসুর রহমান কলেজটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৩০-৬-১৯৭৮ সন পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কলেজের সঙ্গে সাধারণ আই, এ কোর্স চালু করা হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কলেজটি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয় এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজের মর্যাদা পায়। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে কলেজটিকে সরকারী করণ করা হয়।

মনিরামপুর থানার গোপালপুর গ্রামের মরহুম পরশ উল্লাহ গাজী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নিজ গ্রামে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসাটি সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৫১-৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসাটি হাই মাদ্রাসা হিসাবে পরিচালিত হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে এটি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

www.pathagar.com

কেশবপুর থানার নারায়ণপুর গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী মরহুম আনিসুর রহমানের প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে নারায়ণপুর গ্রামে একটি এম, ই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে জুনিয়র মাদ্রাসায় ও ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এর পর ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ঝিকরগাছা থানার বাকড়া গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবী মরহুম জোনাব আলী খান (তিনি বাকড়া ইউনিয়ন বোর্ডের দীর্ঘ দিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।) নিজ গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল (এম, ই) প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যালয়টি ১৯৫৭ সনে নিম্ন মাধ্যমিক এবং ১৯৬৫ সনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

নড়াইল মহকুমার কালিয়া থানার বাগুডাঙ্গা গ্রামে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে পাশের গ্রামেও একটি জুনিয়র মাদ্রাসা হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বাগুডাঙ্গা গ্রামের মরহুম আফসার উদ্দীন মোল্লা মাদ্রাসা দু'টিকে একত্রিত করে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই সি, এম, বি, ইউনিয়ন বহমূখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

এই হচ্ছে মোটামুটি যশোরে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন আমরা বৃহত্তর যশোরে যে মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা বোর্ড কতৃক অনুমোদিত হয়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে সমস্ত মাদ্রাসার নাম, ঠিকানা, মাদ্রাসার ধরণ, অনুমোদনের সময় শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, অনুমোদনের তারিখ ও স্বীকৃতির তারিখ ইত্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমাদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী বৃহত্তর যশোর জেলায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড কতৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত মোট ১৮১টি দাখিল মাদ্রাসা, ২০টি আলিম মাদ্রাসা, ১৯টি ফাজিল মাদ্রাসা ও ৬টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। এখানে যে বিষয়টি জেনে রাখা দরকার তা হল– মাদ্রাসাগুলোর অনুমোদনের তারিখই প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়। এমন অনেক মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলো বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কলকাতা শিক্ষা বোর্ড কতৃক অনুমোদিত হয়েছে, পাকিস্তান সরকার কতৃক অনুমোদিত হয়েছে আবার বাংলাদেশ সরকার কতৃক অনুমোদন লাভ করেছে। তা'ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কতৃক অনুমোদিত নয় এমন অনেক মাদ্রাসা রয়েছে। রয়েছে প্রচুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও মক্তব আর আছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খারেজী মাদ্রাসা, যে গুলি দীর্ঘদিন ধরে দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে আসছে। বিশেষ করে খারেজী মাদ্রাসাগুলোর ওপর একটি তথ্যভিত্তিক আলোচনা কাম্য ছিল কিন্তু তা এখন সম্ভব হল না, ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

www.pathagar.com

মনিরামপুর

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
১।	পাতন দাখিল মাদ্রাসা	মনিরামপুর	দাখিল	১৮৬	১৩	১-১-৮৭
২।	খানপুর সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	খানপুর	দাখিল	২৮৭	১৩	১-১-৮৬
৩।	কুমারঘাটা দাখিল মাদ্রাসা	মনোহরপুর	দাখিল	৩৮৫	১৩	১-১-৮৭
৪।	শাহ আলী সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	পাঁচাকড়ি	দাখিল	৩৪৬	১৩	১-১-৮৭
৫।	গরিবপুর চাঁদপুর দাঃ মাদ্রাসা	হেলঞ্চী	দাখিল	২৯৪	১৩	১-১-৮৫
৬।	বাসুদেবপুর সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	রোহিতা	দাখিল	৩৮৯	১৩	১-১-৮৫
৭।	কোঁদলাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	রোহিতা	দাখিল	২৯২	১৩	১-১-৮৫
৮।	ঝাঁপা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঝাঁপা	দাখিল	৩১৫	১৩	১-১-৮৭
৯।	হাজরাকাঠী আহমদিয়া দাঃ মাদ্রাসা	বেগমপুর	দাখিল	৩১৫	১৩	১-১-৮৬
১০।	চাকলা মহিলা দাঃ মাদ্রাসা	পারখাজুরা	দাখিল	৩১৩	১৩	১-১-৮৭
১১।	টুনিয়া ঝরা বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	চালকীডাংগা	দাখিল	৩০৫	১৩	১-১-৮৭
১২।	রতনদিয়া ইসঃ বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	নেংগুরাহাট	দাখিল	২৭২	১৩	১-১-৮৭
১৩।	মদনপুর দাখিল মাদ্রাসা	মদনপুর	দাখিল	২৭৯	১৩	১-১-৮৭
১৪।	সুন্দলপুর আগরহাঠী সাহাঃ মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	লাউড়ী	দাখিল	৩১৫	১৩	১-১-৮৭
১৫।	শ্রীপুর আদর্শ বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	ঢাকুরীয়া	দাখিল	৪৬২	১৩	১-১-৮৬
১৬।	নোয়ানী কাঠালতলা দাঃ মাদ্রাসা	পারখাজুরা	দাখিল	৩১৫	১৩	১-১-৮৬
১৭।	মনিরামপুর বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	মনিরামপুর	দাখিল	২২৪	১৩	১-১-৮৬
১৮।	পার খাজুরা সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	পারা খাজুরা	দাখিল	৩১৫	১৩	১-১-৮৬
১৯।	বাগডোব দাখিল মাদ্রাসা	রোহিতা	দাখিল	২৬৫	১৩	১-১-৮৬
২০।	বলিধা পাচাকড়ি দাখিল মাদ্রাসা	পাচাকড়ি	দাখিল	৩১৮	১৩	১-১-৮০
১।	লাউকুন্ডা এলাহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	সাগুরাহাট	আলিম	৩২৭	১৯	১-৭-৮১
২।	চাকলা সিনিয়র মাদ্রাসা	পার খাজুরা	আলিম	২৬৫	১৭	১-৭-৭৮
৩।	মনিরামপুর সিনিয়র মাদ্রাসা	মনিরামপুর	আলিম	৩৬৭	১৫	১-৭-৮৫
১।	খেদাপাড়া গাংগুলিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	খোদাপাড়া	ফাজিল	৪৫৭	২২	১-৭-৮৫
২।	জালঝাড়া সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	চালকীডাংগা	ফাজিল	৩৫৭	১৬	১-৭-৭১
৩।	নেংগুরাহাট ফাজিল মাদ্রাসা	নেংগুড়াহাট	ফাজিল	৫৫৯	১৮	১-৭-৬৩
১।	লাউড়ী রামনগর আলিয়া মাদ্রাসা	লাউড়ী	কামিল	৪৫৫	২০	১-৭-৮৭

www.pathagar.com

বাঘার পাড়া

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
১।	ওয়াদিপুর দাখিল মাদ্রাসা	জংগল বাধাল	দাখিল	৩১২	১৩	১-১-৮৮
২।	ছোট খুদ রাঃ আঃ হাই দাঃ মাদ্রাসা	বর্নবিলা	দাখিল	২৮১	১৩	১-১-৮৮
৩।	শেখের বাতান দারুস সুন্নত দাঃ মাদ্রাসা	বাঘারপাড়া	দাখিল	৩২০	১৩	১-১-৮৭
৪।	ভিটা মোল্লা ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	জামদিয়া	দাখিল	৩০২	১৩	১-১-৮৮
৫।	ছাতিয়ানতলা দাঃ মাদ্রাসা	ছাতিয়ানতলা	দাখিল	৩২৩	১৩	১-১-৮৬
৬।	বারভাগ দাখিল মাদ্রাসা	বসুন্দিয়া	দাখিল	৩০৩	১৩	১-১-৮৬
৭।	রাধা নগর আমিনিয়া দাঃ মাদ্রাসা	জংগল বাধাল	দাখিল	৩০৩	১৩	১-১-৮৬
৮।	দয়ারামপুর সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	নারিকেল বাড়ীয়া	দাখিল	১৯৬	১৩	১-১-৮৬
৯।	জয়নগর মহিঃ সুন্নত দাঃ মাদ্রাসা	রায়পুর	দাখিল	৩০১	১২	১-১-৮৭
১০।	ভদ্রডাংগা বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	গৌরনগর	দাখিল	২৮৪	১৩	১-১-৮৭
১১।	দূর্গাহ পুর দাখিল মাদ্রাসা	গৌরনগর	দাখিল	২৬৬	১৩	১-১-৮৭
১২।	আজমপুর ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	রামপুর	দাখিল	৩৭৮	১৩	১-১-৮৮
১৩।	পশ্চিম বলরাম দাখিল মাদ্রাসা	নারিকেলবাড়ীয়া	দাখিল	১৪৫	১৩	১-১-৮৬
১৪।	খানপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা	নারিকেলবাড়ীয়া	দাখিল	২০৯	১৩	১-১-৮৫
১৫।	মাহমুদপুর দাখিল মাদ্রাসা	চাড়াভিটা	দাখিল	২৪১	১৩	১-১-৮৪
১।	উত্তর চাঁদপুর আলিম মাদ্রাসা	ছান্দরা	আলিম	২৯৭	১৬	১-১-৭৮
২।	খাজুরা ইসলামিয়া সিঃ মাদ্রাসা	গৌরনগর	আলিম	৩১২	১৮	১-৭-৮৭
১।	দূর্ঘাপুর ফাজিল মাদ্রাসা	দূর্গাপুর	ফাজিল	৩৮২	২২	১-৭-৮৬
২।	বাঘারপাড়া সিদ্দিকীয়া সিঃ মাদ্রাসা	বাঘারপাড়া	ফাজিল	৪৪৫	২৩	১-৭-৭৭

অভয়নগর

১।	মথুরাপুর দাঃ মাদ্রাসা	শ্রীধরপুর	দাখিল	৩৬৭	১৩	১-১-৮৮
২।	চাপাতলা চেংগুটিয়া দাঃ মাদ্রাসা	চেংগুটিয়া	দাখিল	২৮৯	১৩	১-১-৮৭
৩।	নওয়াপাড়া হিজবুল্লাহ দাঃ মাদ্রাসা	নওয়াপাড়া	দাখিল	৩৯৪	১৩	১-১-৮৬
৪।	আড়পাড়া সৈয়দিয়া বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	নায়রাহাট	দাখিল	৩০১	১৩	১-১-৮৭
৫।	মাগুরা সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	মাগুরাহাট	দাখিল	৩০২	১৩	১-১-৮৭

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
৬।	বাহিরঘাট মেছেরিয়া দাঃ মাদ্রাসা	চেংগুটিয়া	দাখিল	৩২০	১৩	১-১-৮৭
৭।	বাসুয়াড়ী দাঃ মাদ্রাসা	ভূগিলহাট	দাখিল	৩৮২	১৩	৩-৭-৮১
৮।	পাথালিয়া সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	শ্রীধরপুর	দাখিল	৩৪৯	১৩	১-১-৭৯
৯।	হিদিয়া দাঃ মাদ্রাসা	হিদিয়া	দাখিল	৩৫৩	১৪	১-১৮৮
১।	পায়রা ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	পায়রাহাট	আলিম	৪০১	১৯	১-৭-৮৭
২।	কোটা ইসলামিয়া সিঃ মাদ্রাসা	পায়রাহাট	আলিম	৪৭১	১৯	১-৭-৭৮
১।	গাজীপুর রউফিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	রাজঘাট	ফাজিল	২৯০	১৩	১-৭-৬৫

ঝিকরগাছা

১।	দিগদানা খোগল নগর দাঃ মাদ্রাসা	মাঠশিয়া	দাখিল	৩৪২	১৩	১-১-৮৭
২।	শ্রীরামপুর সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	ঝিকরগাছা	দাখিল	৩১৭	১৩	১-১-৮৭
৩।	করিমআলী রঘুনাথপুর আঃ খালেক দাখিল মাদ্রাসা	যাদবপুর	দাখিল	৩০১	১৩	১-১-৮৬
৪।	কুনিয়া সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	রঘুনাথপুর	দাখিল	২৬৪	১৩	১-৯-৭৮
৫।	বাকরা মুকুন্দপুর দাঃ মাদ্রাসা	মাঠশিয়া	দাখিল	২৬৪	১৩	১-১-৮৮
৬।	আলহাজ্ব রফি উদ্দিন দাঃ মাদ্রাসা	ঝিকরগাছা	দাখিল	৩৫২	১৩	১-১-৮৮
১।	গাজীর দরগা ফয়েজাবাদ ফাজিল মাদ্রসা	গাজীর দরগা	ফাজিল	৪৬৬	২২	১-৭-৭৬
২।	ঝিকরগাছা দারুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা	ঝিকরগাছা	ফাজিল	৩৮৩	১৮	৪-২-৭৬

যশোর সদর

১।	যশোর মহিলা দাঃ মাদ্রাসা	যশোর	দাখিল	৪৭৫	১৪	১-১-৮৬
২।	উপ-শহর দাখিল মাদ্রাসা	যশোর	দাখিল	৩৪৯	১৩	১-১-৮৮
৩।	সিংগীয়া হাফেজিয়া দাঃ মাদ্রাসা	জংগলবাধাল	দাখিল	৩৫২	১৩	১-১-৮৭
৪।	তপসীডাংগা ইসঃ দাঃ মাদ্রাসা	চাঁচড়া	দাখিল	২৯৭	১৩	১-১-৮৭
৫।	কল্যাণদাহ গোয়ালদহ দাঃ মাদ্রাসা	গোয়ালদহ	দাখিল	২৮৪	১৪	১-১-৮৬
৬।	হাগলাডাংগা শাহ বাকের উল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা	ফতেপুর	দাখিল	৩২২	১৪	১-১-৮৬

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
৭।	সিরাজসিংগা দাঃ মাদ্রাসা	কুয়াদা বাজার	দাখিল	৪০৯	১৩	১-১-৮৬
৮।	দারুচ্ছুন্নত মোজাঃ দাঃ মাদ্রাসা	রাজারহাট	দাখিল	৩২৭	১৩	১-১-৮৬
৯।	হামিদপুর দারুল উলুম দাঃ মাদ্রাসা	রাজারহাট	দাখিল	৩২২	১৩	১-১-৮৭
১০।	মীরপুর ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	চুড়ামনকাঠী	দাখিল	২৬৫	১৫	১-১-৮৭
১১।	ভাটপাড়া দাঃ মাদ্রাসা	রাজারহাট	দাখিল	২৪৯	১৪	১-১-৮৭
১২।	শাখারীগাতী মহিলা দাঃ মাদ্রাসা	রুপদিয়া	দাখিল	৪৪০	১৩	১-১-৮৭
১৩।	জিরাট দাখিল মাদ্রসা	রুপদিয়া	দাখিল	২৮৩	১৩	১-১-৭৯
১৪।	আদারীয়া দাঃ মাদ্রাসা	জহুরপুর	দাখিল	৩০০	১৩	১-১-৭৮
১৫।	তীরেরহাট দাঃ মাদ্রাসা	তীরেরহাট	দাখিল	২৮৩	১২	১-১-৭৭
১৬।	ফুলতলা আবেদীয়া দাঃ মাদ্রাসা	বারীনগর	দাখিল	২৮৮	১৩	১-১-৭৭
১৭।	চান্দুটিয়া মাইনুল ইসলাম দাঃ মাদ্রাসা	চান্দুটিয়া	দাখিল	২৬৪	১১	১-১-৭৯
১৮।	বনগ্রাম গাইদ গাজী দাঃ মাদ্রাসা	জংগলবাধাল	দাখিল	২৬৮	১৩	১-১-৮০
১৯।	দোগাছীয়া আহঃ দাঃ মাদ্রাসা	দোগাছীয়া	দাখিল	২৩৯	১৪	১-১-৭৯
২০।	ছাতিয়ানতলা কে, আই, দাঃ মাদ্রাসা	চুড়ামনকাঠী	দাখিল	২৫১	১৩	১-১-৭৬
২১।	ওসমানপুর দাঃ মাদ্রাসা	গৌরনগর	দাখিল	৪০৩	১৩	১-১-৮৮
১।	যশোর আমিনিয়া আলীয়া মাদ্রাসা	যশোর	কামিল	১২৩২	২৯	১-৭-৭০
২।	পদ্মবিলা ফাজিল মাদ্রাসা	জংগলবাধাল	কামিল	৪৩৮	২০	১-৬-৫২

কেশবপুর

১।	ভান্ডারখোলা দাখিল মাদ্রাসা	বিদ্যানন্দকাঠী	দাখিল	২৬৫	১৪	১-১-৮৬
২।	সাগরদাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	সাগরদাড়ী	দাখিল	২৪০	১৩	১-১-৮৬
৩।	হাসানপুর দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	বুড়িহাটী	দাখিল	২৮৯	১৩	১-১-৮৬
৪।	এস, এস, জি, বরন ডালী দাঃ মাঃ	ত্রিমোহিনী	দাখিল	৩৮৫	১৩	১-১-৮৬
৫।	রামচন্দ্রপুর ইঃ দাঃ মাদ্রাসা	কেশবপুর	দাখিল	৩১৭	১৩	১-১-৮৬
৬।	ফতেপুর রহিম মিয়া দাঃ মাদ্রাসা	বিদ্যানন্দকাঠী	দাখিল	৩১০	১৩	১-১-৮৬
৭।	লক্ষীনাথকাঠী দাঃ মাদ্রাসা	মজিদপুর	দাখিল	২৯২	১৩	১-১-৮৬
৮।	কাস্তা গহর আলী বালিকা দাঃ মাঃ	গোপসেনা	দাখিল	৩২২	১৩	১-১-৮৬
৯।	এস, এস, বি, তেঘরী দাঃ মাদ্রাসা	তেঘরী	দাখিল	৩০৯	১৩	১-১-৮৬
১০।	বাউশলা দাখিল মাদ্রসা	মংগলকোট	দাখিল	২৯৯	১৩	১-১-৮৬
১১।	চিংড়া ধর্মপুর দারুস সুন্নত দাঃ মাদ্রাসা	চিংড়া বাজার	দাখিল	৩১৭	১৩	১-১-৮৬

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
১২।	বারইহাটি পাত্রপাড় সমন্বীত বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	শিকারপুর	দাখিল	৩৯০	১৩	১-১-৮৭
১৩।	বাঁশবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রসা	গোপসেনা	দাখিল	৩০৮	১৩	১-১-৮৫
১৪।	মুলগ্রাম দারুল উলুম দাঃ মাদ্রাসা	কেশবপুর	দাখিল	২৬৮	১৩	১-১-৮৫
১৫।	বরেংগা নওয়ারিয়া সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	বরেংগা	দাখিল	২৮৭	১৩	১-১-৮৫
১৬।	মির্জাপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	চিংড়াবাজার	দাখিল	৩০১	১৩	১-১-৮৮
১৭।	সারুটিয়া বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	সারুটিয়া	দাখিল	২৮০	১৩	১-১-৮৭
১৮।	বেগমপুর ইসঃ বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	বেগমপুর	দাখিল	৩৪৬	১৩	১-১-৮৭
১৯।	সন্ন্যাস গাছা বালিকা মাদ্রাসা	গৌরীঘোনা	দাখিল	৩০২	১৩	১-১-৮৮
২০।	বুড়ি হাটী মহিলা মাদ্রাসা	বুড়ি হাটী	দাখিল	৪৩৯	১৩	১-১-৮৮
১।	এ, জি, বি, কে, সিঃ মাদ্রাসা	গৌরীঘোনা	আলিম	৪৫২	২১	১-৭-৮৪
২।	ত্রিমোহিনী দারুল ইসঃ সিঃ মাদ্রাসা	ত্রিমোহনী	আলিম	৪৯০	১১	১-৭-৮৬
৩।	ভালুক ঘর আজিজিয়া সিঃ মাদ্রাসা	শিকারপুর	আলিম	২৫৯	১৯	১-৭-৮৫
১।	কেশবপুর আলিয়া মাদ্রাসা	কেশবপুর	কামিল	৫৪৫	২২	১-৭-৮৫

চৌগাছা

১।	দরগাপুর ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	রায়নগর	দাখিল	২৯২	১৩	১-১-৮৬
২।	আর, পি, ইউ, ইসঃ দাখিল মাদ্রাসা	চৌগাছা	দাখিল	৩০৮	১৩	১-১-৮৭
৩।	সিংহঝুলি দাঃ মাদ্রাসা	সিংহঝুলী	দাখিল	২৪৪	১৩	১-১-৮৭
৪।	বাদে খানপুর সিদ্দিকিয়া দাঃ মাদ্রাসা	গোয়াতলী	দাখিল	৩২০	১৩	১-১-৮৫
৫।	হাজ্জরা খানা পীর বুলু দেঃ দাঃ মাদ্রাসা	নারায়নপুর	দাখিল	৩০৬	১৩	১-১-৮৬
৬।	সৈয়দপুর সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	গৌরীনাথপুর	দাখিল	২৮৪	১৩	১-১-৮৬
৭।	ডি, এ, সি, ইউ দাখিল মাদ্রাসা	গৌরীনাথপুর	দাখিল	২৮৮	১৩	১-১-৮৫
১।	চৌগাছা সিনিয়র মাদ্রাসা	চৌগাছা	আলিম		১৬	১-৭-৭৭

www.pathagar.com

শার্শা

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
১।	বালুন্ডা আমিনিয়া দাখিল মাদ্রাসা	বালুন্ডা	দাখিল	২৯৬	১৩	১-১-৮৬
২।	বাগ আচড়া বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	বাগ আচড়া	দাখিল	৪৫৭	১৩	১-১-৮৬
৩।	বেনাপোল বালিকা দাঃ মাদ্রাসা	বেনাপোল	দাখিল	৬১০	১৩	১-১-৮৭
৪।	করপোতা সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	বালুন্ডা	দাখিল	৩৯৭	১৩	১-১-৮০
৫।	শিক্রী মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	বালুন্ডা	দাখিল	৩৫৬	১৩	১-১-৮০
৬।	গোপালপুর ইঃ আমিঃ দাখিল মাদ্রাসা	গোগা	দাখিল	২৭৫	১৩	১-১-৭২
৭।	রহিমপুর দাখিল মাদ্রাসা	লক্ষণপুর	দাখিল	১৪৫	১৩	১-৭-৭
৮।	সোনাগছিয়া গাতী পাড়া দারুস সুন্নত দাখিল মাদ্রাসা	লক্ষণপুর	দাখিল	৩০১	১৩	১-৭-৭২
১।	বুরুজ বাগান আলিম মাদ্রাসা	যাদবপুর	আলিম	৪১৮	২১	১-৭-৭২
২।	ধান্যখোলা সিনিয়র মাদ্রাসা	ধান্যখোলা	ফাজিল	৪৩৯	১৯	১-৭-৭১
৩।	সামটা সিদ্দিকীয়া সিঃ মাদ্রাসা	সামটা	আলিম	৪৩০	১৮	১-৭-৮৬
৪।	বেনাপোল মদিনাতুল উলুম সিঃ মাঃ	বেনাপোল	আলিম	৩৬০	১৬	১-৭-৮৭
৫।	গোগাকালিনি সিঃ মাদ্রাসা	গোগা	আলিম	৩০৮	১৬	১-১৭-৮৯
১।	বসতপুর ফাজিল মাদ্রাসা	বাগ আচড়া	ফাজিল	৩৫৯	২০	১-৭-৭৭
২।	বাগ আচড়া ফাজিল মাদ্রাসা	বাগ আচড়া	ফাজিল	৪৮৭	২২	১-৭-৮৭

শৈলকুপা

১।	আসান নগর এবিসিডি দাখিল মাদ্রাসা	ভাটই	দাখিল	৩৬৭	১৩	১-১-৮৬
২।	রয়েড়া ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	রয়েড়া	দাখিল	৩৩৮	১৩	১-১-৮৬
৩।	কাচেরকোল ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	কাচেরকোল	দাখিল	২৬৫	১২	১-১-৮৪
৪।	গাড়া বাড়িয়া সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	বাজার পোড়া হাটি	দাখিল	৩২২	১৩	১-১-৭৮
৫।	বড়দাহ দাখিল মাদ্রাসা	ফুলহরী	দাখিল	২৯৭	১৩	১-১-৮৮
১।	পাঁচপাখিয়া সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা	কুমিরাদহ	আলিম	৩৮০	১৯	১-৭-৮৬
২।	শৈলকুপা সিনিয়র মাদ্রাসা	শৈলকুপা	আলিম	৩৮৫	১৯	১-৭-৮৬

www.pathagar.com

কালিগঞ্জ

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
১।	নরদহী আব্বাছিয়া দাখিল মাদ্রাসা	নলডাংগা	দাখিল	৫০৪	১৩	১-১-৮৮
২।	মনোহরপুর পুখুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	আলিগঞ্জ	দাখিল	২৮৮	১৩	১-১-৮৭
৩।	কুয়ারহাটি দাখিল মাদ্রাসা	নলডাংগা	দাখিল	৩৩২	১৩	১-১-৮৬
৪।	বালিয়াডাংগা দাখিল মাদ্রাসা	বিপিন নগর	দাখিল	২৪৩	১৩	১-১-৭৯
৫।	ঈশ্বরবাদ দাখিল মাদ্রাসা	আলিগঞ্জ	দাখিল	৩৩১	১৩	১-৭-৮৭
৬।	পাত্তাডাংগা দাখিল মাদ্রাসা	দামোদারপুর	দাখিল	২৬৯	১৩	১-১-৮৪
৭।	বেলাট দৌলতপুর দাঃ মাদ্রাসা	হাট বারবাজার	দাখিল	২৬১	১৩	১-১-৮৬
৮।	পাক শরীফ দাখিল মাদ্রাসা	গৌরীনাথপুর	দাখিল	২৭৩	১৩	১-১-৮১
৯।	সাইট বাড়িয়া হককুল হুদা মাদ্রাসা	বেথুলী	দাখিল	৩৪১	১৩	১-১-৮৮
১।	শোয়েব নগর ফাজিল মাদ্রাসা	আলিগঞ্জ	ফাজিল	৪২৮	২৩	১-৭-৮৭

হরিনাকুন্ডু

১।	দখলপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসা	হরিনাকুন্ডু	দাখিল	৩৮৩	১৩	১-১-৭৯

কোটচাঁদপুর

১।	দয়ারামপুর ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	দোড়া	দাখিল	৩০৭	১৩	১-১-৮৬
২।	ছফদারপুর দাখিল মাদ্রাসা	জয়দিয়া	দাখিল	৩৫৭	১৩	১-১-৮৭
৩।	হাজী আলতাফ হোসেন দাঃ মাদ্রাসা	কোটচাঁদপুর	দাখিল	৪৬৪	১৩	১-১-৮৭
৪।	জালালপুর দাঃ মাদ্রাসা	জালালপুর	দাখিল	২৩৯	১৩	১-১-৮৬
১।	কোটচাঁদপুর সিনিয়র মাদ্রাসা	কোটচাঁদপুর	ফাজিল	৩১৫	১৯	১-৭-৬৫

মহেশপুর

১।	কৃষ্ণপুর দাখিল মাদ্রাসা	হাটযাদবপুর	দাখিল	৪২১	১৩	১-১-৮৫
২।	সামন্তা সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	সামন্তাবাজার	দাখিল	২৪৯	১৩	১-৭-৭৯
৩।	নাটিমা দাখিল মাদ্রাসা	হাবাশপুর	দাখিল	৪২৩	১৩	১-১-৭৯
৪।	খালিশপুর দাখিল মাদ্রাসা	খালিশপুর	দাখিল	৩০৭	১৩	১-১-৮০

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
৫।	বৈচিতলা ইসলামিয়া দাঃ মাদ্রাসা	কানাইডাংগা	দাখিল	৩১৩	১৩	১-৭-৭৮
৬।	বামনকাঠী দাঃ নেছারিয়া নুড়িয়া দাখিল মাদ্রসা	গুয়াতলী	দাখিল	২৯২	১৩	১-১-৮৬

ঝিনাইদহ সদর

১।	কালুহাটি দাখিল মাদ্রাসা	বাজার গোপালপুর	দাখিল	২০৫	১৩	১-১-৮৬
২।	আরমুখি দাখিল মাদ্রাসা	নলডাংগা	দাখিল	১৮১	১৩	১-১-৮৬
৩।	উত্তর কাষ্ট সাগরা ছিঃ দাঃ মাদ্রাসা	পোড়াহাতা	দাখিল	৩৯০	১৩	১-১-৮৬
৪।	গোপিআর গাপি (রছুলপুর) দাঃ মাদ্রাঃ	ঝিনাইদহ	দাখিল	২৩৪	১৩	১-১-৮৬
৫।	কুটি দুর্গাপুর সিদ্দিকীয়া দঃ মাদ্রাসা	নগরহানী	দাখিল	৩৪২	৯৩	১-১-৮৬
৬।	লাউদিয়া পীর দেওয়ান দাঃ মাদ্রাসা	ঝিনাইদহ	দাখিল	৩৯৩	১৩	১-১-৮৬
৭।	সাগান্না সিদ্দিকীয়া দাঃ মাদ্রাসা	সাগান্না	দাখিল	৩১১	১৩	১-৭-৭
৮।	হলিধানী আহমদিয়া দাঃ মাদ্রাসা	হলিধানী	দাখিল	৩৮৭	১৩	১-৭-৭
৯।	ঘোড়াশাল হামিদিয়া দাঃ মাদ্রাসা	মনুরিয়া	দাখিল	২০৪	১৩	১-৭-৭
১০।	গিলাবাড়ীয়া শাহ আবুবকর সিদ্দিক দাঃ মাঃ	ঝিনাইদহ	দাখিল	২০০	১৩	১-৭-৭
১১।	হাট গোপালপুর তোঃ দাঃ মাদ্রাসা	হাট গোপালপুর	দাখিল	২৮২	১৩	১-১-৮৮
১২।	চন্ডিপুর পাইনজাত আলী দাঃ মাদ্রাসা	বাজার গোপালপুর	দাখিল	২১৪	১৩	১-১-৮৮
১।	ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া আলিয়া মাদ্রাসা	ঝিনাইদহ	কামিল	৫০২	১৯	১-৭-৮৭

শালিখা

১।	বাগডাংগা ছামছুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	শতকহালী	দাখিল	২৯৭	১৩	১-১-৮৮
২।	আড়পাড়া সদর দাখিল মাদ্রাসা	আড়পাড়া	দাখিল	২৮৬	১৩	১-১-৮৬
৩।	হরিসপুর দাখিল মাদ্রাসা	সীমাখালী	দাখিল	২৮৪	১৩	১-১-৮৬
৪।	ত্রিপরুল আঃ হাকিম দাখিল মাদ্রাসা	শিংরা	দাখিল	৩৩৩	১২	১-১-৮৬
৫।	উত্তর সরুসোনা ইউসুফিয়া দাঃ মাদ্রাসা	সরুসোনা	দাখিল	২৮৮	১৩	১-১-৮৬
৬।	শতখালী দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	শতখালী	দাখিল	৩৭৩	১৩	১-১-৮০
৭।	গড়ের হাট দাখিল মাদ্রাসা	আড়পাড়া	দাখিল	১৯৭	১৩	১-১-৮৪

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
১।	ছয় ঘরিয়া এ, বি, এস, সি সিনিয়র মাদ্রাসা	সীমাখালী	ফাজিল	৪৩১	২৮	১-৭-৮৬

মোহাম্মদপুর

১।	চাকুলিয়া এস, এস, দাখিল মাদ্রাসা	নওহাটা	দাখিল	২৯৭	১৩	১-১-৮৬
২।	নাগরী পাড়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	পাল্লা	দাখিল	৪৩৭	১৪	১-১-৮৬
৩।	মৌশা মোহাম্মদীয়া দাখিল মাদ্রাসা	বোয়াইল	দাখিল	৩০৭	১৩	১-১-৮৭
৪।	ধুল্লিয়া দাখিল মাদ্রাসা	বিনোদপুর	দাখিল	২৯৬	১৩	১-১-৮৭
৫।	রাজপাট রাজাপুর রশিদীয়া দাখিল মাদ্রাসা	রাজ বনগ্রাম	দাখিল	৩৭৫	১৩	১-১-৫০
১।	বানিয়া বহ কাওঃ কাদেরিয়া সিঃ মাদ্রাসা	কাওরা	আলিম	২৯২	১৬	১-৭-৭৮
১।	ঝামা বরকাতুল সিঃ মাদ্রাসা	ঝামা বাজার	ফাজিল	৪৬৬	১৯	১৫-১২-৫৬
২।	জড়রীয়া, এ ডব্লিও সিঃ মাদ্রাসা	বোয়াইল	ফাজিল	২৯২	২০	১-৬-৫৭
৩।	নওহাটা আহমদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	নওহাটা	ফাজিল	২৪৩	২১	৪-২-৭৬

মাগুরা সদর

১।	আলাইপুর দাখিল মাদ্রাসা	রাউতাড়া	দাখিল	৩৩৯	১৩	১-১-৮৮
২।	বগুড়া মাজাইল মাদ্রাসা	ফুলবাড়ী	দাখিল	২৯০	১৩	১-১-৭৯
৩।	জগদল রুপাটী মাদ্রসা	হাটজগদল	দাখিল	৩২৮	১৩	১-১-৮০
৪।	কাপশেহাটী মাদ্রসা	ভবনহাটী	দাখিল	২৬৬	১২	১-১-৮২
৫।	বেরইল ছামছুদ্দিন মাদ্রাসা	ধলেশ্বরগাতী	দাখিল	১৪৫	৯	১-১-৭৯
৬।	মোছাপুর গোবিন্দপুর হোঃ মাদ্রাসা	হাটজগদল	দাখিল	৩২৮	১৫	১-১-৮০
৭।	পুখুরিয়া আলোকদিয়া মাদ্রাসা	আলোকদিয়া	দাখিল	২৮৩	১৩	১-১-৭৮
১।	মাগুরা সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা	মাগুরা	আলিম	৩৮৮	১৭	১-১-৮৫
১।	বেরইল দারুল হুদা ফাজিল মাদ্রাসা	বেরইল	ফাজিল	৪৪৩	২০	১-৬-৫

www.pathagar.com

শ্রীপুর

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	ডাকঘর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	অনুমতির তারিখ
১।	কাদিরপাড়া সম্মিলনী ইসঃ মাদ্রাসা	বারী নগর	দাখিল	৩৬৫	১৪	১-১-৮৭
২।	লাগলবন্ধ দারুল ইসলাম মাদ্রাসা	লাংগল বন্ধ	দাখিল	৩৮৪	১৩	১-১-৮৭
৩।	নৌহাটা মাদ্রাসা	রাধানগর	দাখিল	২৮২	১৩	১-১-৮৬
৪।	বারিশাট পূর্বপাড়া মাদ্রাসা	বারিশাট	দাখিল	৩৩৩	১৩	১-১-৭৯
৫।	খামার পাড়া ছিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা,	খামার বাজার	দাখিল	৩৯৭	১৩	১-১-৮৫
৬।	আমতৈল জাতীয় তরুণ সংঘ মাদ্রাসা	আমতৈল	দাখিল	২৮১	১৩	১-১-৮৮

নড়াইল সদর

১।	পোড়ালী দাখিল মাদ্রাসা	তুলারামপুর	দাখিল	৩৪৬	১৩	১-১-৮৮
২।	মাইজপাড়া ইউপি দূর্গাপুর দাঃ মাদ্রাসা	মধ্যপল্লী	দাখিল	২৮৫	১৩	১-১-৮৮
৩।	শাহবাদ মজিদিয়া দাঃ মাদ্রসা	নড়াইল	দাখিল	৩২৪	১৩	১-১-৮৭
৪।	বিবিএস দাখিল মাদ্রাসা	দাড়িয়াপুর	দাখিল	৩৪০	১৩	১-১-৮৬
৫।	চাচড়া দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	তুলারামপুর	দাখিল	৩৩০	১৩	১-১-৮৬
৬।	নড়াইল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	রতনগঞ্জ	দাখিল	৩৮০	১৩	১-১-৮৮
৭।	ইসলামাবাদ দাখিল মাদ্রাসা	বাগশ্রীরামপুর	দাখিল	৩৪৬	১৩	১-১-৮৮
৮।	জুড়ালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	নড়াইল	দাখিল	৪২৬	১৩	১-১-৮৩
১।	শাহাবাদ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	শাহাবাদ	কামিল	৯২৬	২৩	১-৭-৭৭

কালিয়া

১।	যাদবপুর ও এস দাখিল মাদ্রাসা	খাড়ারিয়া	দাখিল	১৯৬	১৩	১-১-৭৯
২।	ইসলামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মহাজন	দাখিল	৩৯৭	১৩	১-১-৮৭

লোহাগড়া

১।	চানুলিয়া বাবু সুন্নত দাখিল মাদ্রাসা	খাসিয়া	দাখিল	২৮২	১৩	১-১-৮৫
২।	নখখালী দাখিল মাদ্রাসা	হাট মিঠাপুর	দাখিল	২৯৩	১৩	১-১-৮০
৩।	কুমড়ী তালবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা	কুমড়ী	দাখিল	২৫৩	১৩	১-১-৮১
৪।	সরুশুনা দাখিল মাদ্রাসা	এন, এস, হোলা	দাখিল	৩০১	১৩	১-১-৭৮
১।	সালামিয়া হোসাইয়া বাতাসী রঘুনাথপুর সিনিয়র মাদ্রাসা	শিয়রবর	আলিম	৪০০	১৭	১-১-৭৮
১।	লাহড়িয়া সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসা	লাহড়িয়া কালিগঞ্জ	ফাজিল	৩৪৯	২১	১-৬-৫৪

www.pathagar.com

যশোরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এদেশের আপামর জনসাধারনের কাছে একটি পরিচত নাম,একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ন স্বায়ত্তশাসিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক আইন বলে পূর্বতন ইসলামিক একাডেমীর সাথে বায়তুল মুকাররম মসজিদের সংযুক্তি সাধনের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গঠিত হয়। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক কালচার এর অনুরূপ একটি সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানে গঠনের অভিপ্রায়ে পূর্বতন দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) কে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে ইসলামিক একাডেমীতে রূপান্তরিত করেন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম আল্লামা আবুল হাসেম প্রথম পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্ব এ,টি,এম আবদুল মতিন ছিলেন দারুল উলুম এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বিভিন্ন শিল্পপতিদের সহযোগিতায় বিশেষ করে মরহুম আলহাজ্ব আবদুল লতিফ বাওয়ানীর অর্থানুকূল্যে বায়তুল মুকাররম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দারুল উলুম (ইসলামিক একাডেমী) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল না থাকায় একে সরকারী নিয়ন্ত্রনে আনা হয় এবং ইসলামিক একডেমীতে রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে পাকিস্তান আমলে এ প্রতিষ্ঠানে তেমন ভাল কাজ হয়নি। শুধু মাত্র দশ বছরে কুরআনুল করীমের একটি প্রামাণিক অনুবাদ, দশ বারোটা বই এবং একটি ত্রৈমাসিক ও একটি শিশু কিশোর মাসিক ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম ছিলনা বললেই চলে। অবশ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও অবস্থা পূর্বের মতই থাকে। সরকার কতৃক জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও ইসলামিক একাডেমীর ভাগ্যে তা তখন জোটেনি। ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৭৯ সালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফাউন্ডেশন-এর অধীনেআসে।

ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমকে সামনে রেখে এই প্রতিষ্ঠানটি ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, কোরআনের তরজমা, তাফসীর, হাদীস, সিরাত, ইসলামী তাহ্জীব তমুদ্দুন, সমাজ-বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক ও অনুদিত

www.pathagar.com

গ্রন্থাদির প্রকাশনা, দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর দপ্তরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা, মসজিদ পাঠাগার স্থাপন ছাড়াও দ্বীনী সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর জীবনী আলোচনা, মুসলিম মনীষীদের জীবনী পর্যালোচনা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, ইসলামী পুস্তকের প্রদর্শনী ও বিতরণ, জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমুহ পালন ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের, বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ পুনর্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের বাস্তবমুখী, সেবামূলক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বর্তমানে ১৫টি বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়া দেশের ৪ টি বিভাগসহ ৬৪ টি জেলা অফিস ও ৫টি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ২৯ টি ইসলামিক মিশনও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করছে।

ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর দ্বীনের আমানতদার এবং ধারক ও বাহক। এই পবিত্র আমানত অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াতকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার মহান লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নিম্নলিখিত কার্যকক্রম গ্রহণ করেছে-

- মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট স্থাপন,পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকরা;

- মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিউটসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

- সংস্কৃতি, মনন,বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা;

- সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব,সহনশীলতা ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার এবং প্রসারে সহায়তা করা;

- ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও আইন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণা সংগঠন এবং ইহার মানোন্নয়ন করা;

-ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও আইন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকী ইত্যাদি প্রাকাশ করা;

-ইসলামের ইতিহাস,দর্শন, সংস্কৃতি , আইন ও আইন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে সম্মেলন, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করা;

www.pathagar.com

–ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

–জাতীয় ও ধর্মীয় গুরত্বপূর্ণ দিবস পালন করা;

–দ্বীনী ও সিরাত মাহ্‌ফিল পালন করা;

–সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও বিভিন্ন ইসলামী মনীষীদের জীবনী আলোচনা করা;

–ইসলামী বিষয়ের ওপর অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

–বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়র করা;

–ইসলামী বিষয়াদির ওপর প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা;

–উপরিউক্ত কর্মসূচীসমূহের যে কোন একটির জন্য সহায়ক অথবা সম্পৃক্ত যে কোন কাজ সম্পাদন করা।'

দেশের সকল শ্রেনীর জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং তাদের নৈতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৯–৮০ অর্থ বছরে দ্বি–বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও শাখা দপ্তর খোলার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এই প্রক্রিয়া ১৯৮১–৮৫ অর্থবছরে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সকল বিভাগ ও বৃহত্তর জেলাগুলোতে ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় জেলা কার্যালয়স্থাপন করা হয়। এবং এই সময়ই ২১–১২–৮০তারিখে ফাউন্ডেশনের যশোর জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১–৪–৮৮তারিখে নড়াইল জেলা কার্যালয়, ১–১–৮৯ তারিখে মাগুরা জেলা কার্যালয় এবং ঐ একই সময়ে ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

যশোার জেলা কার্যালয়ে এ পর্যন্ত যে সমস্ত কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন, সর্ব জনাব হাসান আবদুল কাইয়ুম, এ, কে, এম, দেলওয়ার হোসেন, মোঃ আমানুল হক, এ, এইচ এম, হাবিবুর রহমান ও কে, এম মোস্তফা কামাল। নড়াইলে জেলা কার্যালয়ে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, এ,কে,এম দেলোয়ার হোসেন, শেখ ফজলুর রহমান এবং মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)। মাগুরা জেলা কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা কাল থেকে দাযিত্ব পালন করেছেন জনাব এ,কে,এম দেলোয়ারহোসেন।

ইসলামী জ্ঞান বিস্তার ও ইসলামের ব্যাপক প্রচার–প্রসার কল্পে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদ পাঠাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ইসলামিক বুক ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হাতে নিয়েছে একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নে বৃহত্তর যশোর জেলার (বর্তমান জেলা ওয়ারী) মসজিদ পাঠাগার ও ইসলামিক বুক ক্লাবের নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠাকাল দেয়া হল।

www.pathagar.com

১৯৮০-৮১ অর্থবছর হতে ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছর পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন যশোর জেলা (বর্তমান) কার্যালয় কর্তৃক গঠিত মসজিদ পাঠাগারের তালিকা

ক্রমিক নং	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮০-৮১		
১।	শার্শা জামে মসজিদ	শার্শা	শার্শা
২।	বেনাপোল গাজীপুর জামে মসজিদ	বেনাপোল	শার্শা
৩।	নাভারণ রেল বাজার জামে মসজিদ	নাভারণ	শার্শা
৪।	ভরত ভায়না জামে মসজিদ	গৌরীজোনা	কেশবপুর
৫।	কুমার ঘাটা জামে মসজিদ	মনোহরপুর	মনিরামপুর
৬।	চন্ডিপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	চন্ডিপুর	মনিরামপুর
৭।	খোলাডাংগা জামে মসজিদ	ভেকুটিয়া	যশোরসদর
৮।	হামিদপুর জামে মসজিদ	রাজার হাট	যশোরসদর
৯।	নারয়নপুর জামে মসজিদ	নারায়নপুর	চৌগাছা
১০।	গরীবপুর জামে মসজিদ	সিংহঝুলী	চৌগাছা
১১।	ঝিকরগাছা বাস স্ট্যান্ড জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
১২।	নওয়াপাড়া (বিশ্বাস পাড়া) জামে মসজিদ	ধল গ্রাম	বাঘার পাড়া
	১৯৮১-৮২		
১৩।	ই-ব্লক জামে মসজিদ	উপ-শহর	যশোরসদর
১৪।	জগন্নাথপুর বাহির ঘাটা জামে মসজিদ	শেখহাটি	যশোরসদর
১৫।	বাগডাংগা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	চুড়ামন কাটি	যশোরসদর
১৬।	পুলের হাট জামে মসজিদ	চাঁচড়া	যশোরসদর
১৭।	ডহর পাড়া জামে মসজিদ	বারী নগর	যশোরসদর
১৮।	নীলগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ	ঝুমঝুম পুর	যশোরসদর
১৯।	আধুনিক সদর হাসপাতাল জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
২০।	বাঘার পাড়া থানা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ	বাঘার পাড়া	বাঘার পাড়া
২১।	চৌগাছা বাজার জামে মসজিদ	চৌগাছা	চৌগাছা

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
২২।	বাড়ীয়ালী জামে মসজিদ	পাশাপোল	চৌগাছা
২৩।	রানাগাতি ফারাজী পাড়া জামে মসজিদ	ফুলতলা	অভয়নগর
২৪।	নওয়াপাড়া বাজার জামে মসজিদ	নওয়াপাড়া	অভয়নগর
২৫।	পাথলিয়া বিশ্বাস পাড়া জামে মসজিদ	শ্রীধরপুর	অভয়নগর
২৬।	মসজিদে তৈয়্যেবা মাছনা জামে মসজিদ	মধুপুর	মনিরামপুর
২৭।	হালসা জামে মসজিদ	লাউড়ি	মনিরামপুর
২৮।	কেশবপুর বাজার জামে মসজিদ	কেশবপুর	কেশবপুর
২৯।	হাসান পুর জামে মসজিদ	বুড়িহাটি হাসানপুর	কেশবপুর
৩০	মসজিদ বায়তুল ফালাহ	গাজীর দরগাহ	ঝিকরগাছা
৩১।	গাতীপাড়া জামে মসজিদ	নিশ্চিন্ত পুর	শার্শা
৩২।	বারীপোতা জামে মসজিদ	যাদবপুর	শার্শা
	১৯৮২–৮৩		
৩৩।	ক্যান্টনম্যান্ট বোর্ড জামে মসজিদ	সেনানিবাস	যশোরসদর
৩৪।	ওয়াপদা কলোনী জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৩৫।	শেখহাটী বায়তুল সালাম জামে মসজিদ	যশোর উপ-শহর	যশোরসদর
৩৬।	খোজার হাট জামে মসজিদ	চূড়ামন কাটি	যশোরসদর
৩৭।	পুরাতন কশবা কাজী পাড়া জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৩৮।	এনায়েত পুর আবেদিয়া জামে মসজিদ	সাজিয়ালী	যশোরসদর
৩৯।	বাগআঁচড়া জামে মসজিদ	বাগআঁচড়া	শার্শা
৪০।	ভালুক ঘর জামে মসজিদ	শিকার পুর	কেশবপুর
৪১।	উত্তর রাজাপুর জামে মসজিদ	বোধখানা	ঝিকরগাছা
৪২।	গুলবাগপুর জামে মসজিদ	মুক্তারপুর	ঝিকরগাছা
৪৩।	পাড়িয়ালি জামে মসজিদ	আম্রঝুটা	মনিরামপুর
৪৪।	প্রেমবাগ (বাওরকুল) জামে মসজিদ	চেংগুটিয়া	অভয়নগর
৪৫।	ফুলসারা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	ফুলপাড়া	চৌগাছা
৪৬।	দর্গাপুর সিনিয়র মাদ্রাসা জামে মসজিদ	গৌরনগর	বাঘার পাড়া
	১৯৮৩–৮৪		
৪৭।	বি–ব্লক জামে মসজিদ	নতুন উপ শহর	যশোরসদর

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
৪৮।	বায়তুল মামুন জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৪৯।	আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রসা জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৫০।	বারান্দীপাড়া ২নং কলোনী জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৫১।	চাঁচড়া জামে মসজিদ	চাঁচড়া	যশোরসদর
৫২।	গ্যারিসন জামে মসজিদ	যশোর সেনানিবাস	যশোর সদর
৫৩।	কালেক্টরেট জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৫৪।	পুলিশ লাইন জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৫৫।	যশোর বি,ডি, আর জামে মসজিদ	ঝুমঝুমপুর	যশোরসদর
৫৬।	বারান্দীপাড়া মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৫৭।	বায়তুস সালাম জামে মসজিদ	রূপদিয়া	যশোরসদর
৫৮।	নাজির সংকরপুর জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৫৯।	খোলা ডাংগা জামে মসজিদ	জংগল বাধাল	যশোরসদর
৬০।	বিমান বন্দর জামে মসজিদ	বিমান বাহিনীঘাটি	যশোর সদর
৬১।	পি,টি,আই জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৬২।	নরেন্দ্রপুর খন্দকার পাড়া জামে মসজিদ	নরেন্দ্রপুর	যশোরসদর
৬৩।	ঝিকরগাছা বাজার জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
৬৪।	শংকরপুর ফেরীঘাট জামে মসজিদ	বাগআঁচড়া	ঝিকরগাছা
৬৫।	সামটা জামে মসজিদ	সামটা	শার্শা
৬৬।	মনিরামপুর রেজিষ্ট্রি অফিস সংলগ্ন জামে মসজিদ	মনিরামপুর	মনিরামপুর
৬৭।	গাবুখালীবাজার জামে মসজিদ	মাগুরা হাট	মনিরামপুর
৬৮।	লাউড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ	লাউড়ী	মনিরামপুর
৬৯।	কদম বাড়ীয়া জামে মসজিদ	হেলানচী বাজার	মনিরামপুর
৭০।	নওয়াপাড়া জুটমিলস ও বেতার ঘাট জামে মসজিদ	নওয়াপাড়া	অভয়নগর
৭১।	নারিকেল বাড়িয়া বাজার জামে মসজিদ	নারিকেল বাড়িয়া	বাঘার পাড়া
৭২।	বাঘার পাড়া উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন জামে মসজিদ	বাঘার পাড়া	বাঘার পাড়া
৭৩।	স্বরূপদাহ জামে মসজিদ	স্বরূপদাহ	চৌগাছা

www.pathagar.com

	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৪–৮৫		
৭৪।	বেজপাড়া তালতলা জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৭৫।	কোতয়ালী জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৭৬।	পুরাতন কস্‌বা বিমান অফিস এলাকা জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৭৭।	সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুল জামে মসজিদ	যশোর সেনানিবাস	যশোর সদর
৭৮।	৯ ইনজিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ান জামে মসজিদ	যশোরসেনানিবাস	যশোরসদর
৭৯।	এম,ই, এস,আর্মী জামে মসজিদ	যশোরসেনানিবাস	যশোরসদর
৮০।	নওয়াপাড়া শাহী জামে মসজিদ	নওয়াপাড়া	অভয়নগর
৮১।	চিনাটোলা বাজার জামে মসজিদ	চিনাটোলা	মনিরামপুর
৮২।	খাটায়াডাংগা জামে মসজিদ	খাটায়াডাংগা	মনিরামপুর
	১৯৮৫–৮৬		
৮৩।	১১৭ ফিল্ড ওয়ার্কসপ ইউনিট জামে মসজিদ	যশোর সেনানিবাস	যশোর সদর
৮৪।	গরীবপুর জামে মসজিদ	জহুর পুর	যশোরসদর
৮৫।	তেঘুরিয়া জামে মসজিদ	গাজীর দরগাহ	যশোরসদর
৮৬।	আন্ধারকোটা জামে মসজিদ	স্বরূপদাহ	চৌগাছা
৮৭।	ঢাকুরিয়া জামে মসজিদ	ঢাকুরিয়া	মনিরামপুর
৮৮।	সি,এন্ড,বি,বায়তুলমুকাদ্দাস জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
৮৯।	২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী জামে মসজিদ	যশোর সেনানিবাস	যশোর সদর
৯০।	বি, এ, ডি, সি (সেচ) নতুন উপশহর জামে মসজিদ	নতুন উপশহর	যশোরসদর
৯১।	নতুন হাট বাজার জামে মসজিদ	চাঁচড়া	যশোরসদর
৯২।	উত্তর চাঁদপুর জামে মসজিদ	ছান্দড়া	যশোরসদর
৯৩।	করিমপুর জামে মসজিদ	জামদিয়া	বাঘার পাড়া

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
৯৪।	হাবুল্লাহ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	ছাতিয়ানতলা	বাঘার পাড়া
৯৫।	খাজুরা বাজার জামে মসজিদ	গৌরনগর	বাঘার পাড়া
৯৬।	ইস্তাবায়তুন জামে মসজিদ	মাটিকোমরা	ঝিকরগাছা
৯৭।	হাকিমপুর জামে মসজিদ	হাকিমপুর	চৌগাছা
৯৮।	কাশিমপুর জামে মসজিদ	মুক্তারপুর	শার্শা
৯৯।	সুন্দলপুর জামে মসজিদ	লাউড়ী	মনিরামপুর
১০০।	রহিতা বাজার জামে মসজিদ	রহিতা	মনিরামপুর
১০১।	কাশিম নগর জামে মসজিদ	কাশিমনগর	মনিরামপুর
১০২।	মংগলকোট জামে মসজিদ	মংগলকোট	কেশবপুর
১০৩।	পাইকপাড়া জামে মসজিদ	ভুগিলহাট	অভয়নগর
১০৪।	রাজঘাট জামে মসজিদ	রাজঘাট	অভয়নগর

১৯৮৭–৮৮

১০৫।	উপ–শহর এ ব্লক জামে মসজিদ	নতুন উপশহর	যশোরসদর
১০৬।	৩৬ ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্ট জামে মসজিদ	যশোরসেনানিবাস	যশোরসদর
১০৭।	৫৯ ইষ্ট বেংগল সাপোর্ট ব্যাটালিয়ান জামে মসজিদ	যশোর সেনানিবাস	যশোরসদর
১০৮।	৩৩ এস, টি ব্যাটালিয়ান জামে মসজিদ	যশোর সেনানিবাস	যশোরসদর
১০৯।	কীর্তিপুর জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
১১০।	আমিনি জামে মসজিদ	যাদবপুর	ঝিকরগাছা
১১১।	মসজিদে বায়তুল এহসান (বাড়ী পুকুর) জামে মসজিদ	চালিতা বাড়িয়া	শার্শা
১১২।	বাগআচড়া ৭ মাইল জামে মসজিদ	বাগআঁচড়া	শার্শা
১১৩।	হানুয়ার মাদ্রাসা জামে মসজিদ	রাজগঞ্জ	মনিরামপুর
১১৪।	এনায়েতপুর জামে মসজিদ	ষোলখাদা	মনিরামপুর
১১৫।	মনোহরপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ	চন্ডিপুর	মনিরামপুর
১১৬।	পূর্বাচল জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ জামে মসজিদ	নওয়াপাড়া	অভয়নগর
১১৭।	মাজালী জামে মজসিদ	সিংহঝুলী	চৌগাছা
১১৮।	বাবরা জামে মসজিদ	বসুন্দিয়া	বাঘার পাড়া

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৮–৮৯		
১১৯।	৪ মার্টার রেজিমেন্ট আর্টিলারী জামে মসজিদ	যশোরসেনানিবাস	যশোরসদর
১২০।	সদর দপ্তর আর্টিলারী ৫৫ পদাতিক ডিভিশন জামে মসজিদ	যশোরসেনানিবাস	যশোরসদর
১২১।	কিসমত নওয়াপাড়া জামে মসজিদ	নতুন উপশহর	যশোরসদর
১২২	মনিরামপুর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	মনিরামপুর	মনিরামপুর
১২৩।	চিংড়া ধর্মপুর জামে মসজিদ	চালিতাবাড়িয়া	কেশবপুর
১২৪।	কৃষ্ণনগর জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
	১৯৮৯–৯০		
১২৫।	ঘুনীজামে মসজিদ	জংগলবাধাল	যশোরসদর
১২৬।	দলনঘাটা জামে মসজিদ	জংগলবাধাল	যশোরসদর
১২৭।	বিরামপুর জামে মসজিদ	নতুন উপশহর	যশোরসদর
১২৮।	মথুরাপুর জামে মসজিদ	রূপদিয়া	যশোরসদর
১২৯।	বি, এ, ডি, সি, চাঁচড়া জামে মসজিদ	চাঁচড়া	যশোরসদর
১৩০।	কিসমত রাজাপুর জামে মসজিদ	ইছালী	যশোরসদর
১৩১।	দেয়াড়া জামে মসজিদ	হালসা	যশোরসদর
১৩২।	আমদাবাদ জামে মসজিদ	আমদাবাদ	যশোরসদর
১৩৩।	ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
১৩৪।	ঝিকরগাছা স্বাস্থ্য প্রকল্প জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
১৩৫।	মানকিয়া জামে মসজিদ	ধান্যখোলা	শার্শা
১৩৬।	চৌগাছা উপজেলা শাহী জামে মসজিদ	চৌগাছা	চৌগাছা
১৩৭।	মাধবপুর জামে মসজিদ	মাশিলা বাজার	চৌগাছা
১৩৮।	দোরমুষ্টিয়া জামে মসজিদ	চালিতা বাড়িয়া	কেশবপুর
১৩৯।	চিংড়া বাজার জামে মসজিদ	চিংড়া বাজার	কেশবপুর
১৪০।	লক্ষণপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	নেংগুড়াহাট	মনিরামপুর
১৪১।	গাদলা খড়িঞ্চি জামে মসজিদ	খেদাপাড়া	মনিরামপুর
১৪২।	মনোহরপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	রাজগঞ্জ	মনিরামপুর

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
১৪৩।	কাশিপুর পীর বাড়ী জামে মসজিদ	হেলাঞ্চি	মনিরামপুর
১৪৪।	জে, জে, আই জামে মসজিদ	রাজঘাট	অভয়নগর
১৪৫।	নলডাংগা জামে মসজিদ	রায়পুর	বাঘারপাড়া
১৪৬।	খাজুরা মাদ্রাসা জামে মসজিদ	গৌরনগর	বাঘারপাড়া
১৪৭।	মাছনা মুন্সিপাড়া মসজিদে বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ	মধুপুর	মনিরামপুর

১৯৯০–৯১

১৪৮।	৫১তম ব্যাটালিয়ান দি ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্ট জামে মসজিদ	যশোরসেনানিবাস	যশোরসদর
১৪৯।	এফ, ব্লক (জামরুল তলা) জামে মসজিদ	নতুন উপশহর	যশোরসদর
১৫০।	সরকারী এম, এম, কলেজ জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর
১৫১।	দোগাছিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ	দোগাছিয়া	যশোরসদর
১৫২।	হয়াতপুর জামে মসজিদ	নেপগুড়া হাট	মনিরামপুর
১৫৩।	চালুয়াহাটি দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	নেপগুড়া হাট	মনিরামপুর
১৫৪।	ডুমুরখালী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	ঝাপা বাজার	মনিরামপুর
১৫৫।	বালুন্ডা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ	বালুন্ডা	শার্শা
১৫৬।	ঝিকরগাছা দর্গাহপুর বাড়ী জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
১৫৭।	কীর্তিপুর জামে মসজিদ	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
১৫৮।	মৎসরাংগা জামে মসজিদ	পাশাপোল	চৌগাছা
১৫৯।	ফতেপুর জামে মসজিদ	মুক্তারপুর	চৌগাছা
১৬০।	সাতবাড়িয়া বাজার জামে মসজিদ	ত্রিমোহনী	কেশবপুর
১৬১।	দৌলৎপুর মধ্যপাড়া (হাজী বাড়ী) জামে মসজিদ	নারিকেল বাড়িয়া	বাঘারপাড়া
১৬২।	জামদিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ	ছাতিয়ানতলা	বাঘারপাড়া
১৬৩।	রূপদিয়া রেলষ্টেশন জামে মসজিদ	রূপদিয়া	যশোরসদর
১৬৪।	যশোর মহিলা মাদ্রাসা জামে মসজিদ	যশোর	যশোরসদর

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মসজিদ পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
১৬৫।	বায়তুস সালাম জামে মসজিদ (নেংগুরারহাট)	নেংগুরারহাট	মনিরামপুর
১৬৬।	চৌগাছা সিনিয়র মাদ্রাসা জামে মসজিদ	চৌগাছা	চৌগাছা
১৬৭।	সিংহঝুলী বাজার জামে মসজিদ	সিংহঝুলী	চৌগাছা
১৬৮।	শংকরপুর মাঝেরপাড়া জামে মসজিদ	বাগআচড়া	ঝিকরগাছা
১৬৯।	আটলিয়া বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ	গংগানন্দপুর	ঝিকরগাছা
১৭০।	সিংগারী চৌমাথা জামে মসজিদ	ভুগিলহাট	অভয়নগর
১৭১।	চেংগুটিয়া বাজার জামে মসজিদ	চেংগুটিয়া	অভয়নগর
১৭২।	চাড়াভিটা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (বাজার)	চাড়াভিটা	বাঘারপাড়া
১৭৩।	ত্রিমোহনী সিনিয়র মাদ্রাসা জামে মসজিদ	ত্রিমোহনী	কেশবপুর
১৭৪।	কেশবপুর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	কেশবপুর	কেশবপুর
১৭৫।	গোড়াপাড়া জামে মসজিদ	গোড়াপাড়া বাজার	শার্শা
১৭৬।	চালিতাবাড়িয়া জামে মসজিদ	দিঘা চালিতাবাড়িয়া	শার্শা
১৭৭।	পান্তাপাড়া জামে মসজিদ	শার্শা	শার্শা
১৭৮।	গোড়পাড়া কলোনী জামে মসজিদ	লক্ষণপুর	শার্শা
১৭৯।	কাগজপুকুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ	বেনাপোল	শার্শা
১৮০।	কেশবপুর মহিলা মাদ্রাসা জামে মসজিদ	কেশবপুর	কেশবপুর
১৮১।	দিঘীপাড় বাজার জামে মসজিদ	খেদাপাড়া	মনিরামপুর
১৮২।	বাগদা জামে মসজিদ	মজিদপুর	কেশবপুর
১৮৩।	বগা রওজা শরীফ জামে মসজিদ	সাগরদাড়ী	কেশবপুর
১৮৪।	রহিতা শেখপাড়া এবতেদিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ	রহিতা	মনিরামপুর
১৮৫।	রহিতা বিশ্বাস পাড়া জামে মসজিদ	রহিতা	মনিরামপুর

www.pathagar.com

১৯৮০–৮১ অর্থ বছর হতে ১৯৯০–৯১ অর্থ বছর পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন যশোর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গঠিত ইসলামী বুক ক্লাবের তালিকা

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮২–৮৩		
১।	প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনিসটিটিউট	যশোর	যশোরসদর
২।	নব কিশলয় প্রি–ক্যাডেট নার্সারী স্কুল	যশোর	যশোরসদর
৩।	আনজুমানে খালেকিয়া	যশোর	যশোরসদর
৪।	বর্ণ পরিচিতি বিদ্যালয়, ঘোপ, যশোর	যশোর	যশোরসদর
৫।	আবদুস সামাদ মেমোরিয়াল একাডেমী	যশোর	যশোরসদর
৬।	ইসলামিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	যশোর	যশোরসদর
৭।	যশোর হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল	যশোর	যশোরসদর
৮।	খুলনা রিজিওনাল স্কাউটস সেন্টার, পুলেরহাট	চাঁচড়া	যশোরসদর
৯।	দোগাছিয়া আহসান নগর আলিয়া মাদ্রাসা	দোগাছিয়া	যশোরসদর
১০।	আবেদীয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা	সাজিয়ালী	যশোরসদর
১১।	বাজে দুর্গাহপুর আনজুমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গাজীর দরগাহ	যশোরসদর
১২।	জনাব আলী শিশু নিকেতন (ইসলামী কিন্ডার গার্ডেন)	রূপদিয়া	যশোরসদর
১৩।	চন্ডিপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চন্ডীপুর	মনিরামপুর
১৪।	ভালুকঘর আজিজিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	শিখারপুর	কেশবপুর
১৫।	ঝিকরগাছা বদরুদ্দিন মুসলিম বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
১৬।	রঘুনাথ নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথ নগর	ঝিকরগাছা
১৭।	শার্শা পাইলট হাই স্কুল	শার্শা	শার্শা
১৮।	আগআচঁড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	বাগআচঁড়া	শার্শা

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৩–৮৪		
১৯।	নারিকেল বাড়ীয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	নারিকেল বাড়ীয়া	বাঘারপাড়া
২০।	রায়পুর দ্বিমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রায়পুর	বাঘারপাড়া
২১।	হাসিমপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাসিমপুর	যশোরসদর
২২।	তালবাড়িয়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	নতুন উপশহর	যশোরসদর
২৩।	আবদুল বারী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বারী নগর	যশোরসদর
২৪।	রূপদিযা ওয়েলফেয়ার একাডেমী	রূপদিয়া	যশোরসদর
২৫।	হামিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রাজার হাট	যশোরসদর
২৬।	মহাকাল উচ্চ বিদ্যালয়	মহাকাল	অভয়নগর
২৭।	ঝিকরগাছা উচ্চ বিদ্যালয়	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
২৮।	ঝিকরগাছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা
২৯।	বুরুজবাগান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	যাদবপুর	শার্শা
৩০।	মনিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মনিরামপুর	মনিরামপুর
৩১।	মনিরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	মনিরামপুর	মনিরামপুর
৩২।	কেশবপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কেশবপুর	কেশবপুর
৩৩।	কেশবপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কেশবপুর	কেশবপুর
৩৪।	নওয়াপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	নওয়াপাড়া	অভয়নগর
৩৫।	নওয়াপড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	নওয়াপাড়া	অভয়নগর
৩৬।	বাঘারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বাঘার পাড়া	বাঘারপাড়া
৩৭।	বাঘারপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বাঘারপাড়া	বাঘারপাড়া
৩৮।	চৌগাছা উচ্চ বিদ্যালয়	চৌগাছা	চৌগাছা
৩৯।	চৌগাছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	চৌগাছা	চৌগাছা
৪০।	যশোর জেলা স্কুল	যশোর	যশোরসদর
৪১।	যশোর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	যশোর	যশোরসদর
৪২।	মুসলিম একাডেমী	যশোর	যশোরসদর
৪৩।	সন্মিলনী ইনস্টিটিউট, যশোর	যশোর	যশোরসদর
৪৪।	আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	যশোর	যশোরসদর
৪৫।	এম, এস, টি, পি, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।	যশোর	যশোরসদর
৪৬।	দানবীরহাজী মহসীন উচ্চ বিদ্যালয়, মুরলী	রাজার হাট	যশোরসদর

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
৪৭।	নতুন খয়ের তলা উচ্চ বিদ্যালয়	যশোর	যশোরসদর
৪৮।	পুলেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়	পুলেরহাট	যশোর সদর

১৯৮৪–৮৫

৪৯।	ভাভুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চাঁচড়া	যশোরসদর
৫০।	ঘুরুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	নতুন উপশহর	যশোরসদর
৫১।	বাহাদুরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	নতুন উপশহর	যশোরসদর
৫২।	খাজুরা উচ্চ বিদ্যালয়	পৌর নগর	যশোরসদর
৫৩।	রুদ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়	রুদ্রপুর	যশোরসদর
৫৪।	ঘূর্ণী উচ্চ বিদ্যালয়	জংগল বাধাল	যশোরসদর
৫৫।	রাজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	রাজগঞ্জ	মনিরামপুর
৫৬।	ভালুকঘর উচ্চ বিদ্যালয়	শিকারপুর	মনিরামপুর
৫৭।	হিদিয়া এ, এইচ, এন, ম াধ্যমিক বিদ্যালয়	হিদিয়া	অভয়নগর
৫৮।	শ্যামকুড় উচ্চ বিদ্যালয়	চিনাটোলা	মনিরামপুর
৫৯।	এন, বি, কে সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ধলগ্রাম	বাঘার পাড়া
৬০।	জামদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জামদিয়া	বাঘার পাড়া

১৯৮৫–৮৬

৬১।	যশোর সেনানিবাস উচ্চ বিদ্যালয়	যশোর সেনানিবাস	বাঘার পাড়া
৬২।	নাটুয়াপাড়া মহসীন আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	নাটুয়াপাড়া	বাঘার পাড়া
৬৩।	জহুরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জহুরপুর	বাঘার পাড়া
৬৪।	পাঁচ বাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	নতুন উপশহর	বাঘার পাড়া
৬৫।	লেবুতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গৌর নগর	বাঘার পাড়া
৬৬।	কাশিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাশিমপুর	বাঘার পাড়া
৬৭।	ইছালী দ্বিমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাশিমপুর	বাঘার পাড়া

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৬–৮৭		
৬৮।	ভি, এস, টি, উচ্চ বিদ্যালয়	সামটা	শার্শা
৬৯।	বাদশাহ ফয়সল ইসলামী ইনষ্টিটিউট	নতুন উপশহর	যশোরসদর
৭০।	কেশবপুর দারুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা	কেশবপুর	কেশবপুর
৭১।	পলাশী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রহিতা	মনিরামপুর
৭২।	দাউদ পাবলিক স্কুল	যশোর সেনানিবাস	যশোর সদর
৭৩।	বাগআচঁড়া সম্মিলিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বাগ আচঁড়া	শার্শা
৭৪।	বন্দবিলা দ্বি–মুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বন্দবিলা	বাঘারপাড়া
৭৫।	বাদশাহ ফয়সল ইসলামী ইনষ্টিটিউট	যশোর	যশোরসদর
৭৬।	আম বটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাজিয়ালী	যশোরসদর
৭৭।	বামনগর নাজের সরদার উচ্চ বিদ্যালয়	রাজারহাট	যশোরসদর
৭৮।	মোজাদেদীয়াদারুস–ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	রাজার হাট	যশোরসদর
৭৯।	সাগরদাঁড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	সাগরদাঁড়ী	কেশবপুর
৮০।	অভয়নগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	বাঘুটিয়া	অভয়নগর
৮১।	রাজঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রাজঘাট	অভয়নগর
	১৯৮৮–৮৯		
৮২।	মীরাপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	চূড়ামনকাঠি	যশোরসদর
৮৩।	নারাংগালী সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হালসা	যশোরসদর
৮৪।	মনিরামপুর সিনিয়র মাদ্রাসা	মনিরামপুর	মনিরামপুর
৮৫।	গাজীর দরগাহ ফয়জাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসা	গাজীর দরগাহ	ঝিকরগাছা
৮৬।	মুক্তারপুর গোয়ালবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	এস, বাকড়া	মনিরামপুর
৮৭।	গাইদঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সীমাখালি	বাঘার পাড়া
	১৯৮৯–৯০		
৮৮।	যশোর আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	যশোর	যশোরসদর
৮৯।	যশোর জামেয়া এজাজিয়া রেল ষ্টেশন মাদ্রাসা	যশোর	যশোরসদর

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
৯০।	লাউড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা	লাউড়ী	মনিরামপুর
৯১।	খামারবাড়ী পাবলিক লাইব্রেরী	খানপুর	মনিরামপুর
৯২।	মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মনোহরপুর	মনিরামপুর
৯৩।	বেনাপোল সিনিয়র মাদ্রাসা	বেনাপোল	শার্শা
৯৪।	বেনাপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেনাপোল	শার্শা
৯৫।	বেনাপোল ইসলামিক একাডেমী	বেনাপোল	শার্শা
৯৬।	বুরুজ বাগান ছিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	যাদবপুর	শার্শা
৯৭।	বাঘারপাড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	বাঘারপাড়া	বাঘারপাড়া
	১৯৯০–৯১		
৯৮।	বি, এ, এফ, শাহীন কলেজ (শহীদ মতিউর রহমান এয়ার বেইজ)	যশোর সেনানিবাস	যশোর সদর
৯৯।	বাদিয়া টোলা স্বাক্ষরতা সমিতি	চান্দুটিয়া	যশোরসদর
১০০।	শিওরদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথ নগর	ঝিকরগাছা
১০১।	মুক্তেশ্বরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ভেকুটিয়া	যশোরসদর
১০২।	কায়বা বাইকোলা ওসমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	পাঁচ কায়বা	শার্শা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন যশোর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৮০–৮১ থেকে ১৯৮৮–৮৯ অর্থ বছর পর্যন্ত ঝিনাইদহ জেলায় গঠিত মসজিদ পাঠাগার সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম	ডাক	উপজেলা
	১৯৮০–৮১		
১।	ভূটিয়ারগাতী (রসুলপুর) জামে মসজিদ	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহসদর
২।	চরবাখরবা জামে মসজিদ	কাতলাগাড়ী	শৈলকুপা
৩।	মহেশপুর জামে মসজিদ	মহেশপুর	মহেশপুর
	১৯৮১–৮২		
৪।	হাটগোপালপুর জামে মসজিদ	হাটগোপালপুর	ঝিনাইদহসদর

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম	ডাক	উপজেলা
৫।	উত্তর মির্জাপুর জামে মসজিদ	কাতলাগাড়ী	শৈলকুপা
৬।	হাসনাহাটী জামে মসজিদ	বড়ধোপাদী	কালিগঞ্জ
৭।	খালিশপুর বাজার জামে মসজিদ	খালিশপুর	কোটচাঁদপুর
৮।	ঘুগরী বাজার জামে মসজিদ	জি, পান্থাপাড়া	মহেশপুর
৯।	কোটচাঁদপুর বাজার জামে মসজিদ	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর
	১৯৮২–৮৩		
১০।	মাগুরা গ্রাম জামে মসজিদ	সাধুহাটা	ঝিনাইদহসদর
১১।	ফুরসন্ডী জামে মসজিদ	হাটগোপালপুর	ঝিনাইদহসদর
১২।	শৈলকুপারেজিষ্টি অফিস জামে মসজিদ	শৈলকুপা	শৈলকুপা
১৩।	বড়বাড়ী বগুড়া জামে মসজিদ	আবাইপুর	শৈলকুপা
১৪।	বড়ঘিঘাটী জামে মসজিদ	বিপিন নগর	কালিগঞ্জ
১৫।	কালিগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ	নলডাংগা	কালিগঞ্জ
১৬।	বাথানগাছী জামে মসজিদ	গোয়াতলী	মহেশপুর
১৭।	হরিনাকুন্ডু জামে মসজিদ	হরিনাকুন্ডু	হরিনাকুন্ডু
১৮।	দখলপুর জামে মসজিদ	হরিনাকুন্ডু	হরিনাকুন্ডু
	১৯৮৩–৮৪		
১৯।	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ জামে মসজিদ	ক্যাডেট কলেজ	ঝিনাইদহসদর
২০।	চাঁদপাড়া জামে মসজিদ	বিপিননগর	কোটচাঁদপুর
২১।	কাঁচেরকোল মাদ্রাসা জামে মসজিদ	কাঁচেরকোল	শৈলকুপা
২২।	নওদাগ্রাম জামে মসজিদ	মহেশপুর	মহেশপুর
২৩।	হলিধানী জামে মসজিদ	হলিধানী	ঝিনাইদহসদর
	১৯৮৪–৮৫		
২৪।	হুদাপুটিয়া জামে মসজিদ	হাটগোপালপুর	ঝিনাইদহসদর
২৫।	নিজপুটিয়া জামে মসজিদ	গোয়ালপাড়া	ঝিনাইদহসদর
২৬।	উমেদপুর জামে মসজিদ	রয়েড়া	শৈলকুপা
২৭।	কালিগঞ্জ বায়তুল আমান জামে মসজিদ	নলডাংগা	কালিগঞ্জ
২৮।	ভায়না মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ	জোড়াদাহ	হরিনাকুন্ডু
	১৯৮৫–৮৬		
২৯।	পূর্ব বালিয়াডাংগা জামে মসজিদ	বিপিননগর	কালিগঞ্জ

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৬–৮৭		
৩০।	কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ জামে মসঃ	নলডাংগা	কালিগঞ্জ
৩১।	মোবারকগঞ্জ চিনিকল জামে মসজিদ	নলডাংগা	কালিগঞ্জ
৩২।	উত্তর কাষ্টসাগড়া জামে মসজিদ	পোড়াহাটী	ঝিনাইদহসদর
৩৩।	লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদ	হাটগোপালপুর	ঝিনাইদহসদর
৩৫।	গোয়ালপাড়া বাজার জামে মসজিদ	গোয়ালপাড়া	ঝিনাইদহসদর
৩৬।	কাঁচেরকোল পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	বেনীপুর	শৈলকুপা
৩৭।	রয়েড়া বাজার জামে মসজিদ	রয়েড়া	শৈলকুপা
৩৮।	ভাটই বাজার জামে মসজিদ	ভাটই বাজার	শৈলকুপা
৩৯।	রতিডাংগা জামে মসজিদ	বিশ্রন্তপুর	শৈলকুপা
৪০।	পুরাতন মালিথিয়া জামে মসজিদ	লাংগলবাঁধ	শৈলকুপা
৪১।	মহেশপুর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	মহেশপুর	মহেশপুর
৪২।	সামন্তা ষাট নলপাড়া জামে মসজিদ	সামন্তা বাজার	মহেশপুর
৪৩।	কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর
	১৯৮৭–৮৮		
৪৪।	ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া আলিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহসদর
৪৫।	অচিন্ত নগর জামে মসজিদ	গোয়ালপাড়া	ঝিনাইদহসদর
৪৬।	দুর্গাপুর জামে মসজিদ	গোয়ালপাড়া	ঝিনাইদহসদর
৪৭।	বরিয়া জামে মসজিদ	বিপ্রবকদিয়া	শৈলকুপা
৪৮।	পুরাতন বাখরবা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	কাতলাগাড়ী	শৈলকুপা
৪৯।	কুশবাড়িয়া জামে মসজিদ	ধলহরাচন্দ্র	শৈলকুপা
৬০।	চাপরাইল জামে মসজিদ	বেথুলি	শৈলকুপা
৬১।	সলেমানপুর শেখপাড়া জামে মসজিদ	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর
৬২।	নেপা বাজার জামে মসজিদ	জিন্নাহ নগর	মহেশপুর

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৮–৮৯		
৬৩।	শৈলকুপা শাহী জামে মসজিদ	শৈলকুপা	শৈলকুপা
৬৪।	সোন্দাহ জামে মসজিদ	শৈলকুপা	শৈলকুপা
৬৫।	ডাউটিয়া জামে মসজিদ	ধলহরা চন্দ্র	শৈলকুপা
৬৬।	কালিগঞ্জ পেসোইহাটা জামে মসজিদ	নলডাংগা	কালিগঞ্জ
৬৭।	ফরাশপুর জামে মসজিদ	খোর্দ্দরায়গ্রাম	কালিগঞ্জ
৬৮।	বাকছুয়া মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	জোড়াদাহ	হরিনাকুন্ডু
	১৯৮৯–৯০		
১।	ঝিনাইদহ জজ কোর্ট জামে মসজিদ	ঝিনাইদহ	সদর
২।	মগরখালী জামে মসজিদ	কালিচরনপুর	সদর
৩।	আরাপপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	ঝিনাইদহ	সদর
৪।	কাঞ্চন নগর জামে মসজিদ	ঝিনাইদহ	সদর
৫।	হরিনাকুন্ড উপজেলা জামে মসজিদ	হরিনাকুন্ড	হরিনাকুন্ডু
৬।	শিতলী পূর্বপার জামে মসজিদ	হরিনাকুন্ড	হরিনাকুন্ডু
৭।	বেড় আন্দুলিয়া জামে মসজিদ	সাধুগঞ্জ	হরিনাকুন্ডু
৮।	চরপাড়া জামে মসজিদ	বাজারপোড়াহাটি	হরিনাকুন্ডু
৯।	ঘোড়াগাছা জামে মসজিদ	সাগান্না	হরিনাকুন্ডু
১০।	মসজিদ বায়তুল মামুর	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর
১১।	জলিলপুর বাজার জামে মসজিদ	মহেশপুর	মহেশপুর
১২।	মহেশপুর খানপাড়া জামে মসজিদ	মহেশপুর	মহেশপুর
১৩।	কমলাপুর জামে মসজিদ	নলডাঙ্গা	কালিগঞ্জ
১৪।	কোলা বাজার জামে মসজিদ	খালকোলা	কালিগঞ্জ
১৫।	আলফাপুর জামে মসজিদ	শ্রীকোল	শৈলকুপা
১৬।	পশ্চিম ঝিনাইদহ জামে মসজিদ	গান্নাবাজার	কালিগঞ্জ
১৭।	গান্না বাজার জামে মসজিদ	গান্নাবাজার	কালিগঞ্জ
	১৯৯০–৯১		
১।	কলাবাগান জামে মসজিদ	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ
২।	ঝিনাইদহ আহলে হাদীস	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ
৩।	ধোপাদি নগর জামে মসজিদ	ধোপাদি নগর	কালিগঞ্জ

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলামী বুক ক্লাবের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
৪।	আলাইপুর জামে মসজিদ	জিন্নাহনগর	মহেশপুর
৬।	সামন্ত চারাতলা পাড়া জামে মসজিদ	সামন্তা	মহেশপুর
৭।	শ্রীপুর জামে মসজিদ	সাধুপুর	হরিনাকুন্ডু
৮।	কৃষ্ণপুর জামে মসজিদ	রয়েড়াবাজার	শৈলকূপা
৯।	পুরাতন কামরন জামে মসজিদ	কাতলাপাড়া	শৈলকূপা
১০।	আলোকদিয়া জামে মসজিদ	কোটচাঁদপুর	শৈলকূপা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক "ইসলামিক বুক ক্লাব" সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক	উপজেলা
	১৯৮২–৮৩		
১।	ধাওড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা	ধাওড়া	শৈলকুশা
	১৯৮৩–৮৪		
২।	ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ
৩।	ঝিনইদহ সঃ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ
৪।	নলডাংগা ভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	নলডাংগা	কালিগঞ্জ
৫।	সলিমুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	নলডাংগা	কালিগঞ্জ
৬।	কোটচাঁদপুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয়	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর
৭।	কোটচাঁদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর
৮।	মহেশপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	মহেশপুর	মহেশপুর
৯।	মহেশপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	মহেশপুর	মহেশপুর
১০।	হরিনাকুন্ডু পাইলট উচ্চবিদ্যালয়	হরিনাকুন্ডু	হরিনাকুন্ডু
১১।	হরিনাকুন্ডু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	হরিনাকুন্ডু	হরিনাকুন্ডু
১২।	শৈলকূপা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়	শৈলকূপা	শৈলকূপা
১৩।	শৈলকূপা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়	শৈলকূপা	শৈলকূপা
১৪।	হাটগোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	হাপগোপাল পুর	ঝিনাইদহ
১৫।	মাওলানাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গোয়ালপাড়া	ঝিনাইদহ
১৬।	আবাইপুর রাম সুন্দর উচ্চবিদ্যালয়	আবাইপুর	শৈলকূপা
১৭।	কামান্না মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কামান্না	শৈলকূপা

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক	উপজেলা
১৮।	কাঁচেরকোল মরিয়ম নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কাঁচের কোল	শৈলকূপা
১৯।	বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বসন্ত পুর	শৈলকূপা
২০।	গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গাড়াগঞ্জ	শৈলকূপা
২১।	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ	ক্যাডট কলেজ	ঝিনাইদহ
২২।	ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী উচ্চ বিদ্যালয়	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ
২৩।	হাট বার বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বার বাজার	কালিগঞ্জ
	১৯৮৪–৮৫		
২৪।	ভাটই মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ভাটই বাজার	শৈলকূপা
২৫।	নবোদয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	লাংগলবাধ	শৈলকূপা
২৬।	হরিশংকরপুর জি,সি,বিদ্যাপীঠ	হরিশংকরপুর	ঝিনাইদহ
	১৯৮৫–৮৬		
২৭।	ধাওড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ধাওড়া	শৈলকূপা
২৮।	রোস্তম আলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বারবাজার	কালিগঞ্জ
২৯।	বালিয়া ডাংগা এস,এম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বিপিন নগর	কালিগঞ্জ
৩০।	ঘুগরী পান্তাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জি,পান্তাপাড়া	মহেশপুর
	১৯৮৬–৮৭		
৩১।	আলহাজ্ব মফিজ উদ্দিন একাডেমী রুলী	সাতপোতাভৈরব	মহেশপুর
৩২।	নাথ পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শৈলকূপা	শৈলকূপা
৩৩।	শিশু কুঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়	ক্যাডেট কলেজ	ঝিনাইদহ
	১৯৮৭–৮৮		
৩৪।	আওধা সম্মিলিত জ্যোতিবসু মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ধলহরাচন্দ্র	শৈলকূপা
৩৫।	জিন্নাহ নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জিন্নাহ নগর	মহেশপুর
৩৬।	খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	খালিশপুর	মহেশপুর
৩৭।	দূর্গাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গোয়ালপাড়া	ঝিনাইদহ

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক	উপজেলা
৩৮।	কিসমত আলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মুলত্রিবেনী	শৈলকূপা

১৯৮৮–৮৯

৩৯।	মন্তেজার রহমান মিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	দহকোলা	শৈলকূপা
৪০।	শৈলকূপা আলীয়া মাদ্রাসা	শৈলকূপা	শৈলকূপা

নড়াইল জেলার মসজিদ পাঠাগারের হিসাব

ক্রমিক নং	পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা

১৯৮০–৮১

১।	সীমাখালী জামে মসজিদ	কমলাপুর	নড়াইল
২।	সরকেলডাংগা জামে মসজিদ	বাসগ্রাম	নড়াইল
৩।	লক্ষীপাশা আদর্শ বিদ্যালয় জামে মসজিদ	লক্ষীপাশা	লোহাগড়া

১৯৮১–৮২

৪।	শাহাবাদ জামে মসজিদ	শাহাবাদ	নড়াইল
৫।	মাছিমদিয়া জামে মসজিদ	রতন গঞ্জ	নড়াইল
৬।	কোমখালী জামে মসজিদ	সিংগিয়াহাড়ি	নড়াইল
৭।	লোহাগড়া সদর জামে মসজিদ	লোহাগড়া	লোহগড়া
৮।	মুলশ্রী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ	মূলশ্রী	কালিয়া

১৯৮২–৮৩

৯।	নড়াইল টাউন জামে মসজিদ	নড়াইল	নড়াইল
১০।	কালিয়া নতুন বাজার জামে মসজিদ	কালিয়া	কালিয়া

১৯৮৩–৮৪

১১।	রূপগঞ্জবাজার জামে মসজিদ	রতন গঞ্জ	নড়াইল
১২।	চারিখাদা জামে মসজিদ	মধ্যপল্লী	নড়াইল
১৩।	গরীব শাহ জামে মসজিদ	বাগশ্রীরামপুর	নড়াইল

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
১৪।	তালবাড়ীয়া জামে মসজিদ	কোলা দিঘলিয়া	লোহাগড়া
১৫।	ধলইতলা জামে মসজিদ	ধলইতলা	লোহাগড়া
	১৯৮৪–৮৫		
১৬।	নড়াইল উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	নড়াইল	নড়াইল
	১৯৮৫–৮৬		
১৭।	নড়াইল ইসলামিক মিশন জামে মসজিদ	হাটবাড়ীয়া	নড়াইল
	১৯৮৬–৮৭		
১৮।	শিয়রবর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	শিয়রবর	নড়াইল
১৯।	মংগলহাটা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	কুন্দশী	নড়াইল
২০।	কালিয়া উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	কালিয়া	কালিয়া
২১।	শামসুল উলুম খাদেমুল ইসলাম হাফেজী মাদ্রাসা জামে মসজিদ	বাঐসোনা	কালিয়া
	১৯৮৭–৮৮		
২২।	নড়াইল কোর্ট জামে মসজিদ	নড়াইল	নড়াইল
২৩।	নওয়াগ্রাম পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	কোলা দিঘলিয়া	লোহাগড়া
২৪।	কুমারকান্দা জামে মসজিদ	লোহাগড়া	লোহাগড়া
	১৯৮৮–৮৯		
২৫।	নড়াইল গ্রাম জামে মসজিদ (বিশেষ পাঠাগার)	রতনগঞ্জ	নড়াইল
২৬।	বড়দিয়া বাজার জামে মসজিদ	বড়দিয়া	লোহাগড়া
২৭।	খাশিয়াল হাই স্কুল জামে মসজিদ	খাশিয়াল	কালিয়া
	১৯৮৯–৯০		
২৮।	পাইকড়া জামে মসজিদ	মীরাপাড়া	নড়াইল

www.pathagar.com

ক্রমিক নং.	পাঠাগারের নাম	ডাকঘর	উপজেলা
২৯।	বরাশুলা এতিমখানা জামে মসজিদ	নড়াইল	নড়াইল
৩০।	কুমড়ী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	কুমড়ী	লোহাগড়া
৩১।	চাপুলিয়া জামে মসজিদ	খাশিয়াল	লোহাগড়া
৩২।	আমাদা হামারোল জামে মসজিদ	কামাল প্রভাব	লোহাগড়া
৩৩।	বাবরা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	নওয়াগ্রাম	কালিয়া
৩৪।	দক্ষিণ মাউলী জামে মসজিদ	মাউলী	কালিয়া

ইসলামিক বুক ক্লাবের হিসাব

ক্রমিক নং	নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৩–৮৪		
১।	নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়	রতনগঞ্জ	নড়াইল
২।	তুলারামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	তুলারামপুর	নড়াইল
৩।	নড়াইল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	নড়াইল	নড়াইল
৪।	নড়াইল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	নড়াইল	নড়াইল
৫।	লোহাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়	লোহাগড়া	লোহাগড়া
৬।	লক্ষীপাশা উচ্চ বিদ্যালয়	লক্ষীপাশা	লোহাগড়া
৭।	লক্ষীপাশা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	লক্ষীপাশা	লোহাগড়া
৮।	কালিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	কালিয়া	কালিয়া
৯।	কালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	কালিয়া	কালিয়া
	১৯৮৪–৮৫		
১০।	সিংগাশোলপুর কে, পি ইনষ্টিউট	সিংগাশোলপুর	নড়াইল
১১।	দি ইষ্ট যশোর ইনষ্টিটিউশন	মকিমপুর	লোহাগড়া
	১৯৮৫–৮৬		
১২।	নলদি মধ্যমিক বিদ্যালয়	নলদি	লোহাগড়া
১৩।	চাচুড়ী–পুরুলিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	চাচুড়ী–পুরুলিয়া	কালিয়া
	১৯৮৬–৮৭		
১৪।	বাসগ্রাম বিষ্ণুপুর মহুমুখী মাঃ বিদ্যালয়	বাসগ্রাম	নড়াইল

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	নাম	ডাকঘর	উপজেলা
	১৯৮৭–৮৮		
১৫।	সি, ডি উচ্চ বিদ্যালয়	লোহাগড়া	লোহাগড়া
১৬।	পেড়লী দাখিল মাদ্রাসা	তুলারামপুর	নড়াইল
১৭।	শাহাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহাবাদ	নড়াইল
১৮।	হবখালী হামিদুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়	হবখালী	নড়াইল
১৯।	মাইজ পাড়া ইউ, পি দুর্গাপুর দাঃ মাঃ	মধ্যপল্লবী	নড়াইল
২০।	ইসলামাবাদ দাখিল মাদ্রাসা	বাগ্রশ্রীরামপুর	নড়াইল
২১।	পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	নড়াইল	নড়াইল
২২।	শাহাবাদ মাজিদিয়া মহিলা মাদ্রাসা	নড়াইল	নড়াইল
২৩।	বি, বি, এস দাখিল মাদ্রাসা	দারিয়াপুর	নড়াইল
২৪।	নড়াইল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	রতনগঞ্জ	নড়াইল
২৫।	কৃষ্ণলতা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	আগদিয়া	নড়াইল
২৬।	সরকারী শিশু সদন	রতনগঞ্জ	নড়াইল
২৭।	কুমড়ী তালবাড়ীয়া হামিদিয়া দাঃ মাঃ	কুমড়ী	লোহাগড়া
২৮।	নওয়াপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	নলদী	লোহাগড়া
২৯।	টোনা ইসলামিয়া এতিমখানা ও দাঃ মাঃ	খাশিয়াল	কালিয়া
৩০।	খড়রিয়া এ, জি, এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	খড়রিয়া	কালিয়া
	১৯৮৯–৯০		
৩১।	আলোকদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	শাহাবাদ	নড়াইল
৩২।	জুড়ালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	নড়াইল	নড়াইল
৩৩।	শিমুলতলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	আগদিয়া শিমুলিয়া	নড়াইল
৩৪।	দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দারিয়াপুর	নড়াইল
৩৫।	আবদুল হাই মহাবিদ্যালয়	নড়াইল	নড়াইল
৩৬।	মির্জাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	আড়পাড়ামির্জাপুর	নড়াইল
৩৭।	যাদবপুর দাখিল মাদ্রাসা	খড়রিয়া	কালিয়া
৩৮।	ইসলামপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ইসলামপুর	কালিয়া
৩৯।	শহীদ আঃ সালাম ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়	কালিয়া	কালিয়া
৪০।	কলাবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	কলাবাড়ীয়া	কালিয়া

www.pathagar.com

১৯৮০-৮১ হতে ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছর পর্যন্ত মাগুরা জেলায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ পাঠাগারের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	মসজিদের নাম	ডাক	উপজেলা
	১৯৮০-৮১		
১।	ফুলবাড়ী জামে মসজিদ	ফুলবাড়ী	মাগুরাসদর
২।	দ্বারিয়াপুর জামে মসজিদ	মালাইনগর	শ্রীপুর
৩।	মনিরামপুর ১ নং জামে মসজিদ	ন'হাটা	মুহাম্মদপুর
	১৯৮১-৮২		
৪।	মাগুরা কলেজ জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৫।	বেরইল মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	বেরইল	মাগুরাসদর
৬।	ভাটারা জামে মসজিদ	পাল্লা	মুহাম্মদপুর
৭।	তারাউজিয়াল মুন্সী পাড়া জামে মসজিদ	হাট আমতৈল	শ্রীপুর
৮।	ন'হাটা জামে মসজিদ	রাধানগর গ্রাম	শ্রীপুর
৯।	বামন খালী জামে মসজিদ	পুলুম	শালিখা
১০।	শতখালী জামে মসজিদ	শতখালী	শালিখা
	১৯৮২-৮৩		
১১।	বিনোদপুর জামে মসজিদ	বিনোদপুর	মুহাম্মদপুর
১২।	ঢুষরাইল মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ	মুহাম্মদপুর	মুহাম্মদপুর
১৩।	ছয়ঘরিয়া জামে মসজিদ	সীমাখালী	শালিখা
	১৯৮৩-৮৪		
১৪।	পারনান্দুয়ালী ব্যাপারী পাড়া জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
১৫।	শ্রীপুর টাউন জামে মসজিদ	শ্রীপুর	শ্রীপুর
১৬।	লাংগল বাঁধ জামে মসজিদ	লাংগলবাঁধ	শ্রীপুর
১৭।	মুহাম্মদপুর বাজার জামে মসজিদ	মুহাম্মদপুর	মুহাম্মদপুর
১৮।	ন'হাটা বাজার জামে মসজিদ	ন'হাটা	মুহাম্মদপুর
১৯।	আড়পাড়া জামে মসজিদ	আড়পাড়া	শালিখা
২০।	পুখুরিয়া জামে মসজিদ	আড়পাড়া	শালিখা

www.pathagar.com

ক্রমিক সংখ্যা	মসজিদের নাম	ডাক	উপজেলা
২১।	কাট্রিগ্রাম জামে মসজিদ	পুলুম	শালিখা
২২।	সিংহেশ্বর বিশ্বাস পাড়া জামে মসজিদ	শতখালী	শালিখা
	১৯৮৪–৮৫		
২৩।	মাগুরা পি, টি, ইনষ্টিটিউট জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
২৪।	মাগুরা পুরাতন বাজার জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
২৫।	মাগুরা ষ্টেডিয়াম আদর্শপাড়া জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
২৬।	বেরইল উত্তর পাড়া জামে মসজিদ	বেরইল	মাগুরাসদর
২৭।	বরিশাট কাজী পাড়া জামে মসজিদ	বরিশাট	শ্রীপুর
২৮।	বুনাগাতী বাজার জামে মসজিদ	বুনাগাতী	শালিখা
	১৯৮৫–৮৬		
২৯।	হাজীপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	হাজীপুর	মাগুরাসদর
৩০।	বাখেরা মকর্দম খোলা জামে মসজিদ	গাংনালিয়া	শ্রীপুর
	১৯৮৬–৮৭		
৩১।	বেরইল বাজার জামে মসজিদ	ধনেশ্বরগাতী	মাগুরাসদর
৩২।	চন্ডিখালী শাহী জামে মসজিদ	মাশালিয়া	শ্রীপুর
৩৩।	সাচিলাপুর বাজার জামে মসজিদ	সাচিলাপুর	শ্রীপুর
৩৪।	বালিদিয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	রাজবনগ্রাম	মুহাম্মদপুর
৩৫।	উড়ুরা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	বিনোদপুর	মুহাম্মদপুর
	১৯৮৭–৮৮		
৩৬।	মাগুরা জজ কোর্ট জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৩৭।	পারনান্দুয়ালী মুন্সী পাড়া ও বিশ্বাসপাড়া জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৩৮।	আমুড়িয়া জামে মসজিদ	আমুড়িয়া	মাগুরাসদর
৩৯।	বেরইল শামসুদ্দীন মাদ্রাসা জামে মসজিদ	ধনেশ্বরগাতী	মাগুরাসদর

www.pathagar.com

ক্রমিক সংখ্যা	মসজিদের নাম	ডাক	উপজেলা
৪০।	দোসতীনা জামে মসজিদ	গাংনালিয়া	শ্রীপুর
৪১।	চৌগাছী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ	কুঠিচৌগাছী	শ্রীপুর
৪২।	মাগুরা টাউন জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
	১৯৮৮–৮৯		
৪৩।	বেলনগর জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৪৪।	দীঘা (চর) জামে মসজিদ	দীঘা	মুহাম্মদপুর
	১৯৮৯–৯০		
৪৫।	মাগুরা সদর হাসপাতাল জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৪৬।	মাগুরা পৌর গোরস্থান জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৪৭।	আবালপুর জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৪৮।	শ্রীকুন্ডী জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৪৯।	বারিশিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৫০।	মাশালিয়া জামে মসজিদ	মাশালিয়া	শ্রীপুর
৫১।	জয়রামপুর জামে মসজিদ	হরিতলা	শ্রীপুর
৫২।	দেশমুখ পাড়া (দক্ষিণ পাড়া) জামে মসজিদ	ঘুনাগাতী	শালিখা
	১৯৯০–৯১		
৫৩।	মাগুরা সদর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৫৪।	বারাশিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ	মাগুরা	মাগুরাসদর
৫৫।	আলাইপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ	রাউতড়া	মাগুরাসদর
৫৬।	বরিশাট মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ	বরিশাট	শ্রীপুর
৫৭।	পানিঘাটা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ	পানিঘাটা	মুহাম্মদপুর
৫৮।	নাঘোষা জামে মসজিদ	ছান্দড়া	শালিখা

www.pathagar.com

সংশোধনী

রাজনীতিবিদ

যে সমস্ত রাজনীতিবিদদের নাম বাদ পড়েছে তাঁদের নাম এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

ভূপেষ দাস গুপ্ত, আই, সি, এস, শ্যামা শংকর বাবু, গণেষদাস গুপ্ত, মুন্সী মোজহার উদ্দীন, মোল্লা আসাদুজ্জামান, আবদুল হাকীম মোল্লা, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মোহিনী দেবী, জোতির্ময়ী গাংগুলী, গঙ্গাপদ বসু, সেখ আবদুল হক খান সাহেব, গাজী আবদুল লতিফ, শেখ আবদুল গফুর মোল্লা, খান বাহাদুর আবদুল গফুর, খান বাহাদুর জিন্নাত মিয়া, খান সাহেব ফজলুর রহমান, সোহরাব হোসেন, ঈমান আলী মাষ্টার, এ্যাডভোকেট শামসুর রহমান, এ্যাডভোকেট তৌহিদুর রহমান, অশোক সেন, অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহেদ, ডাঃ আজহার উদ্দীন, মওলানা আজিজুর রহমান, আনোয়রুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট খোদাদাদ খান, এ্যাডভোকেট আনসার আলী, শহীদুল ইসলাম মাষ্টার, মশিউর রহমান, মওলানা আবুল কাশেম, এ্যাডভোকেট টিপুসুলতান, তবিবর রহমান সর্দার, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, মওলানা সাখাওয়াত হোসেন, মকবুল হোসাইন, এ্যাডভোকেট হাদিউজ্জামান, কামরুজ্জামান, আলী রেজা রাজু, ডাঃ মারুফ হোসেন, মৌলভী আবদুল আলী, মওলানা আহমদ আলী এনয়েতপুরী, মৌলভী সৈয়দ আবদুর রউফ, আবদুল হাকিম খান, মোঃ আবদুস সালাম, মীর্জা আবদুল হাফিজ, খান সাহেব আবদুল আজিজ, মোঃ রুস্তম আলী, আগা মুহাম্মদ আবদুল বারী খান, সৈয়দ গোলাম নকীর, মজিদ-উল-হক (মন্ত্রী), সিরাজুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম রাজা, নূরুল ইসলাম বাদশা, শামসুল হুদা খান, আবদুল মালেক মাষ্টার মঈনুদ্দীন মিয়াজী প্রমূখ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মরমী কবি লালন শাহ

মরমী কবি পাঞ্জু শাহ

শেখ হবিবর রহমান

গোলাম মোস্তফা

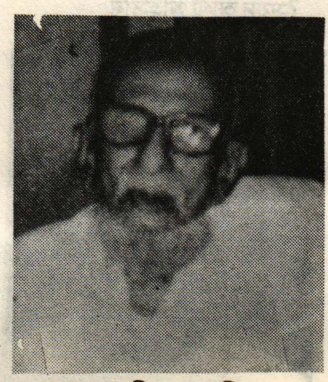

অহেদ আলী আনসারী

নূরুল মোমেন

www.pathagar.com

কবি কাদের নেওয়াজ

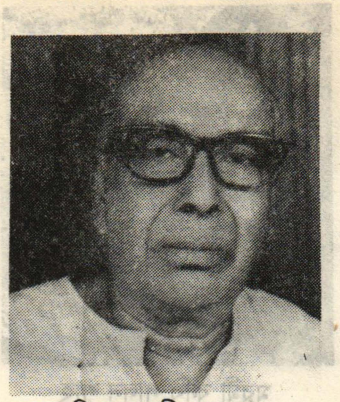

কবি শামসুদ্দীন আহমদ

ফররুখ আহমদ

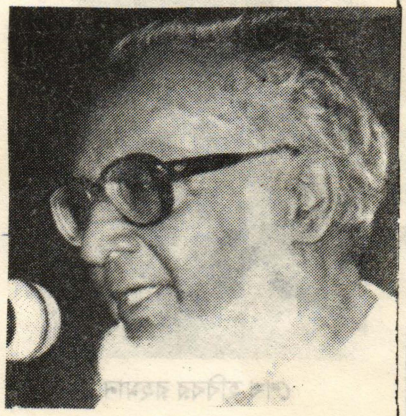

সৈয়দ আলী আহসান

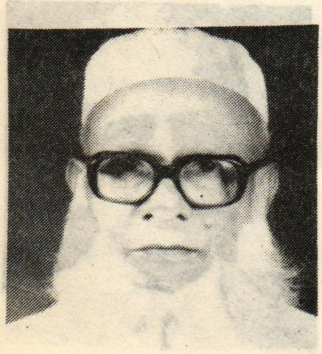

আবুল খায়ের যশোরী

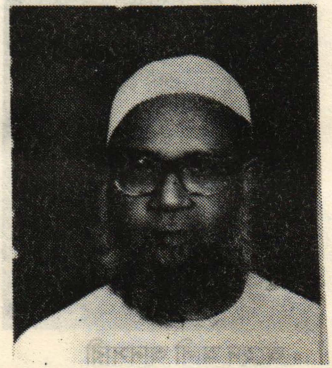

ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ

www.pathagar.com

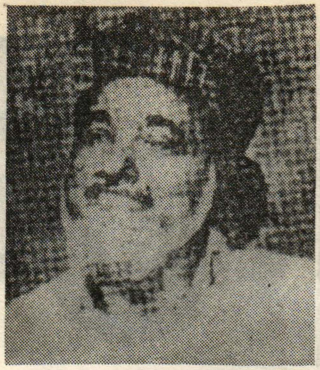

অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই

বেগম আয়শা সরদার

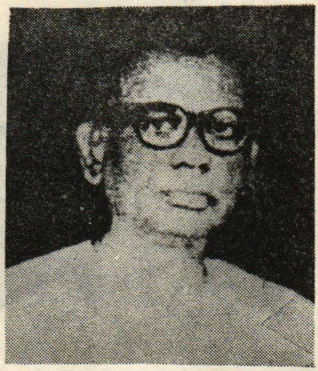

মুহম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

পীর খাজা মজিদ শাহ

শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন

www.pathagar.com

ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শরীফ হোসেন

শিল্পী এস, এম, সুলতান

ডঃ বদিউজ্জামান

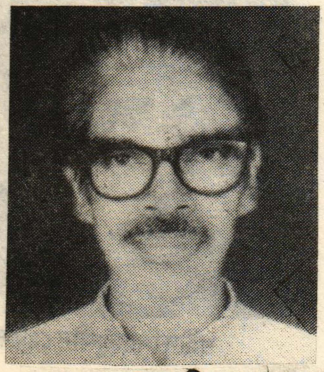

ডঃ খোন্দকার রিয়াজুল হক

ডঃ এস, এম, লুৎফর রহমান

www.pathagar.com

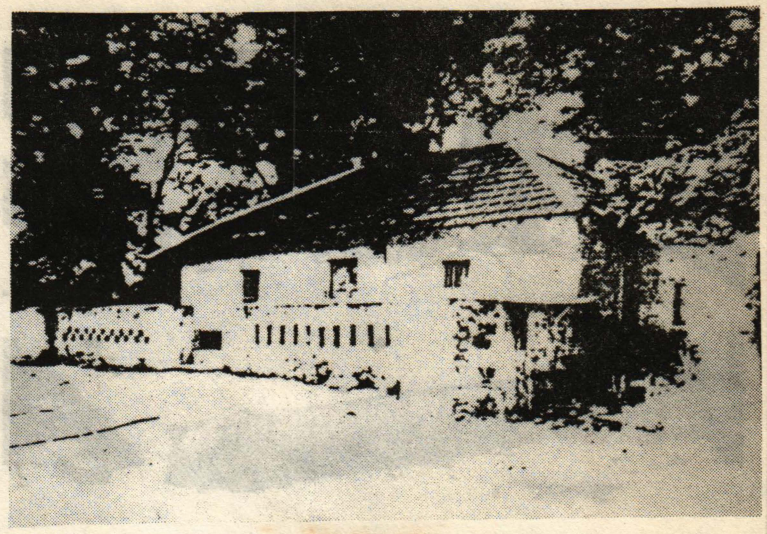

চেরাগদানী মসজিদ, বারবাজার

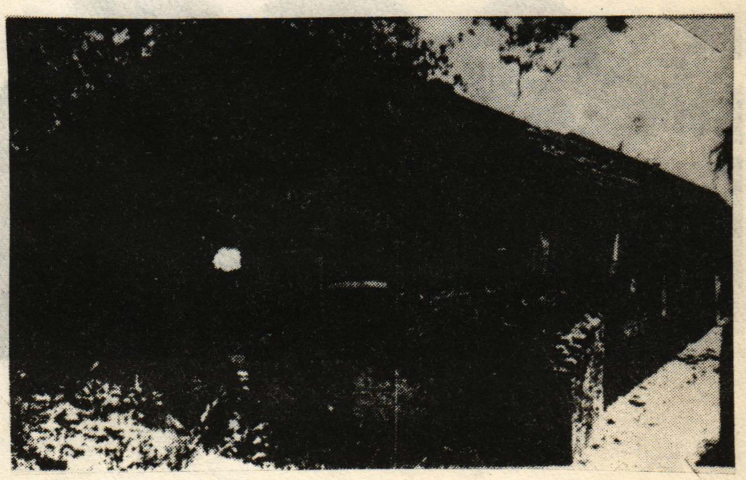

সাতগাছিয়ার মসজিদ, বারবাজার

www.pathagar.com

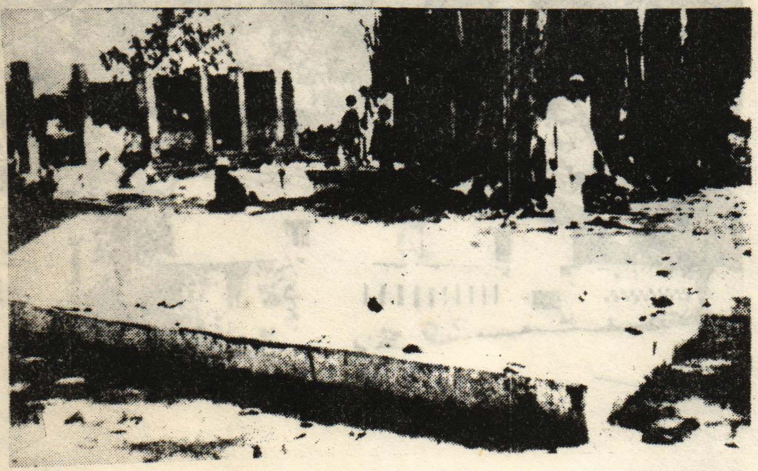

গাজী কালু চম্পাবতীর মাজার, বারবাজার

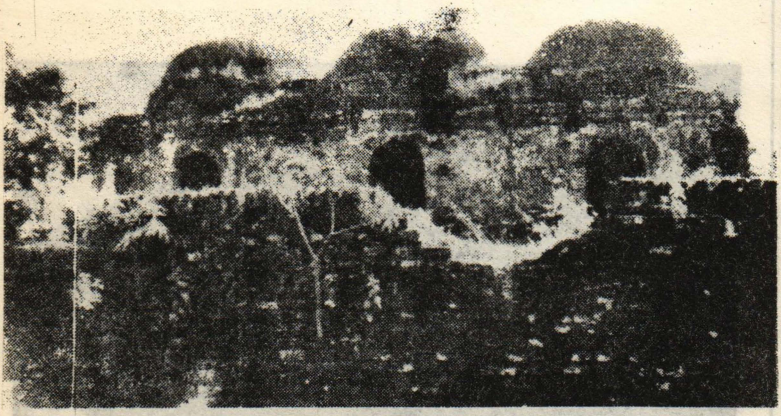

শেখ পুরা মসজিদ, কেশবপুর

www.pathagar.com

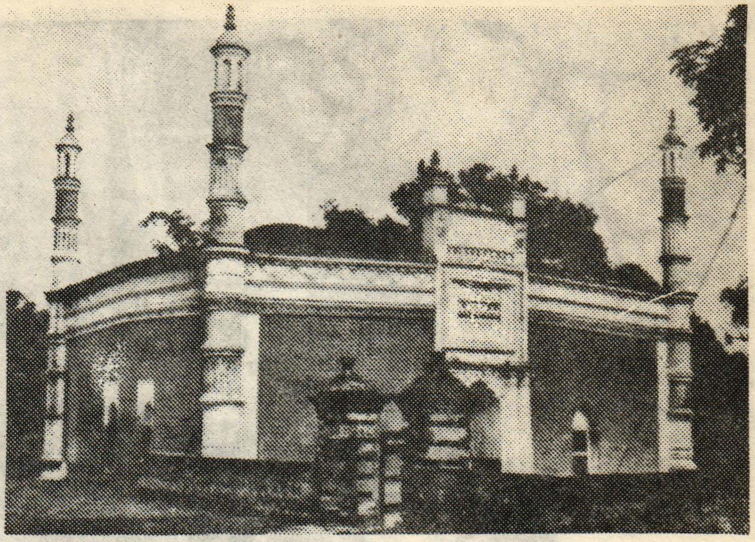

শৈলকূপা মসজিদ, যশোর

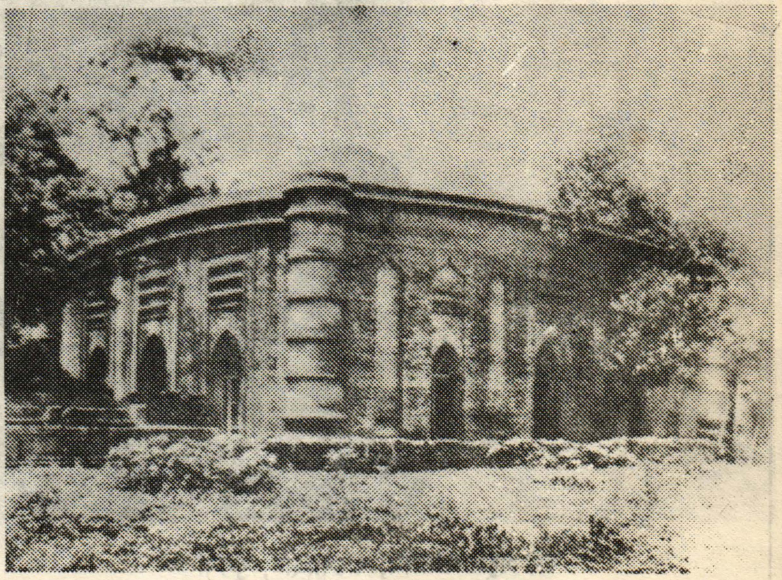

চুনাখোলা মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা

www.pathagar.com

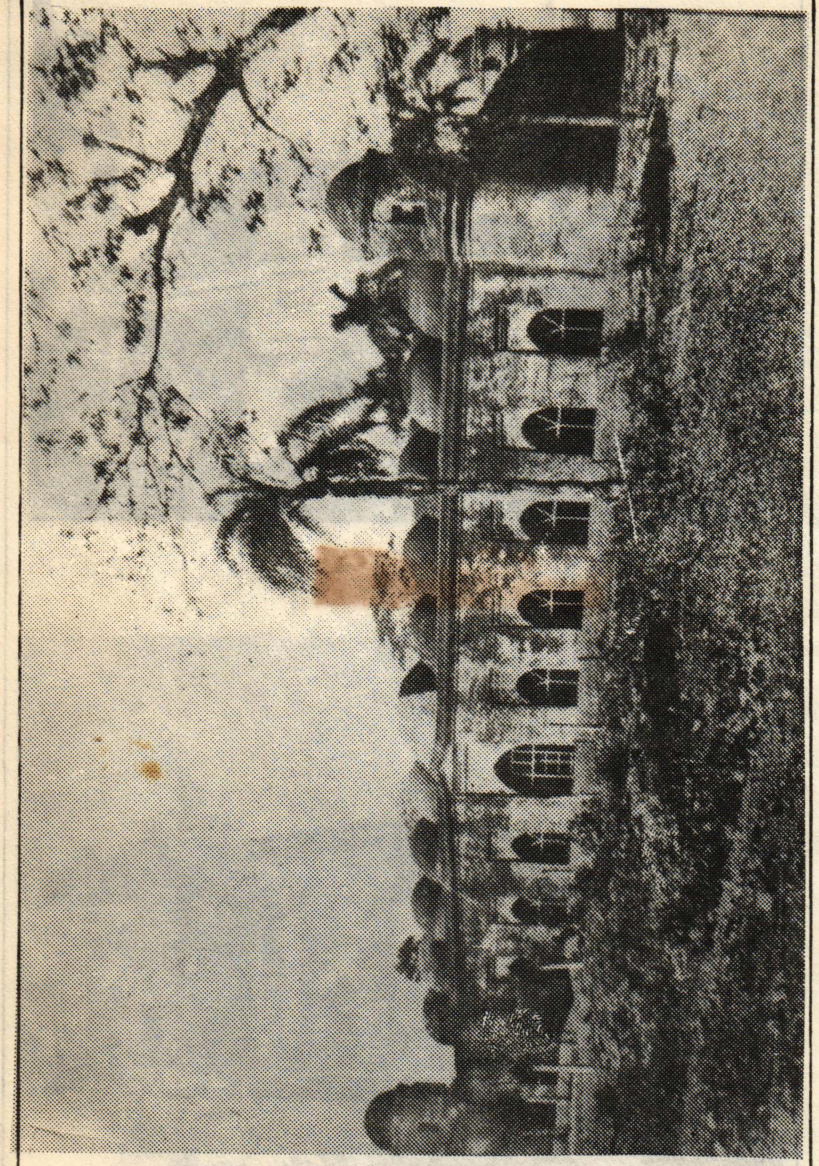

ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা

www.pathagar.com

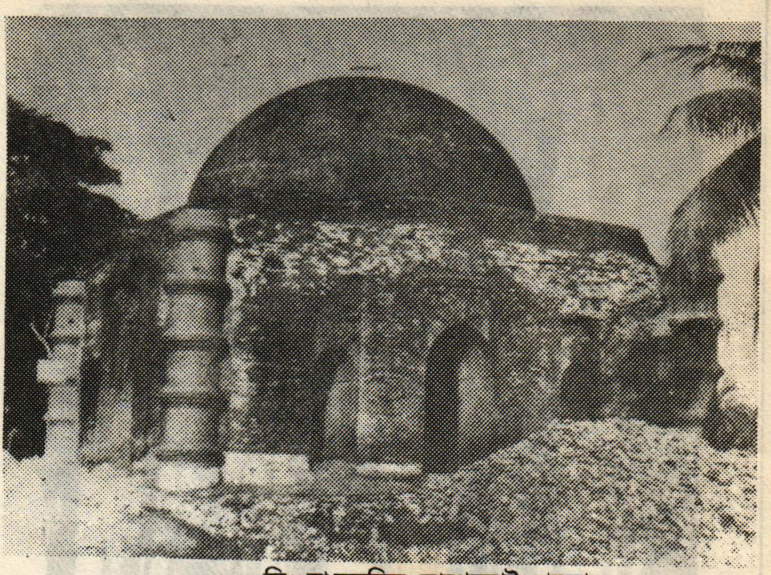

সিঙরা মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা

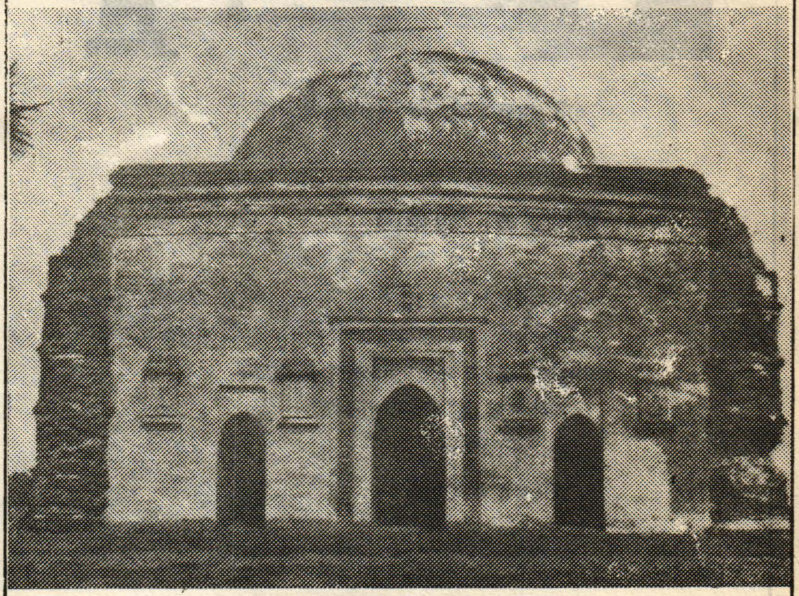

নয় গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট, খুলনা

www.pathagar.com

ষাট গম্বুজ মসজিদের ভেতরের দৃশ্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১· বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ –আ, ক, ম, যাকারিয়া
২· বিদ্যালয়ের ইতিকথায় যশোর–কাজী শওকত শাহী
ব্যক্তিগত ভাবে সহোযোগিতা করেছেন
সাজ্জাদ হোসাইন খান ও
হারুনূররশীদ
আহমদ আখতার

www.pathagar.com

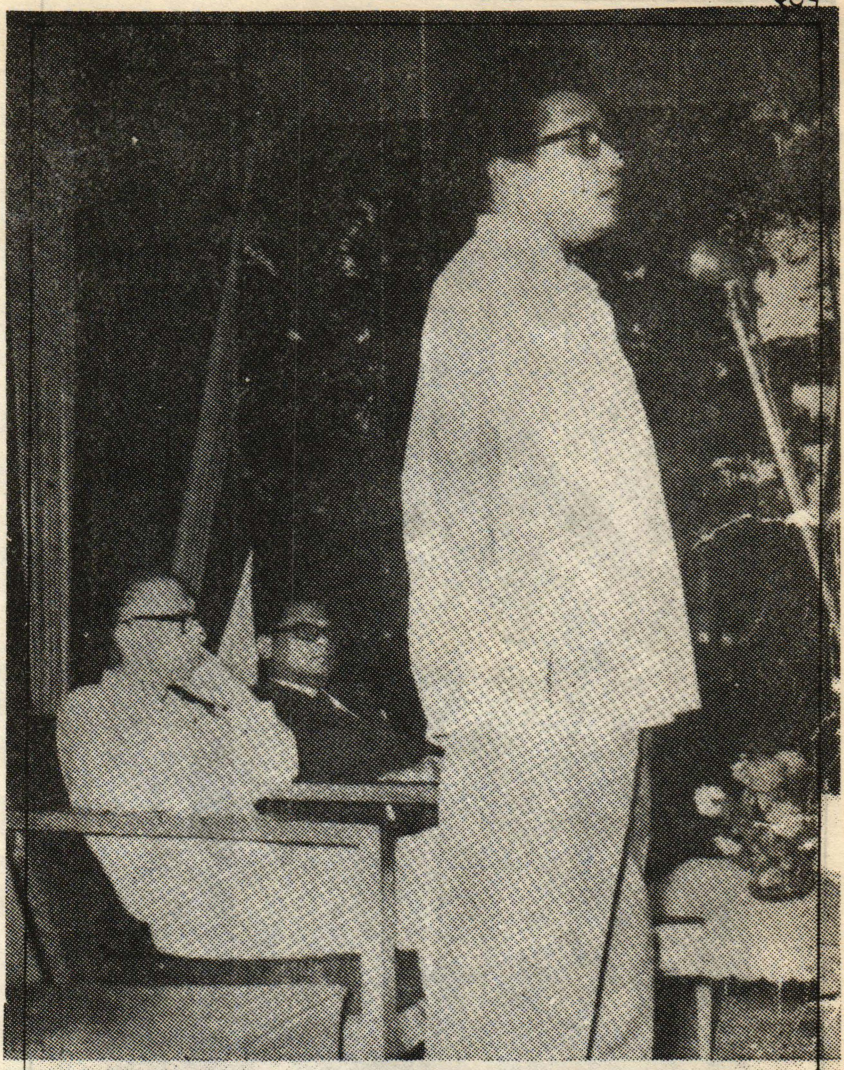

নতুন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন: ডঃ হাসান জামান। পার্শ্বে উপবিষ্ট রয়েছেন: ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী ও জনাব ডঃ কুদরত-ই-খুদা।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরুল্লার কবর

www.pathagar.com

জনাব নাসির হেলাল (জিলহজ আলী)

১৯৬২ সালের ১০ অক্টোবর যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় বাড়ীয়ালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম নাসির উদ্দীন বিশ্বাস এবং মাতা নুর জাহান বেগম।

তিনি ছাত্র জীবনে সক্রিয় ভাবে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। অন্যদিকে তিনি এ সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন।

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারীতে মহেশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এখানে ৩ বছর শিক্ষকতা করার পর ঢাকার একটি বেসরকারী সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদেন। বর্তমানে সেখানেই কর্মরত আছেন।

তাঁর প্রকাশিত প্রথম গবেষণা গ্রন্থ, 'যশোর জেলার ছড়া।